সান্যাল

বেঙ্গল পাবলিশার্স : কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫, চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

ব্লক—ফাইন আর্ট টেম্পল

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সাড়ে চার টাকা

ও বাড়ীতে অতনুর যাতায়াত আজ নতুন নয়। বহুকাল আগে—মৃগেন-বাবুর প্রথম স্ত্রী তখন জীবিত—সেইকালে অতনুর সঙ্গে কুটুম্বিতার একটা যোগসূত্র ছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে সেই সূত্রটা গেছে হারিয়ে। এ বাড়ীতে এখন আর অতনুর কোনো পরিচয় নেই।

কথাটা পরিষ্কার থাকা ভালো। মৃগেনবাবু প্রথম বিবাহ করেন সাঁইত্রিশ বছর আগে। দশ বছর সেই স্ত্রী জীবিত ছিলেন। মৃত্যুর অতি অল্পদিন পূর্বে মৃগেনবাবুর বড় শ্যালী তাঁর ছয় বছরের ছেলেটিকে কলকাতায় এনে মৃগেনের কাছে রেখে যান। তাঁর স্বামী নতুন মুন্সেফ হয়েছেন, উত্তর বিহারের নানাস্থানে তাঁকে প্রায় বছরে দু'বার বদলি হয়ে বেড়াতে হয়, সুতরাং ছেলেটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার জন্য একটি স্থায়ী জায়গা দরকার। যাবার সময় বড় শ্যালী তাঁর ভগ্নির কানে কানে বলে যান, ছেলের খরচ-খরচার জন্য প্রতি মাসে ত্রিশটি করে টাকা আমি পাঠিয়ে দেবো, টাকা নিতে তুই যেন সঙ্কোচ করিসনে!

মৃগেনবাবু তখন অল্প বেতনের স্কুল-মাস্টার। টাকা নিতে তাঁর তেমন আপত্তি ছিল না। কিন্তু ওরই পাশাপাশি আরেকটি ঘটনা ছিল, সেটা কিছু অভিনব। বিবাহের পরে এই সুদীর্ঘকাল অবধি মৃগেনবাবুর কোনো সন্তানাদি হয়নি, সেজন্য ওই ছোট্ট ঘরকন্নাটুকুর মধ্যে কোথায় যেন একটি অভাববোধ ছিল। মৃগেনবাবুর স্ত্রীর উপবাসী বাৎসল্য বছরের পর বছর এখানে ওখানে কেমন যেন ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়াতো।

ভাড়াটে বাড়ীর পাশে ছিল প্রতিবেশী একটি বধূ। রেলে চাকরি করতো তার স্বামী, ঘুরে বেড়াতো এখানে আর ওখানে—কিন্তু ছেলেপুলে ছিল পাঁচ ছয়টি। কোলের মেয়েটির বয়স ছিল বছর দেড়েক এবং তার সারাদিনের যত কিছু উৎপাত আর আনাগোনা ছিল এ বাড়ীতে মৃগেনবাবুর ঘরটিতে। মেয়েটি যেমন ফুটফুটে তেমনি স্বাস্থ্যবতী। কিন্তু তার সুন্দর দুটি চোখে কোথায় যেন নীলবর্ণের আভা ছিল, সেই কারণে মৃগেনের স্ত্রী সুশীলা স্বামীকে লুকিয়ে তাকে মাঝে মাঝে কোলে-কাঁকালে নিতেন। সারা দুপুরবেলাটা

মেয়েটা থাকতো সুশীলার কাছে এবং অন্য সময়ে যখন আসতো—সুশীলা তাকে যেন একটু আড়ালে-আবডালে রাখবারই চেষ্টা করতেন। মেয়েটা কোনো-মতেই নিজের বাড়ী যেতে চাইতো না। মৃগেন মনে মনে হাসলেন অনেকদিন অবধি এবং তারপর হঠাৎ একদিন একরাশি খেলনা এনে দিয়ে বললেন, তোমার ওই পোষা মেনি বেড়ালটাকে এগুলো দাও।

সুশীলা অবাক হয়ে তাকালেন। মৃগেন সহাস্যে বললেন, তোমার মেয়ের জন্যে গো!

মেয়ে! আনন্দে সেদিন সুশীলার গলা বুজে এসেছিল। সেদিন আর তিনি ওই শিশু মেয়েটিকে বাড়ী যেতে দিলেন না। দেখাই যাক্ না, ওর মা ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসে কিনা। কিন্তু অবাক কাণ্ড, মায়ের মনে কোন উদ্বেগই নেই! এমন ডাইনী কেউ কোথাও কখনও দেখেছে? আর মেয়েটাও তেমনি। মা-বাপের দিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই; নিশ্চিন্ত হয়ে সে থেকে গেল সুশীলার কাছে। কিন্তু মৃগেন যে ওকে একরাশি খেলনা এনে দিয়েছেন অন্তত এই সংবাদটি ওর মাকে না শোনালে চলবে কেন?

রাত্রে মেয়েটাকে নিজের বিছানায় নিজের কাছে নিয়ে সুশীলা ঘুমিয়ে রইলেন বটে, কিন্তু পরদিন সকালে উঠে তিনি পাশের বাড়ীতে ছুটে গেলেন। সে বাড়ীতে অনেকগুলো ভাড়াটে, কিন্তু তাদের পেরিয়ে সুশীলা গিয়ে শুনলেন, রেল-আপিসের বাবুটি তাঁর একটি ছেলে ও চারটি মেয়ে-সমেত স্ত্রীটিকে নিয়ে আগের দিন বাড়ী ছেড়ে জিনিসপত্র ঠেলাগাড়ীতে চাপিয়ে কোথায় যেন চলে গেছেন, কেউ জানে না। কেউ বললে, হাবড়া স্টেশন, কেউ বললে, পোড়াদা—আবার কেউ বা বললে, দক্ষিণে। একজন বললে, সুদূর পশ্চিমে নাকি তারা বদলি হয়ে গেছে।

মেয়েটার পরণে একটা জামা দিয়ে যায়নি, এমন কি ভালো একটা নামকরণ পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু ওই মেয়েটাকে কোলে নিয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে সুশীলা হঠাৎ হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। সেই কান্নার মধ্যে পরিত্যক্তা শিশুর নিরুপায় বেদনাবোধ ছিল, কিংবা ছিল বুভুক্ষিত বাৎসল্য, কিংবা হৃদয়হীনা কোনও নারীর আচরণের জন্য নিজের মনে অসহনীয় অপমানবোধ—ঠিক কোন্ কারণটা ওই চোখের জলের সঙ্গে মেশানো ছিল বলা কঠিন। তারপর অনেক-দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কোনো খোঁজখবর পাওয়া গেল না। শিশুকন্যাকে

কাঁধে তুলে নিয়ে মৃগেন সেদিন বলেছিলেন, নিজের মেয়ে হলে কি এর চেয়েও সুন্দর হোতো? আমার বিশ্বাস, হোতো না!

মেয়েটার নাম রাখা হোলো ভাস্বতী। অতনুর সঙ্গে সেও রয়ে গেল এ বাড়ীতে। চল্‌তি নাম রয়ে গেল চীনু।

সুশীলা মারা গেলেন, ভাস্বতীর বয়স তখন তিন বছরও হয়নি। অতনুকে নিয়ে মৃগেনের তখন সমস্যা দেখা দিল। তিনি ভায়রাভাইকে জানালেন, আপনার ছেলেকে আপনি নিয়ে যান, নাবালকের দায়িত্ব আমি বহন করতে অপারগ, আমাকে ক্ষমা করুন।

অতনুর বয়স তখনও আট বছর হয়নি। তার বাবা এসে তাকে নিয়ে কলকাতার এক বোর্ডিং-স্কুলে ভর্তি ক'রে রেখে গেলেন। অতনু কিছুতেই যেতে চাইছিল না।

এইসব ঘটনার পরে প্রায় সাতাশ বছর পেরিয়ে গেছে। বিগত মহাযুদ্ধে অতনু সামরিক বিভাগে চিকিৎসকের চাকরি নিয়ে বর্মা-পারস্যে ঘুরে বেড়িয়েছে অনেক দিন। অতনুদের অবস্থা মোটামুটি ভালো।

এই সাতাশ বছরে মৃগেনের জীবনের গতিও অনেক পাল্টে গেছে। দ্বিতীয়বার তিনি বিবাহ করেছেন। দ্বিতীয় স্ত্রী তরুবালা পাঁচটি সন্তানের জননী। তাঁর নিজের বড় মেয়ে মীনুর বিবাহ হয়েছিল বছর চারেক আগে। কিন্তু পর পর দুটি ছেলেমেয়ে রেখে মীনু মারা গিয়েছে আজ মাস ছয়েক হতে চললো। ছেলেমেয়ে দুটি থাকে এখন দিদিমার কাছে। এছাড়া মৃগেন-বাবুর আরো দুটি বড় বড় মেয়ে—যমুনা আর বরুণা। বড় ছেলেটি চাকরি খুঁজছে, নাম দীপেন। মেজ ছেলে দ্বিজেনের ভাবগতিক এ বাড়ীর সঙ্গে বেমানান। তার সঙ্গে কলহ-বিতর্ক লেগেই থাকে।

শিক্ষক মৃগেনবাবু এককালে তাঁর চরিত্রগত সততা-রক্ষার জন্য স্কুলের চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন। সে অনেক কথা। পরে এক সদাগরি আপিসে গিয়ে চাকুরী নেন। আজও তিনি সেই আপিসে। বিগত সাতাশ বছরের মধ্যে অন্তত নয়বার তিনি এই কলকাতা শহরে বাড়ী বদল করতে করতে এই পাড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী সুশীলা অপেক্ষা তরুবালা কোনো অংশেই কম নন। তরুবালা স্বামীর ঘর গুছিয়েছেন কোমর বেঁধে। ভাস্বতীকে কোলে তুলে নিয়েছেন প্রথম থেকে, লালনপালন করেছেন সমস্ত যত্ন আর

আগ্রহ দিয়ে—যেমন প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে তিনি এই সাংসারিক শত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও মানুষ ক'রে তুলেছেন। তরুবালার বয়সও প'য়তাল্লিশ পেরিয়ে চললো।

ভাস্বতীর সত্য পরিচয় তার নিজের কাছে অনেককাল ধরে অজ্ঞাত ছিল। গল্পটা হয়ত সে শুনেছে, কিন্তু রূপকথার মতো শুনেছে। সেই গল্পের সঙ্গে তার ব্যবহারিক জীবনের যোগ কম এবং বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া তার মনে নেই। মৃগেনকে বাবা এবং তরুবালাকে মা,—এই জানার বাইরে আর কিছু উপলব্ধি করবার কোনো অবসর তার ছিল না। কেন না, সেটা হাস্যকর। সে সকলের বড়, কিন্তু মীনুর বিবাহ হয়েছিল সকলের আগে। এর কারণ ছিল। ভাস্বতীর মুখ থেকে মৃগেন একথা অসংশয়ে জানতে পেরেছিলেন যে, বিবাহ সে করবে না।

মৃগেন বলেছিলেন, তোর বিয়ে না হ'লে মীনুর বিয়ে হবে কেমন করে?

ভাস্বতী হাসিমুখে বলেছিল, সব জীবনেই একটা না একটা অঘটন ঘটে, আমার জীবনে একটা ঘটুক না বাবা!

তরুবালা বললেন, পোড়ারমুখি, তবে কি ওই পশমের সেলাই নিয়ে চিরকাল কাটাবি?

মায়ের গলা ধরে ভাস্বতী বলেছিল, সব ছেলেমেয়েরই ত' তুমি বিয়ে দেবে; কিন্তু আমি যদি তোমার কোলে জায়গা নিয়ে শূন্যটা ভরিয়ে রাখি?

তরুবালা আড়ালে তাকে অনেক বুঝিয়েছিলেন।—শোন্ বলি ভালো কথা। ভালো ছেলে এনে দেবো, তোর প্রথম মা রেখে গেছে তোর জন্য গয়না-গাঁটি—তোর এমন স্বাস্থ্যশ্রী,—আমার কথা শোন্—

ভাস্বতী হেসে লুটোপুটি। বললে, দু'ঘণ্টার রোগে ভালো ছেলে খতম্ হ'তে পারে; বাড়ীতে ডাকাত পড়লে তোমার ওই গয়নাগাঁটি একেবারে ফর্সা। আর স্বাস্থ্যশ্রী! পদ্মের পাতায় জলের ফোঁটা,—এই আছে এই নেই!

কত সাধ্য-সাধনা, কত অনুনয়-বিনয়, কত বা মতান্তর আর মনান্তর—কিন্তু কিছুতেই কিছু নয়। ভাস্বতী সেই যে ঘাড় বেঁকিয়ে বসে রইলো, কোনোমতেই তাকে সম্মত করা গেল না। দায়-ধাক্কায় একটি একটি ক'রে গয়নাগুলোও নষ্ট হ'য়ে গেল। অবশেষে নিরুপায় হ'য়ে তরুবালা আর মৃগেন দু'জনেই চুপ ক'রে গিয়েছিলেন।

সেই অতনু! এ বাড়ীর সঙ্গে তার এখনকার যোগটা হোলো নিতান্তই আত্মিক। সমস্ত সামাজিক আর ব্যবহারিক পরিচয় ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যে মানুষটা—সেই মানুষটার সঙ্গেই এ বাড়ীর প্রত্যেকটি ব্যক্তি সংযুক্ত হ'য়ে রয়েছে। অতনুর প্রাত্যহিক জীবনের বাইরে এরা নয়, এদের বাদ দিয়ে অতনুরও কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। এতকাল ধরে যে ব্যবস্থাটা চল্‌তি ছিল, আজও প্রায় সেইরূপই আছে বটে; কিন্তু মাঝে মাঝে সেটায় চিড় খেয়েছে। ভাস্বতীর হাতে খরচপত্র, তরুবালার হাতে বিলিব্যবস্থা, আর অতনুর হাতে দিক-নির্দেশ। রোগীর জন্য কখন্ ডাক্তার ডাকা হবে, এ মাসে বাড়ীভাড়া বাকী রাখা হবে কি না, পাওনাদারদের সমস্ত পাওনা শোধ করে দিলে দৈনিক বাজার খরচ চলবে কেমন করে, কাপড়চোপড় কেনবার কোনো মাসে প্রয়োজন আছে কি না,—এর সমস্ত দায়িত্ব অতনুর। অতনু ছাড়া সংসারযাত্রা নেই, ভাস্বতী ছাড়া ব্যবস্থাপনা নেই—ঠিক এইভাবেই সুদীর্ঘকাল চলে এসেছে। ঠিক এইভাবে বাকী জীবন চালাতে পারলেই হয়ত সব দিক সুশৃঙ্খল থাকতো। কিন্তু গত কয়েক বছর থেকে অতনু যেন আবিষ্কার করে চলেছে, যারা ব্যক্তি বলে তার কাছে এতকাল পরিচিত ছিল না, তারা মাথা ছাড়িয়ে উঠে ব্যক্তিত্ব লাভ করেছে। দীপেন আর দ্বিজেন, যমুনা আর বরুণা—এরা বড় হয়েছে! মাথা উঁচুতে উঠেছে।

হাসিমুখে ভাস্বতী একদিন বললে, তোমার কপাল মন্দ, অতনু!

অতনু বললে, মিথ্যে নয়, কপাল ভালো হলে অন্তত তোমার মতিগতি ফেরাতে পারতুম। কিন্তু আজকে এমন গায়ে পড়ে কপাল মন্দ শোনালে যে?

ভাস্বতী কিছু বলবার জন্য উদ্যোগ করেছিল। হঠাৎ অতনুর আগের কথাটায় তার মুখে-চোখে ক্ষোভের ছায়া দেখা দিল। আত্মসংবরণ করে সে বললে, আমার মতিগতি ফেরাবার জন্য তোমার বোধ হয় খুব মাথা-ব্যথা ছিল?

নিশ্চয়ই ছিল!—অতনু বললে, তুমি বিয়ে করে শ্বশুরঘর করতে গেলে মেসোমশাইয়ের জীবন অনেকটা হাল্কা হতে পারতো।

মুখ তুলে ভাস্বতী বললে, অন্য একটা কথাও ছিল, অতনু।

কি বলো?

বললে নিশ্চয় দুঃখিত হবে না?

অতনু হেসে ফেললো। বললে, দুঃখ! দুঃখ রাখার জায়গা আমার বাল্যকাল থেকেই নেই। তুমি নির্ভয়ে বলো।

ভাস্বতী বললে, তুমি নিজে যদি বিয়ে ক'রে নিজের ঘরকন্নায় মন দিতে, তাহলে এ বাড়ীর সমস্যা নিয়ে তোমাকেও মাথা ঘামাতে হোতো না।

অতনু কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে, কথাটা মিথ্যে বলোনি, ভুলটা অনেককাল ধরেই চলে এসেছে।

পশমের সেলাইটা হাতে নিয়ে ভাস্বতী নতমুখে বসে রইলো। আর কোনো কথা তার মুখে এলো না। অতনু চুপ ক'রে তক্তাখানার ওপর পড়ে রইলো। পড়ে রইলো সে অনেকক্ষণ—যতক্ষণ না ভাস্বতী নিজেই আবার কথাটা তুললো। বললে,—এবার বুঝেছ যে, কপাল তোমার মন্দ?

বুঝেছি—ব'লে অতনু এবার উঠে বসলো। বললে, যাদের হাতে ক'রে গড়ে তুললুম, তারা এখন হাতের বাইরে চলে যেতে চায়, এই ত? তুমি নিজেও ত আমার ওপর পেরেক ঠুকে ঠুকে রেখেছ এতকাল। কপাল মন্দ ব'লে আবার তামাসা কেন?

ভাস্বতী একবার ভিতরের দিকে তাকালো। ভিতরে বোধ হয় দ্বিজেন কোনো একটা বিতর্ক বাধিয়ে তুলেছে, তারই গণ্ডগোল কানে আসছে। তারপর বললে, মনের মধ্যে কোথায় কি পুষে রেখেছ বলো ত? দিন দিন বুঝি ছেলেমানুষী তর্ক শিখছো? যাও উঠে বাইরে যাও, ঘরে বসে আর কোঁদল করতে হবে না।

অতনু উঠে পড়লো, কিন্তু বাইরে গেল না—ভিতরের দিকে অগ্রসর হোলো। জরাজীর্ণ নীচের তলায় সন্ধ্যার আগে এরই মধ্যে অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। অতনু এসে দাঁড়াতেই দ্বিজেন চুপ ক'রে গেল। যথাসম্ভব সাজ-সজ্জা ক'রে বেরোবার আগে সে কিছু পয়সাকড়ি চেয়েছিল। তরুবালা বললেন, আর তোমাকেও বলি অতনু, ভিখিরীকেও ত' মানুষ ভিক্ষে দেয়—তুমিই বা এক আধটা টাকা ওই কুকুরদের মুখের কাছে মাঝে মাঝে ছুঁড়ে দাও না কেন?

অতনু শান্তকণ্ঠে বললে, টাকা জন্মায় না মাসিমা, টাকা রোজগার করতে হয়!—এই ব'লে সে একবার দ্বিজেনের মুখের দিকে তাকালো। দ্বিজেন

মাথা হেঁট ক'রে সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাইরে চলে গেল তরুবালা আর কিছু না ব'লে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

কোনও এককালে কোনো এক গণৎকার মৃগেনবাবুর হাত গুণে বলেছিলেন, পঞ্চাশ বছরের পর থেকে আপনার অবস্থা ফিরবে।

মৃগেন প্রশ্ন করেছিলেন, ফিরবে মানে কী, ভট্চায?

আজ্ঞে, ভালোই যাবে।

আর্থিক, না পারমার্থিক?

হাসিমুখে ভট্চায বলেছিলেন, সুখে স্বচ্ছ ই থাকবেন। ভট্চায সেদিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কল্পনাও করেনি। একথা তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, এদেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় কোথায় গিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু ভট্চাযের না হয় দূরদর্শিতা ছিল না, তাঁরই কি ছিল? আগাগোড়া তিনি হিসাবে ভুল করেছিলেন। জীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ গণনা তাঁরও ছিল—কিন্তু সেটা তাঁর নিজের জ্ঞ সীমার মধ্যে, বাঁধাধরা ছকের মধ্যে,—যার বাইরে তিনি কখনও পা বাড়াননি। চাকরি করলেন তিনি আজীবন, বেতনের পরিমাণ কোথা থেকে আরম্ভ এবং কোথায় তার পরিশেষ,—সেটি তাঁর কাছে কখনই অস্পষ্ট ছিল না। সেই বেতনের নির্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যেই তাঁর সংসার-যাত্রার খেলা, তাঁর সুখ-দুঃখের আলোছায়া, তাঁর দুই বিবাহ ও সন্তান-সন্ততির ভালো মন্দ। ওর মধ্যে ছিল লৌকিকতা, ছিল দায়-দায়িত্ব আর কর্তব্য, ছিল স্নেহমোহধর্মের ঋণ-পরিশোধ। স্বল্পবিত্ত ঘরকন্নাটা মাঝে মাঝে টাল খেতে খেতেও চলে যেতো। যুগের এই অবস্থাটা তাঁর চিন্তার বাইরে ছিল। তাঁর নিজের ঘরকন্না থেকে দূরে যে বৃহৎ পৃথিবী রয়েছে, বৃহত্তর মানুষের সমাজ রয়েছে, সেখান থেকে যে তরঙ্গ ছুটে আসতে পারে, ছিট্‌কে আসতে পারে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং তাতে যে তাঁর ঘরকন্নায় আগুন লাগতে পারে, ওলোটপালট হ'তে পারে, অশান্তির বিষবাষ্প ধীরে ধীরে তাঁর ঘরকে আচ্ছন্ন করতে পারে,—সামান্য দরিদ্র কেরাণী হ'য়ে এসব চিন্তা কেমন ক'রে তাঁর মাথায় ঢুকবে? পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে যদি কেউ ভাগ্যের জুয়া খেলে, তবে অন্য প্রান্তের মানুষের প্রাত্যহিক সংসারযাত্রা যে সেই খেলার ফলে নিয়ন্ত্রিত হয়,—একথা আগে এমন ক'রে কে জানতো? এদেশে এই শতাব্দীর পঞ্চম দশকে যে বিরাটতর রাষ্ট্রবিপর্যয় ঘটে গেল, কে

না সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখেছে! কিন্তু মৃগেনবাবুর বুদ্ধি আর চিন্তার মধ্যে যে ভয়াবহ বিপ্লব ঘটেছে বিগত দশ বছরে, তার সেই ব্যাপ্তির কোথাও কোনো সীমা নেই।

কে?

তরুবালা এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, আমি। সারাদিন আজ তুমি বসেই কাটালে?

মৃগেনবাবু সে কথার জবাব দিলেন না। শুধু বললেন, সামনের বাড়ীতে সকাল সন্ধ্যে অত হৈ চৈ কেন বলো ত?

তরুবালা বললেন, হবেই ত'; শাশুড়ী-বৌয়ের মধ্যে একটুকু বনিবনা নেই। দিনরাত গালমন্দ, আর মারধোর চলছে।

মারধোর? তার মানে?

তোমার বড় মেয়ে ফিরে এলে তার কাছেই সব শুনতে পাবে। এ পাড়ার নাড়ী-নক্ষত্র তারই হাতে।

মৃগেনবাবু বললেন, ভাস্বতী! সে কেন যায় ওদের বাড়ী?

তরুবালা বললেন, কোন্ বাড়ীতে সে যায় না? পাড়ার মেয়েমহল যে তা'র কথায় ওঠে-বসে! দরকার হ'লে এক বাড়ীতে গিয়ে কুটনোবাট্না সেরে দিয়ে আসে, আবার রুগীর সেবাতেও তা'র অরুচি নেই। পাড়ায় ওর কত নামডাক, তা জানো?

জানলুম!—মৃগেনবাবু জবাব দিলেন।

তরুবালা পাড়ার গল্প আরম্ভ করলেন। পাঁচ নম্বর বাড়ীর কানা-বৌটির হাঁপানির রোগ,—তার স্বামী কাজ করে এক মণিহারির দোকানে,—একদিন সেখানকার তহবিল ভেঙে বুঝি পুলিশে ধরা পড়ে। ওই যে মোড়ের মাথায় হোমিওপ্যাথী ডাক্তার হেমন্তবাবু, ওর বাড়ীতে কাপড় চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে রঘু মিত্তিরের বিধবা বোনটা। দুপুর বেলায় বেরোয়, সবাই তখন ঘুমিয়ে, পাড়া-পল্লী নিঃঝুম,—রঘু মিত্তিরের বোন শুকনো দুখানা কাপড় টেনে নিয়ে গা-ঢাকা দিচ্ছিল,—অমনি পিছন থেকে ছুটে এসে জাপটে ধরে চাটুয্যেদের ঠিকে-ঝি; আর যাবে কোথা!

মৃগেনবাবু স্ত্রীর দিকে তাকালেন। বললেন, এসব কি সম্ভব?

তরুবালা বললেন, তোমার যেমন কথা। তোমাদের কালে কি এসব ছিল যে তোমার বিশ্বাস হবে? সে সব দিন আর নেই। ওই যে শ্রীপতিবাবুর বাড়ীর মেয়েরা বড়ি বিক্রি করতে যায়, জামা-সেমিজ কাটে, পুরনো কাপড়ের ন্যাকড়া কেটে পুতুল সেলাই করে,—আজকাল অনেক ঘরে এই সব চলছে, তুমি জানো কতটুকু? যাদের বাড়ীতে দশখানা রেশন কার্ড—তাদের অনেকেই বানিয়ে রেখেছে পনেরখানা। ঝিয়েদের সঙ্গে ভাব ক'রে কত বাড়ীর গিন্নি বাজারে চড়া দামে চা'ল বিক্রি করতে পাঠায়! নইলে সংসার কি এমনি চলে?

মৃগেনবাবু কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। পরে বললেন, তোমার নিজের ঘরকন্নাটা চলছে কেমন ক'রে বলো দেখি?

তরুবালা বললেন, আর পাঁচজনের গল্প শুনে বুঝতে পারো না কেমন ক'রে চলছে? পঁয়তাল্লিশ টাকা বাড়ী ভাড়া, আর তোমার বোন পায় দশ টাকা মাসোহারা! তোমার দুশো পঁচিশের থেকে যা বাকি থাকে, তাইতে নয়জনের জীবন-ধারণ। এ সব কথা তুমি নাই শুনলে!

সন্ধ্যার আলোটা এখনও পর্যন্ত জ্বলেনি, কেন না, আলোর খরচটা না কমালে চলবে না। মৃগেন শান্ত কণ্ঠে বললেন, তুমি কি অতনুর কাছে টাকা নাও?

তরুবালা বললেন, তোমার টাকা অতনুর হাতে মাসে-মাসে আমি তুলে দিই। আর কিছু আমি জানিনে।

মৃগেন বললেন, কথাটা অস্পষ্ট কিছু থাকে না, একথা তুমিও জানো। কিন্তু এ অসম্ভ্রম আর কতদিন সইবে?

তরুবালা চুপ ক'রে গেলেন। মৃগেন পুনরায় বললেন, ছেলেমেয়েরা তোমার বড় হোলো, কিন্তু মানুষ হোলো না। দীপেন কি আজো সেই ফ্ল্যাগ উড়িয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়?

মুখ ফিরিয়ে তরুবালা বললেন, তুমি ওকে ডেকে ধমকধামক দিলেই পারো। একালের হাওয়া যদি গায়ে লাগে, আমি কি করবো? তুমি শক্ত হলে আমার ভাবনা কি ছিল?

অতনু কিছু বলে না?

বলতে গিয়ে অতনু মান খোয়াতে চায় না!

বাইরে যেন কা'র পায়ের শব্দ হোলো। যমুনা সন্ধ্যার আলোটা হাতে

নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। তরুবালা বললেন, ওরে, বরুণাকে ছাদ থেকে নেমে আসতে বল্—পরের ছাদে অতক্ষণ আর থেকে কাজ নেই।

আলোটা রেখে যমুনা বললে, ছাদে ত' সে নেই মা?

তবে?

মেজদার সঙ্গে সে যেন গেল কোথায়!

মৃগেন প্রশ্ন করলেন, কোথায় গেল?

সে ত' প্রায়ই যায়, বাবা! কোথায় যায় ওরা জানিনে।

মৃগেন তরুবালার দিকে তাকালেন। তরুবালা বললেন, তুই যা যমুনা, কাঠকুটো দিয়ে উনুনটা ধরিয়ে দে।

যমুনা চ'লে যাবার পর তরুবালা বললেন, মেয়েরা বড় হয়েছে, অথচ লেখাপড়াও তুমি একটু আধটু শেখাতে পারলে না। বিয়ে-থা হয়ে গেলেও বা কথা ছিল! ওরা এত বাঁধাবাঁধি আর একঘেয়ে ঘরকন্নার মধ্যে থাকতে চায় না। ওদেরও ত' একটু নিশ্বেস ফেলা চাই!

মৃগেন বললেন, মিথ্যে বলোনি। কিন্তু বরুণা যায় কোথায়?

কোথায় আবার যাবে! তোমার যত সব মিথ্যে ভয়ভাবনা—তরুবালা বললেন, পরণে একখানা ভালো কাপড় নেই,—অত বড় বড় মেয়ে, ওদের জন্যে একটু তেল-সাবান জোটাতে পারিনে! দিনরাত মুখ কাঁচুমাচু ক'রে ঘরকন্নার ঘানিতে ঘোরে! ওদের দিকটাও ত' দেখতে হবে? যাবে আবার কোথায়, ঠাকুর-বাড়ীতে গিয়ে ব'সে আছে।

মৃগেন বললেন, তুমি কি বলছ, চুপ ক'রে থেকে সবটা শুধু দেখে যাবো? একটা কথা মনে রেখো ছোট বৌ, তোমার ওই মেজ ছেলেটি ভেতরে ভেতরে পাথর কাটে।

তুমি তার ভালো ব্যবস্থা করলেই পারো!—এই বলে তরুবালা উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ভাস্বতী এসে দাঁড়ালো। হাতে তা'র এক পেয়ালা গরম চা।

হাসিমুখে ভাস্বতী কাছে এসে চায়ের পেয়ালা রেখে বললে, আমি বলি তুমি চা বুঝি এতক্ষণে খেয়েছ! ওরা মাথায় বড় হ'লে কি হবে, বুদ্ধি-বিবেচনা এতটুকু হয়নি!

তরুবালা বললেন, দুধ জোটালি কোত্থেকে? চিনি পেলি কোথায়?

ভাস্বতী হেসে উঠলো,—এত বড় কলকাতা শহর, এইটুকু জুটবে না, এ কেমন কথা? তুমি বুঝি বাবার কাছে আবার তোমার সাতকাণ্ড আর আঠারো পর্ব ফেঁদে বসেছ? তোমার ওই ভাত-চচ্চড়ির গল্প শুনে শুনে আমাদের কান ঝালাপালা। বাবা, চা ঠাণ্ডা ক'রো না!

মৃগেন এতক্ষণ পরে এবার একটু হাসলেন। তারপর সোজা হয়ে ব'সে চায়ে চুমুক দিলেন। ভাস্বতী বসলো তাঁর পায়ের কাছে। তারপর বললে, কিছু কি হবার যো আছে? কোনো উপায় নেই। কেউ সত্যি বলে না! কারো ভাল কেউ সইতে পারে না। যদি কাউকে বলি, নিঃস্বার্থভাবেই তোমার এই কাজটি ক'রে দিচ্ছি,—কেউ বিশ্বাস করে না, উল্টে সন্দেহ করে! প্রশংসা করলে মনে করে তোষামোদ, হাত তুলে কিছু দিলে মনে করে এ একটা বড় রকমের কৌশল, ভালো কথা বলতে গেলে ঠাট্টা ক'রে ওঠে,—এদের নিয়ে কিচ্ছু হবে না, বাবা।

চায়ের পেয়ালা শেষ ক'রে মৃগেন বললেন, কা'র কথা বলছ, মা?

সকলের কথাই বলছি, এ পাড়ায় যত লোক আছে! তুমি আমি কেউ বাদ নেই।

অতনু ঘরের দরজায় কখন এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ লক্ষ্য করেনি। এতক্ষণ সে হাসছিল। এবার সে বললে, ব্যাপারটা কি জানেন, মেসোমশাই? আপনার বড় মেয়ে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যায়, কিন্তু গালে চড় খেয়ে ফিরে আসে।

যমুনা এসে কখন যেন পাশে দাঁড়িয়েছিল। ফস ক'রে এবার বললে, গায়ে প'ড়ে লোকের ভালো করতে যাওয়াই বা কেন? নিজের ঘর ভাসিয়ে পরের ঘর গুছোবার দরকার বা কি?

কথাটা সকলের পক্ষেই অস্বস্তিকর ঠেকলো। অতনু আর হাসতে পারলো না। তরুবালা তাঁর মেয়ের দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে বললেন, ওজন বুঝে কথা বলতে শেখ্ যমুনা—ভাস্বতী তোর চেয়ে বয়সে অনেক বড়!

বড়র মতন থাকলেই হয়!—এই বলে যমুনা সেখান থেকে চ'লে গেল। মৃগেন নিস্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন। মেয়েদের মনে যে অসন্তোষ জমে উঠছে, এ আবিষ্কার তাঁর পক্ষে বাকী ছিল। অন্যদিকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

এমন সময় শীলু এসে ঢুকলো ছুটতে ছুটতে। বললে, দিদিমা, আমি কিন্তু খুঁজে এলুম, মেজমাসি ঠাকুরবাড়ীতে যায়নি!

তরুবালা বললেন, তবে?

মেজমামার সঙ্গে সিনেমায় গেছে! পাশের বাড়ীর বড় একটা মেয়ে ওকে ভালো একখানা শাড়ী পরতে দিয়েছে, দিদিমা! মেজমাসি কেমন সাজ গোছ ক'রেছিল!

চুপ ক'রে গেল সবাই। অতনু আড়চোখে একবার তাকালো ভাস্বতীর দিকে, ভাস্বতী আড়ষ্ট হয়ে ব'সে রইলো। তরুবালা উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। শীলু গেল দিদিমার পিছু পিছু।

সেই অস্বাতিকর নীরবতাটা ঘরের মধ্যে তখনও জমাট বেঁধে ছিল। মৃগেন্দ্র মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, অতনু?

অতনু কাছাকাছি এসে মেঝের উপরেই বসে পড়লো। মৃগেন বললেন, তুমি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছ প্রায় ছয় বছর হ'তে চললো; কিন্তু খাকি রংয়ের জামা আজো ছাড়তে পারোনি, কেন বলো ত'?

অতনু হাসলো। বললে, মন চাইছে যুদ্ধ আবার বাধুক, সেইজন্যেই এ জামা আজো ছাড়িনি, মেসোমশাই।

এই সর্বনেশে যুদ্ধ আবার চাও তুমি?

চাইনে বটে, কিন্তু আর একবার যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো প্রতিকার নেই।

ভাস্বতী প্রশ্ন করলো, তার মানে?

অতনু বললে, মানেটা আছে আমার মনের মধ্যে। সে কথা যুদ্ধ বাধলে বলতে পারবো।

মৃগেন বললেন, মনে হচ্ছে, তুমি কাজকর্ম সবই ছেড়ে দিয়েছ। তুমি কি আর ডাক্তারি করতে চাও না?

অতনু জবাব দিল, ছোট ভাই মানুষ হয়েছে, বোনেরও বিয়ে হয়ে গেছে। মায়ের ব্যবস্থা বাবাই ক'রে গেছেন। আমি নিজের জন্যে আর ভাবিনে।

মৃগেন বললেন, কিন্তু এ বাড়ীর ঘরকন্নার বোঝা মাথায় নিয়েই বা তুমি কদ্দিন দাঁড়িয়ে থাকবে, অতনু? এর জালে তোমার পা-ই বা জড়িয়ে থাকে কেন?

অতনু বললে, মনে করেছিলুম, দীপেন আর দ্বিজেন আনতে শিখলেই

আমি ছুটি নেবো; কিন্তু ওদের আজও কোনো সুরাহা হয়নি। চলতি ব্যবস্থাটা যুদ্ধের সময় সকলেরই বদ্‌লে গিয়েছিল; কিন্তু একালের ছেলে-মেয়েদের স্বভাব-চরিত্রও যে ওই সঙ্গে বদ্‌লে গেছে—একথা দূর থেকে আমার মনে হয়নি, মেসোমশাই। সেইজন্য আমি যখন আবার ফিরে এসে দাঁড়ালুম—এক ভাস্বতী ছাড়া আর কাউকেই আমি চিনতে পারিনি।

ভাস্বতী বললে, কিন্তু আমার ইচ্ছে, তুমি এবার সত্যিই ছুটি নাও, অতনু।

মৃগেন্দ্র হঠাৎ হাসলেন। বললেন, অতনুকে তুই আজো নাম ধ'রে ডাকিস, মা?

ভাস্বতী হাসিমুখে বললে, মুটে-মজুর বুড়ো হ'লে কি কেউ তাকে আপনি-আজ্ঞে বলে, বাবা?

মৃগেন্দ্র এবার খুব হেসে উঠলেন। হাসিতে অতনু আর ভাস্বতীও যোগ দিল। তারপর অতনু বললে, আমি ছুটি নিলে মাসিমা আর ভাস্বতী যদি চালাতে পারে, সে ত' ভালই।

ভাস্বতী বললে, চলবে কিনা জানিনে, তবে চালাবার চেষ্টা করবো। বাবা, তোমাকে আমি সত্যি কথাটাই বলি, অতনুর এভাবে জড়িয়ে থাকাটা এখন আর কারো ভালো লাগছে না। ওকে এবার স'রে দাঁড়াতে বলো তুমি।

অতনু আবার হাসলো। বললে, বেশ ত, সুপারিশ ধরতে হবে না, তোমার কথাই স্বীকার ক'রে নেবো। ভয় করে, পাছে তোমাদের নিজেদের মধ্যে অশান্তি বেধে ওঠে।

ভাস্বতী বললে, অর্থাৎ তোমার শাসনের ভয়ে এ বাড়ীর সবাই চুপ ক'রে থাকে, এই ত'? কিন্তু ভয় থেকেই অশ্রদ্ধা, মনে রেখো তুমি। ওদের ভেতরে ভেতরে অসন্তোষ জমে উঠেছে কিনা, তুমি খবর জেনেছ?

অতনু চুপ ক'রে রইলো। মৃগেন্দ্রর চক্ষুরুন্মীলন ঘটছে। এসব ভিতরের কথা তাঁর জানা থাকে না, জানাটাও সহজ নয়। এতকাল ধ'রে তিনি ছিলেন যন্ত্রবৎ,—চাকাটা ঘুরতো, সেই চাকার সঙ্গে তিনি বাঁধা থাকতেন। তাঁর পঞ্জরাস্থি থেকে জন্ম নিয়েছে এই সংসারটা; তিনি একক, কিন্তু বহুধায় প্রকাশিত। ওই পর্যন্তই, তারপর তিনি নির্লিপ্ত। তিনি কর্তা নন, তিনি কর্ম,—ফলাফল তাঁর হাতে নেই। কর্মজীবনের কারখানায় যে প্রকাণ্ড যন্ত্রটা গতিশীল, তিনি তারই একটা ক্ষুদ্র অংশ, সেইটুকুই তাঁর অস্তিত্ব। এক

সময়ে তিনি প্রশ্ন ক'রে বসলেন, এ ঘরকন্নায় তোমার কতটুকু আর্থিক সাহায্য থাকে, অতনু?

অতনু বললে, আমার ছুটি নেবার কথাটা উঠতে পারে মেসোমশাই, কিন্তু একথাটা ওঠে কি?

মৃগেন্দ্র চুপ করলেন, কিন্তু কথা ব'লে উঠলো ভাস্বতী। বললে, ওর মুখ থেকে একথা কি তুমি বা'র করতে পারবে, বাবা? এখানে তোমার মান-অপমানের কথা ওঠে ব'লেই আমি অতনুকে স'রে যেতে বলছি। ও গেলে সংসার বাঁচবে কিনা জানিনে, কিন্তু আমাদের মান বাঁচবে। ও গেলে হয়ত দীপেন-দ্বিজেনও নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা পাবে।

ভাস্বতীর কণ্ঠে কোথাও বাষ্পাচ্ছন্নতা নেই। সে যা বিশ্বাস করে, তা বলে। তা'র কোনো পরিবর্তন আজো ঘটেনি। পনেরো বছরে তার আচরণে যে অকুণ্ঠ স্পষ্টতা ছিল, তিরিশ বছরেও তা'র কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তা'র শান্ত অভিমতের মধ্যে যে কাঠিন্য লুকিয়ে থাকে, তার নিহিতার্থ অতনুর অজানা নয়। ভাইবোনেরা আর অতনুর অভিভাবকত্ব বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয়,—অতনু সেই বিরক্তি থেকে আত্মরক্ষা করুক। অতনু নির্লিপ্ত থাকলেই অতনুকে জানবার সুবিধা হবে, নিরাসক্ত হ'লেই তা'র সত্য মূল্য জানা যাবে। মুক্তির মধ্যেই অতনুর নির্ভুল চেহারা প্রকাশ পাবে। ভাস্বতী এইটিই চায়।

রাত হয়ে গেছে। অতনু সেদিনকার মতো বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো। উঠোনে নামবার আগে গলিপথটা একটু অন্ধকার। সেখান দিয়ে এগিয়ে আসতেই দেখা গেল, যমুনা একা দাঁড়িয়ে রয়েছে এক পাশে। কুড়ি-একুশ বছর বয়সে হয়ত নৈরাশ্যনিশ্বাস নিয়ে মেয়েরা অমনি ক'রেই অন্ধকারে একান্তে দাঁড়িয়ে থাকে—আশা আর আশ্বাস যাদের চোখের সামনে কোথাও কিছু নেই!

এখানে দাঁড়িয়ে কেন রে, যমুনা?

এমনি।

অতনু কাছে এলো। তারপর বললে, বড় বোনের মুখের ওপর কি অমনি ক'রে কথা বলতে আছে রে?

ফোঁস ক'রে উঠলো যমুনা। বললে, কেন বলবো না? তোমার তাতে কি? ওকে বললে তোমার গায়ে লাগে কেন? ওর জন্যেই ত' আমাদের এত ভোগান্তি।

অতনু একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। বোধ হয় কোনও কঠিন কথাই তা'র মুখে এসেছিল। কিন্তু নিজেকে সংবরণ ক'রে নিয়ে হাসিমুখে সে বেরিয়ে গেল। মেয়েটার জ্ঞান হয়নি।

দশ বছর আগেও সংসারটার তোড়জোড় অত আল্‌গা ছিল না। সাচ্ছল্য ছিল না, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। লোলুপতা সেদিনও ছিল, কিন্তু সম্মিলিত লোভের আক্রমণশীলতা ছিল না এখনকার মতো। মানুষের মহানুভবতা স্বীকৃতিলাভ করতো সেদিন, আজকের মতো এমন উপহাসের বস্তু ছিল না। আত্মাভিমান ছিল,—এমনতরো আস্ফালন ছিল কি?

...ির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দীপেন প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো। বললে, সস্তা উপদেশের দরকার হ'লে পুরনো বইয়ের দোকানে গিয়ে দাঁড়াবো, বাড়ী ঢুকে তোমার বুক্‌নি না শুনলেও আমার চলবে, বড়দি।

হাসিমুখে ভাস্বতী বললে, রাস্তায় হল্লা ক'রে তুই এমন কি আনন্দ পাস?

দীপেন বললে, আনন্দ না পাই, আশ্বাস পাই ত' বটে। বাঁচবার জন্যে কামড়াবো, মরবার আগে নাড়া দেবো। ভালো খাবো আর ভালো থাকবো, এই দুটো আশ্বাসের দাম তুমি কি বুঝবে? যারা একজনের ঘাড়ে খায়, আরেকজনের ঘাড়ে থাকে এবং আরেকজনের মুখ চেয়ে প্রাণধারণ করে, তা'রা আমাদেরকে বুঝবে কতটুকু?

ভাস্বতী বললে, জন্তু-জানোয়ারেরা কথা বলে না তাই রক্ষে, কথা বললে এই ভাষাই তাদের মুখে শুনতে পেতুম!

দেশী সিগারেটের ধোঁয়া মুখ থেকে ছেড়ে দীপেন বললে, বিনামূল্যে শ্রদ্ধা পাওয়া তোমাদের অভ্যেস, কিন্তু শ্রদ্ধা যেখান থেকে জোটে না, সেখানেই তোমরা চ'টে ওঠো। আমরা রাস্তায় হল্লা করলেই তোমাদের ঘর কাঁপে, কেন না, অনেকগুলো পায়ের শব্দ এক সঙ্গে শুনলে তোমরা ভয় পাও। তোমার উপদেশ আমি শুনবো, এমন অধঃপতন আমার হয়নি; কেন না, মেয়েমানুষের মতামত আর টিয়াপাখীর বোল্‌—দুটো একই। তোমাদেরকে নাচালেই তোমরা নাচো, সেইজন্যেই তোমাদের সহ্য করি, সেইজন্যেই খুশী থাকি।

দীপেন বয়সে অনেক ছোট, একদিন কাছে বসিয়ে ভাস্বতী তাকে বর্ণমালা শিখিয়েছিল, সেই কারণে স্নেহের হাসি সর্বাগ্রেই তা'র মুখে এলো। সহাস্যে

সে বললে, আচ্ছা, না হয় বুঝলুম তোর মনের কথা। এমনি ক'রে তোর না হয় চলবে, ঘর চলবে কেমন ক'রে?

ঘর!—দীপেন সিগারেটে টান দিল। বললে, ঘরের আইডিয়া তোমাদের জন্যে, আমাদের জন্যে নয়। মেয়েদেরকে ডিম পাড়তে হবে, তাই তাদের নিরাপদ আশ্রয়ের দরকার, আমাদের সে গরজ নেই। ঘর ভেঙেগ দেবো আমরা, ভেঙেগ ছড়িয়ে দেবো রাস্তায় রাস্তায়! সবাই খেটে খাবে, খুঁটে খাবে।

ভাস্বতী শান্তকণ্ঠে বললে, খবরের কাগজ-পড়া বিদ্যে এই পর্যন্ত এসে থামলেই খুশী হবো, কিন্তু—

দীপেন হো হো ক'রে হেসে উঠলো। ভাস্বতী পুনরায় বললে, কিন্তু বাবার বয়েস হয়েছে, তাঁর বোঝা না কমালে এবার থেকে চলবে কেন?

যমুনা এবার সামনে এসে দাঁড়ালো। চোখ পাকিয়ে সে বললে, যে কথা বলছ, সে কথা তোমার ওপর খাটে না, বড়দি? তুমিই বা কোন্ বাবার বোঝা হাল্‌কা করেছ?

তরুবালা বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। এদের মধ্যে দাঁড়িয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট না ক'রে দীপেন তখনকার মতো বেরিয়ে গেল। সামনে এসে তরুবালা চোখ পাকিয়ে বললেন, তোকে সব কথায় ফোড়ন দিতে কে ডাকে, শুনি? কই, দীপু হতভাগা গেল কোথায়? আজ পাঁচদিন হোলো অন্তুটা জ্বরে ভুগছে, ওকে না ডাক্তারের ওখানে পাঠিয়েছিলুম!

বাইরের দিকে এসে দীপেনের কানে কথাটা গিয়েছিল। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সে আবার ভিতরে এলো। বললে, পাঁচদিন জ্বরে ভুগছে, ওর দরকার রক্ত-পরীক্ষা। যদি ব্যাসিলি পাওয়া যায়, তবে আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। তোমাদের হাতে ওর যত্ন-আত্যি চলবে না, হাসপাতাল থেকে নার্স আনতে হবে। আর যদি কোনো হোমে রাখো, তাহলে দৈনিক চল্লিশ টাকা। অনেক বড় ডাক্তার আমার জানা। সেসব ডাক্তার তোমার এই এঁদোপড়া ঘরে আসতে চাইবে কেন? ছেঁড়া কাঁথায় রুগীকে দেখলে সেখানে আমার প্রেস্‌টীজ থাকবে? একি তোমার অতনু ডাক্তার? হাতুড়ে বদ্যি?

তরুবালা অবাক হয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর মুখে একটি কথাও সরলো না। যমুনা অপাঙেগ একবার ভাস্বতীর দিকে তাকালো,

তারপর বললে, দাদা সব সময় সত্যি কথা বলে কিনা, তাই ও সকলের দুচোখের বিষ।

সমস্ত আবহাওয়াটায় একটা বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে যমুনা সেখান থেকে চলে গেল।

তরুবালা বললেন, তোকে আমি ডাক্তারের বাড়ী যেতে বলেছিলুম, এত লম্বা-চওড়া কথা তুই আমাকে শোনাতে এলি কেন?

দীপেন বললে, তোমার বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে ত' আর ডাক্তারি চলে না, মা। এ রোগ যে সাংঘাতিক নয়, তুমি কেমন ক'রে জানলে? অতনু ডাক্তারের বিদ্যে সব জায়গায় খাটে না, তা জানো?

হাসিমুখে ভাস্বতী বললে, তুই ত' সব পারিস, টাকা কিছু আনতে পারিস?

নিশ্চয় পারি!—দীপেন বললে, টাকা আনতে পারি ব'লেই ত' আমার গলাটা এত উঁচুতে ওঠে! কিন্তু টাকা আনলে পড়বে কাদের হাতে, সেকথাটাও আমার জানা দরকার বৈকি। যারা ঘরে পুঁজি করে, আর পরের পরিশ্রমে ব'সে ব'সে খায়—টাকা এনে তাদের আস্কারা দেবো, এমন শিক্ষা আমাকে বাবা দেননি।

ভাস্বতী বললে, কিন্তু তারা যদি মা-বোন হয়?

মা-বোন! ওটা ত' 'বাই এক্‌সিডেণ্ট্‌'! তুমি বুঝি আর কিছু না পেরে আমার সেণ্টিমেণ্টে সুড়সুড়ি দিতে চাও বড়দি!—দীপেন হাসতে হাসতে সেখান থেকে বেরিয়ে তা'র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজে চ'লে গেল।

তরুবালা কী করবেন? সমস্ত শরীরের মধ্যে তাঁর যেন জ্বালা ধরেছিল, হাত পা যেন নিসপিস করছিল,—কিন্তু উপায় কিছু নেই। এরা বর্তমান, এরাই ভবিষ্যৎ—এদের কাছেই তাঁকে বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। এরা অনেক কথা শিখেছে, অনেক পথ চিনেছে, অনেক রহস্য জেনেছে, এদের সঙ্গে আর পেরে ওঠার উপায় নেই।

তিনি আবার ফিরে গেলেন রান্নাঘরের দিকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। ভাস্বতীও যাচ্ছিল অন্তুর ঘরের দিকে, এমন সময় অতনু এলো এবং তা'র পিছনে পিছনে আরেকটি ভদ্রলোক।

অতনু বললে, আসুন ডাক্তারবাবু এই ঘরে—

তৃতীয় ঘরখানা একটু যেন অন্ধকার। কেমন যেন বুকচাপা ঝাপসা ভিতরটা। ঘরের জিনিসপত্র বিছানা-মাদুর সবই এলোমেলো অগোছালো। বুঝতে পারা যায়, সকাল থেকে এ ঘরে বাসিপাট এখনও সারা হয়নি। ঘরের এক কোণের মেঝেতে দরিদ্র বিছানার ওপর শুয়ে রয়েছে বছর আষ্টেকের একটি ছেলে এবং মাথার কাছে বসে শীলু হাওয়া দিচ্ছে। ঘরের এ কোণে একখানা আধময়লা আয়নার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে বরুণা নিজের মনে চুল আঁচড়াচ্ছিল। মৃগেনবাবু যথাসময়ে আপিসে বেরিয়েছেন, সুতরাং পাশের ঘর থেকে শ্রীমান্ দ্বিজেনের গুন্‌গুনানি গান শোনা যাচ্ছিল।

ডাক্তারবাবু রোগীর ঘরে ঢুকতেই বরুণা চম্‌কে উঠে আয়নার সামনে থেকে স'রে গেল, এবং ভাস্বতী দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে দ্বিজেনের গান বন্ধ ক'রে এলো।

ডাক্তার রোগীর পাশে এসে ব'সে রোগীকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর তিন চারটি প্রশ্ন ক'রে সন্তোষজনক জবাব পেলেন। মাথার কাছে ব'সে শীলু বাতাস করছিল। ডাক্তার তা'র দিকে সহাস্যে চেয়ে বললেন, মেয়েটি ভারী সুশ্রী ত? নাম কি তোমার?

শীলু!

কোন্ ক্লাশে পড়ো তুমি?

অতনু হাসিমুখে বললে, এখন কোথাও পড়ে না। দশ বছর হ'লে তবে ইস্কুলে যাবে!

সবিস্ময়ে ডাক্তার বললেন, দশ বছর হয়নি! আমি মনে করি বারোর কাছাকাছি। বেশ বেশ, ছেলেমেয়েদের এমন স্বাস্থ্য দেখলে আমাদের খুব আনন্দ হয়। আমি উঠি—

ভাস্বতী প্রশ্ন করলো, কেমন দেখলেন?

হাসিমুখে ডাক্তার বললেন, না এলেও চলতো আমার। কিছু ভয় নেই, আজই জ্বর ছাড়বে। আমি গিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দেবো, সন্ধ্যার পরে এক দাগ, কাল সকালে এক দাগ—বাস, পরশু ভাত দেবেন। অতনু মিথ্যেই আমাকে আনলো।

অন্তুর মাথায় একবার হাত বুলিয়ে ডাক্তার উঠে পড়লেন। তারপর পুনরায় ভাস্বতীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আপনার সেই রোগীটির খবর কি?

অতনু বললে, কোন্ নম্বর রোগীর কথা বলছেন?

ডাক্তার ও ভাস্বতী দুজনেই হাসলো। ডাক্তার বললেন, সেই গ্যাংগ্রিন-রোগীটির কথা বলছি।

ভাস্বতী বললে, আপনি ত' তাকে এক রকম ছেড়েই দিলেন, কিন্তু সবাই ছাড়লে তা'র চলবে কেমন ক'রে বলুন?

ডাক্তার বললেন, কি জানেন, শুধু গ্যাংগ্রিন নয়, আরো অন্য রকম ব্যাপার আছে। এসব রোগী শুধু ভোগে, ভালো হয় না। আমার বিদ্যে যা ছিল, সবই ওর ওপর শেষ করেছি। তবে একটা কথা আপনাকে জানাই, ওর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ওর ছোঁয়াচ থেকে আপনার এখন দূরে থাকাই ভালো।

ভাস্বতী হেসে উঠলো। ডাক্তার নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন।

মৃগেনের ঘরে এসে ওরা বসলো। অতনু বললে, ডাক্তারের কথাটা কানে গেল কি?

ক্ষুণ্ণকণ্ঠে ভাস্বতী জবাব দিল, তুমি কি বলতে চাও, সব ফেলে পাড়া ছেড়ে পালাবো? ওর বাড়ীর লোক ওর ঘরে ঢোকে না, আমি যদি কাছে না যাই, ওর চলবে কি করে? ওর বাঁচবার কোনো আশা নেই জানি, তবু মরা পর্যন্ত একটু স্বস্তি পায়, এই চাই।

এর পরে বক্তব্য কিছু নেই, হিতোপদেশের কথাটা বাহুল্য মাত্র। অতনু কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে, শোনো, আর একটা কথা তোমাকে স্পষ্ট ক'রে জানাই। গৃহস্থের সম্মান রাখার দায়িত্ব মেয়েদের হাতে, একথা স্বীকার করো ত?

করি।

কিন্তু এ বাড়ী থেকে যদি কোনো কথা রটে, যদি নোংরা কথা ওঠে, তাহলে এ বয়সে মেসোমশাই তা সহ্য করতে পারবেন?

ভাস্বতী তা'র মুখের দিকে তাকালো। অতনু বললে, তোমার বোনেদের মানসম্ভ্রম বাঁচাবার দায় তোমার আর মাসিমার হাতে, তা জানো?

ভাস্বতী হাসিমুখে বললে, তুমি কি তিরিশ পেরিয়ে এসে ডাক্তারি ছেড়ে চরিত্রনীতিরক্ষার কাজে নামলে?

তামাসার কথা নয়, ভাস্বতী।

তাই ব'লে আমি বড় বড় মেয়েদের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করবো, এই বলতে চাও? আমার সম্বন্ধে ওদের মনোভাব কি তুমি জানো না? ওদের যখন সত্যিকার শিক্ষার দরকার ছিল, তখন তুমিই বা ওদেরকে ফেলে যুদ্ধে গিয়েছিলে কেন?—ভাস্বতী বললে, কিছু দরকার নেই, তুমি যাও তোমার নিজের কাজে—ওদের দায়িত্ব ওদেরই বইতে দাও।

অতনু বললে, তা'তে শেষরক্ষা হবে?

শেষের কথা শেষকালেই ভাবা যাবে, অতনু।

অতনু বললে, আর কিছু নয়,—সম্ভবত এ বাড়ীর সঙ্গে আমার বত্রিশ নাড়ীর বাঁধন, তাই ভয়ে ভয়ে থাকি।—এই ব'লে সে উঠে পড়লো।

ভাস্বতী এগিয়ে এসে হাসিমুখেই বললে, লেক্‌চার দেবার সুযোগ পেলে তুমি আর ছাড়ো না! বত্রিশ নাড়ীর বাঁধনটা কা'কে বলে, ডাক্তার হয়েও তুমি ছাই জানো। হিসেববুদ্ধি তোমার হয়নি ব'লেই বিয়ে করতে বলেছিলুম। বাঁধন না আমার মুণ্ডু। পুরুষ মানুষের আসল মনের কথাটা দশ বছরের মেয়েও বোঝে।

অতনু হাসলো। হেসে বললে, দেখা যাচ্ছে, লেক্‌চার দিতে পারলে তুমিও ছাড়বার পাত্রী নও। তোমার ওই দীপেন ঠিকই বলে, মেয়েমানুষ হোলো জন্মবোকা, তাই তাদের বরদাস্ত করি।

ভাস্বতী বললে, বলবে বৈকি, জন্ম-বোকাদের গর্ভেই বুদ্ধিমান পাষণ্ডদের জন্ম। বলতেই পারে!—যাক্‌ শোনো একটা কথা—

অতনু দাঁড়ালো। বললে, কি বলো।

টাকা দাও।

টাকা!

ভাস্বতী বললে, অপব্যয় করবার মতন টাকা দিয়ে যাও।

অতনু বললে, কোন্‌ অধিকারে নেবে?

ভাস্বতী হেসে উঠলো। বললে, দেড় বছরের মেয়ে আর ছ' বছরের নাবালক—সেই প্রথম আলাপের অধিকার থেকেই টাকা নেবো! দাও—

অতনু বললে, তাহলে আর হাত পেতে চাইবার দরকার নেই, এক সময় গিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে এসো। কিন্তু টাকা ত' নিজের জন্যে চাইবে না, জানি, তবে?

পরের টাকা উড়িয়ে আনন্দ পেতে চাই!

অতনু হেসে বেরিয়ে চ'লে গেল।

দুই

বাইরের থেকে কে যেন ডাকলো। পোশাকী শাড়ীখানা গায়ে জড়াতে জড়াতে বরুণা জানলার ফাঁক দিয়ে একবার সেইদিকে তাকালো, তারপর ছুটে বেরিয়ে গিয়ে মাকে ডাকলো।

তরুবালা প্রশ্ন করলেন, কে রে?

বরুণার মুখে চাপা হাসি লুকানো ছিল। বললে, আমি কি দেখেছি? তুমি গিয়ে জিজ্ঞেস করো না! বোধ হয় মেজদাকে ডাকছে কেউ।

তরুবালা বাইরে এলেন। দ্বিজেনের বয়সী একটি ছেলে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তরুবালাকে দেখেই সে বললে, আমি সুশান্ত। দ্বিজেন আছে?

সে ত' বাড়ী নেই, বাবা।

ও, বাড়ী নেই? আমাকে সে আসতে বলেছিল এই সময়টায়। বরুণা দেবী আছেন?

বরুণা মায়ের পাশে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালো, তারপর দুজনে নমস্কার বিনিময় করলো। তরুবালা বুঝলেন, দুজনের মধ্যে পরিচয় আছে। পিছন দিকে অদূরে যমুনা এসে দাঁড়িয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। বরুণা সলজ্জ মিষ্টকণ্ঠে বললে, মেজদা হয়ত এখুনি ফিরবে। আপনি আসতে পারেন, একথা তাঁর মুখে শুনেছিলুম!—তারপর দু'পা পিছিয়ে সে চাপা গলায় বললে, তুমি একটুও ভদ্রতা জানো না, মা,—ওঁকে ঘরে এসে বসতে বলো?

তরুবালা কন্যার কথায় আলোকপ্রাপ্ত হয়ে বললেন, এসো না বাবা ভেতরে, একটু বসো—দ্বিজেন ফিরবে এখুনি।

সুশান্ত খুশী হয়ে ভিতরে এলো। কাপড়খানা ছেড়ে ফেলবার জন্য তরুবালা ভিতরে গেলেন। বরুণা এ ঘরে অভ্যর্থনা করার জন্য রয়ে গেল।

বুকচাপা ছোট ঘর, স্যাঁতাপড়া দেওয়াল, হাত উঁচুতে বাড়ালে কড়িকাঠে ঠেকে, ভিতরটা গুমোট,—তারই ভিতরে এসে সুশান্ত একখানা নড়বড়ে তক্তার উপর বসলো। বরুণা হাসিমুখে বললে, আমি ঠিক জানতুম আপনি আসবেন। কিন্তু আমাদের এ ঘরে কি আপনার মতন লোককে মানাবে? এ ঘরে ফ্যান্ নেই, লাইট্ নেই, বসবার সুবিধে নেই! কত কষ্ট হবে আপনার!

সুশান্ত বললে, আপনি যদি এসব কথা বলতে থাকেন, তবে দ্বিতীয়বার এখানে আসা আমার কঠিন হবে। কই, বসুন আপনি?

হ্যাঁ—আসছি আমি—ব'লে বরুণা হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উঠোন পেরোবার আগে মাঝপথে যমুনা দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখেই বরুণা চটে গেল। চাপা গলায় বললে, ওঘরের সামনে যেন যাসনে তুই মেজদি, তোর কাপড়-চোপড় দেখলে আমার মাথা কাটা যায়! এইজন্যই আমি কাউকে আসতে বলিনে এ বাড়ীতে।

যমুনা তখনই কামড় দিল। বললে, দেখিস, মাথা ঠিক রেখে চলিস। মাটিতে পা পড়ছে ত?

দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় বরুণার নেই। ভিতরে বাইরে তা'র যেন জোয়ার লেগেছে। সে ছুটে গেল মায়ের কাছে। তরুবালা একখানা ফর্সা ছেঁড়া শাড়ী ঢেকে-ঢুকে প'রে বেরিয়ে আসছিলেন। বরুণা বললে, মা, জলখাবার না দিলে ত' ভালো দেখায় না।

তরুবালা বিবর্ণমুখে বললেন, জল-খাবার! কিন্তু মাসের শেষ, আমার হাতে ত' কিছু নেই।

বরুণা রাগ ক'রে বললে, এসব মান্যগণ্য লোক জন্মেও কখনো তোমাদের বাড়ী মাড়ায় না, তা জানো?

প্রশংসমান দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে তরুবালা বললেন, এমন লোকের সংগে তোদের কেমন ক'রে আলাপ হোলো রে?

বরুণা এইবার বলবার সুবিধা পেলো। বাঁকা চোখে চেয়ে বললে, তোমার বড় মেয়ে আর মেজমেয়ের মতন আমি যদি কুনো ব্যাং হয়ে থাকতুম, তাহলে এ সৌভাগ্য তোমাদের হোতো না, এ'ও মনে রেখো! তুমি কি মনে করো, আমি

শুধু ঠাকুরবাড়ীতে ব'সে বসেই বিকেল-সন্ধ্যে কাটিয়েছি? লোক-সমাজে মিশতে গেলে পায়ের শেকল খুলে ফেলতে হয়! তুমি দেখে নিয়ো, আমি শিগ্‌গিরই মেয়েইস্কুলে চাকরি নিচ্ছি।

তরুবালা বললেন, ওমা, সে কি? তোর পেটে বিদ্যে কতটুকু?

বিদ্যে!—বরুণা বললে, তোমার ওই বিদ্যের জাহাজ বড় মেয়ে কি করছে? আমাদের ওপর যদি ওর একটুও টান থাকতো তবে দেখতে, ও আমাদের এনে খাওয়াতে পারতো—শোনো, আমার কাছে কিছু পয়সাকড়ি আছে, শিগ্‌গির শীলুকে দোকানে পাঠিয়ে দাও,—খাবারের সঙ্গে চা দিয়ো।

একটু পরেই বরুণা আবার ফিরে এসে এ ঘরে দাঁড়ালো। সুশান্ত হাসি-মুখে বললে, আপনাদের বাড়ীটি বেশ নিরিবিলি জায়গায়! কই, দ্বিজেন কখন্ ফিরবে?

বরুণা রাগ ক'রে বললে, বন্ধুর জন্যে বুঝি বড্ড মন কেমন করছে? আমরা বুঝি কেউ নই?

সুশান্ত বললে, না, তা নয়—অনেক কাজ ফেলে এসেছি কিনা! আজ সন্ধ্যেটা ভারি গুমোট। আপনার বাবা ফেরেননি?

বরুণা বললে, লোকের বাড়ীতে গিয়ে আপনি বুঝি এমনি আড়ষ্ট হয়ে কথা বলেন? আমাদের কত সৌভাগ্য যে, আপনি আজ এসেছেন!

তরুবালা এসে দাঁড়ালেন। বরুণা সোৎসাহে বললে, মা, তোমার সঙ্গে ভালো ক'রে এ'র পরিচয় করিয়ে দিই। ধর্মতলায় আর্ট একজিবিশন্ হচ্ছে শুনেছ ত? ইনি তার সেক্রেটারী। এ'র মামার চমৎকার মোটর গাড়ী আছে, এ'র কাছে সেই গাড়ী দিন-রাত থাকে, ইনিই চালান। সুশান্তবাবু, মামাকে আপনি খুব ভয় করেন, না?

তরুবালা খুশী হয়ে বললেন, তুমি মাঝে মাঝে এখানে এলে আমাদের খুব আনন্দ হবে। ছেলেমেয়ে নিয়েই ত' আমার ঘরকন্না!

কিছুক্ষণ পরেই জলখাবার আর চা নিয়ে শীলু এসে দাঁড়ালো। সুশান্ত ব'লে উঠলো, এ কি করলেন, এ কিন্তু ভারি অন্যায়!

তরুবালা বললেন, তা হোক বাবা, এ সামান্য!

বরুণা বললে, আপত্তি যদি করেন, তবে মেজদাই আপনার বন্ধু থাকবেন, আমরা আর আপনার সঙ্গে কথা বলবো না! এ আপনাকে খেতেই হবে!

দেওয়ালের ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে যমুনা দুজনকে লক্ষ্য করছিল, এবার সে মেঘের মতো মুখ নিয়ে অন্যদিকে স'রে গেল।

সুশান্ত এবার যেন অনেকটা সহজ হয়ে বসলো। অতি মিহিভাবে পূর্ণ ভব্যতা বাঁচিয়ে মুখ নীচু ক'রে একটি শিঙাড়ায় কামড় দিল। বরুণা চোখ টিপে শীলুকে বাইরে পাঠিয়ে দিল। সুশান্ত একবারটি মুখ একটু তুলে তরুবালার দিকে তাকিয়ে বললে, আপনারা এখানে ওখানে বেড়াতে যান্ নিশ্চয়ই? আমাদের আর্ট একজিবিশনে একদিন গেলে ভারি খুশী হবো।

তরুবালা বললেন, হ্যাঁ, তা যাবো বৈ কি। তবে ওই আমার ছেলেমেয়েরাই ওসব নিয়ে আমোদ করে, ওদের ত' এখন ঐসব আমোদ আহ্লাদেরই বয়েস।

সুশান্ত বললে, আমার ইচ্ছে, আপনার মেয়ে যেন ব'সে না থাকেন। আজকাল চেষ্টা-চরিত্র করলে ভালো কাজ-টাজ পাওয়া যায়। আর উনি যে রকম চমৎকার কথাবার্তা বলেন, তা'তে ওঁর কাজের কিচ্ছু অভাব হবে না!

তরুবালা বললেন, ও কি কিছু কাজ জানে, সুশান্ত?

নামযুক্ত সম্ভাষণ শুনে সুশান্ত মনে মনে যেন আরো কাছে এলো। মেয়েরা যাকে আপনজন মনে ক'রে, তাকে তা'রা টেনে নিয়ে যায় অন্দরমহলে, একেবারে হৃদয়ের মধ্যে সে ঠাঁই পেয়ে যায়। তরুবালার সম্ভাষণে সুশান্ত ভারি খুশি হোলো।

সুশান্ত বললে, কাজের মাঝখানে গিয়ে না দাঁড়ালে কেউ কাজ শেখে না, মাসিমা!

বরুণা হাসিমুখে বললে, মায়ের মনে ভয়টা কি জানেন, সুশান্তবাবু? পাছে আমি পথঘাট চিনতে না পারি, পাছে যেখানে সেখানে কাজ করতে গিয়ে কোনো বিপদে পড়ি,—এইসব। মাকে একটু বুঝিয়ে বলুন ত?

সুশান্ত খুব হাসলো, তারপর নিকেল্-ফ্রেমের হাতঘড়িটি উঁচু ক'রে একবার সময়টা দেখে নিয়ে বললে, দ্বিজেন বোধ হয় কোথাও আট্‌কে গেছে!

বরুণা বললে, আপনার বুঝি মন টিকছে না? আর কি জন্যেই বা টিকবে বলুন?

কন্যার বাক্-বিন্যাস দেখে তরুবালা খুশি-ভরা চোখে দুজনের দিকে তাকালেন। সুশান্ত বরুণার দিকে তাকিয়ে বললে, আপনার কিন্তু আজও অনেক কাজ ওখানে প'ড়ে রয়েছে, বরুণা দেবী।

বরুণা মুখ ফিরিয়ে বললে, আমি ত' বলিনি যে, করবো না। আপনাদের আপিস খোলা থাকলে আমি এখনই গিয়ে সব সেরে দিয়ে আসতে পারতুম!

যেতে পারবেন এখন?—বরুণার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সুশান্ত তরু-বালার দিকে তাকালো।

তরুবালার সায় ছিল। তিনি বললেন, বেশ ত, বরুণা যাক্ তোমার সঙ্গে! যদি পারে ক'রে দিয়ে আসুক? পরের কাজ!

তা হ'লে আর দেরি করা চলবে না, আজ আমি উঠি, মাসিমা।—সুশান্ত গা-ঝাড়া দিল।

বেরোবার মতো সাজসজ্জা বরুণার করাই ছিল, কেন না, এর চেয়ে বেশী মূল্যবান পোশাক এ সংসারে আর কল্পনা করা যায় না। বরুণা একবার ভিতরে গেল, তারপর প্রস্তুত হয়ে এসে বললে, তা হ'লে চলুন, সুশান্তবাবু?

তরুবালার মুখে চোখে চাপা গর্ব, প্রকাশ্য আহ্লাদ। হয়ত এতদিন পরে রুপালী রেখা দেখা দিল তাঁদের অন্ধকার ভাগ্যাকাশে। দীপেন-দ্বিজেনকে পিছনে রেখে তাঁর কোলের মেয়েই প্রথমে এগিয়ে গেল।

সুশান্ত বললে, তা হ'লে শুনুন মাসিমা, এতক্ষণ হাত তুলে দিতে আমার লজ্জা হচ্ছিল! উনি সবশুদ্ধ আজ পর্যন্ত সাতদিন আমাদের ওখানে কাজ করেছেন, ওঁর পাওনা হয়েছে মোট পঁচিশ টাকা। আপনার হাতেই আমি দিয়ে যাচ্ছি।

সুশান্ত পঁচিশটি টাকা পকেট থেকে নিয়ে তক্তার ওপর রেখে বললে, আসুন, বরুণা দেবী।

সন্ধ্যা ঘন হয়েছে। দরজা থেকে বেরিয়ে দু'পা যেতেই মৃগেনবাবুর একেবারে মুখোমুখি। একটি ছেলের সঙ্গে বরুণা চ'লে যাচ্ছে পাশ কাটিয়ে। কে ছেলেটি!

মৃগেনবাবু থমকে দাঁড়ালেন, দেখলেন দরজার সামনে তরুবালাও দাঁড়িয়ে। তিনি কিছু বুঝতে না পেরে সোজা এসে দরজায় উঠলেন, বললেন, ব্যাপার কি, ছোটবৌ?

সুশান্ত আগে আগে হন্ হন্ ক'রে চলেছে। ভদ্রলোকের প্রকৃতিটা সঠিকভাবে জানার আগে পর্যন্ত নিজের মুখচেনাটা সে দিতে চায় না। প্রবীণ পুরুষ মানুষের চোখ দিয়ে তাকে বিচার করা হ'লে সে হয়ত একটু বিব্রতও

হ'তে পারে। কিন্তু প্রবীণার কাছে তা'র সে-আশঙ্কা নেই। পুরুষ নিজের অন্তর্দৃষ্টি পাবে ব'লেই ঠিক বয়সে তার চোখে চাল্‌সে দেখা দেয়; প্রবীণাদের ভিতর-বাহির দুটোই চাল্‌সে। সুশান্ত অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর পিছন ফিরলো না। বাস্‌এর রাস্তায় পোঁছতে লাগে প্রায় মিনিট দশেক। পথের মোড় ফিরে তবে তা'রা এক সঙ্গে হোলো।

বরুণা উচ্ছল পুলকে অধীর। বললে, আপনি এমন গুছিয়ে কথা বলতে পারেন, জানতুম না ত? কী ব্যস্ত আপনি মেজদার জন্যে! অথচ ঠিক জানতেন যে, মেজদা এ সময়ে বাড়ী থাকে না!

সুশান্ত খুব হাসলো। পরে বললে, ছেলে ডাকতে যায় মেয়েকে, এ নিয়ম এখনও চালু হয়নি যে! তাই দ্বিজেনের নাম ধ'রে গিয়েছিলুম।

বরুণা বললে, আপনার দেরি দেখে আমার এমন রাগ হচ্ছিল! বড়দি আর বাবার সামনে দিয়ে আসতে আমার কী যে ভয় করে! তবে বাবাকে এখন আর ভয় নেই, মা এখন আমার দলে! আপনি মা'র হাতে টাকা দিয়ে এলেন কেন?

বাঃ—সুশান্ত বললে, যে-আনন্দটা কাছে পেলুম, তা'র জন্যে সামান্য দাম দিয়ে আসবো না?

আমি কি আপনার আনন্দ?

সুশান্তর চাহনিটা বিলোল হয়ে উঠলো। মিষ্ট হেসে সে বললো, জবাবটা মুখে এসেছে, কিন্তু পথের উপর সেকথাটা ছড়িয়ে দিতে চাইনে! সব চেয়ে ভালো কথাটা লোকে প্রকাশ করতে চায় না,—যদি চায় তবে কানে কানে বলে।

শাস্ত্রে বলে, হর্ষ-কম্প-স্বেদ-পুলক! ওরই মধ্যে কোনো একটা অনুভূতি বৈদ্যুতিক ঝলকের মতো বরুণার সর্বাঙ্গে খেলা ক'রে গেল। আস্তে আস্তে বললে, এমন কী কথা, যা কানে কানে বলবেন?

সুশান্ত বললে, বেশ যা হোক, পরশু দিন না আমরা ঠিক করলুম, দুজনে দুজনকে তুমি ব'লে ডাকবো? এর মধ্যেই ভুলে গেলেন?

বরুণার গলা কেঁপে উঠলো। বললে, তুমি বলতে আমার ভয় করে।

ভয়! কেন?—সুশান্ত সস্নেহে মুখ ফেরালো।

আমি বড্ড দুর্বল হয়ে পড়ি! আর কিছু জানতে চাইবেন না!

পঁচিশটি টাকা সম্ভবত অপর কারো চোখে পড়েনি। সুতরাং কি মনে করে তরুবালা কোথায় যেন টাকাটা রেখে এলেন, অপর কারোকে জানতে দিলেন না। দ্বিজেন মাঝে মাঝে বাক্স-ডেস্ক এসে হাঁটকায়, মাঝে মাঝে ছেঁড়া তোষক তুলে তলাটা দেখে, পিছন থেকে মায়ের আঁচলের কোণটা লক্ষ্য করে, হয়ত বা এক সময়ে ভাঁড়ারে গিয়ে কুলুঙ্গির এপাশে ওপাশে ছোক ছোক ক'রে আসে। তরুবালা সতর্ক হয়ে রইলেন।

মৃগেন্দ্র জামাকাপড় ছেড়ে বিশ্রাম করছেন। এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে তরুবালা ঘরে ঢুকলেন। চুপচাপ ছিলেন মৃগেন্দ্র। চায়ের পেয়ালা পাশে রেখে তরুবালা বললেন, ফিরতে আজ তোমার এত দেরি হোলো? শরীর ভালো ত?

মৃগেন্দ্র বললেন, আপিসের কর্তার কাছে দরবার করতে গিয়েছিলুম,—পেন্সন্ দিয়ে এবার ওরা আমাকে সরাবে। আর কিছুতেই রাখবে না।

তরুবালা কতক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। পরে বললেন, কত টাকা পেন্সন দেবে?

মৃগেন্দ্র শান্তকণ্ঠে বললেন, পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন টাকার বেশী পেন্সন্ পাওয়া যাবে ব'লে মনে হচ্ছে না।

কথাটা শুনে তরুবালা পাথর হয়ে গেলেন। তারপর এক সময় বললেন, এত কম টাকায় কেমন ক'রে চলবে?

তোমাদের হয়ত চলবে না, তবে আমার ভাত-কাপড় চ'লে যাবে।—পেন্সনটা আমাকেই ওরা দিচ্ছে, আমার পরিবারকে নয়।

সমগ্র সমস্যা আর ভবিষ্যতের সর্বপ্রকার দুর্ভাবনা নিয়ে তরুবালা চুপ ক'রে গেলেন। চায়ের পেয়ালায় মৃগেন্দ্র মাঝে মাঝে চুমুক দিতে লাগলেন। এক সময় প্রশ্ন করলেন, ও ছেলেটি কে এসেছিল?

তরুবালা বললেন, ওর নাম সুশান্ত, দ্বিজেনের বন্ধু।

বরুণা ওর সঙ্গে কোথায় চললো?

কোথায় কি যেন কাজ হচ্ছে, ভাইবোনে সেখানে আনাগোনা করে। খানিক বাদেই ফিরবে।

দ্বিজেন ছাড়া ওকে আর কেউ চেনে? অতনু-ভাস্বতী জানে ওকে?

তরুবালা মুখ তুলে অন্ধকারে স্বামীর দিকে তাকালেন। বললেন, অতনু-ভাস্বতী জানে না, এমন অনেক ভালো ছেলেমেয়েও ত' আছে।

কথাটায় একটা সূক্ষ্ম কটাক্ষ ছিল। মৃগেন্দ্র খানিকক্ষণের জন্য চুপ করে গেলেন। পরে বললেন, খাঁটি সোনা স্যাকরারাও চেনে না, সেইজন্যেই কষ্টি-পাথরের চল্‌তি—তা জানো, ছোটবৌ?

তরুবালা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। বললেন, ছেলেমেয়েদের ওপর তোমার এমন সন্দেহ কেন? অতনু-ভাস্বতী আমার ছেলেমেয়ে নয়, তাই বুঝি তাদের ওপর তোমার এত বিশ্বাস?

মৃগেন্দ্র বললেন, তুমি রাগ করলেও কিন্তু কথাটা থেকে যায়, ছেলেমেয়েরা তোমার আজও মানুষ হয়নি। অজ্ঞানের হাতে স্বাধীনতা এলে তা'র চেহারাটা কেমন দাঁড়ায়, তোমার দুই ছেলেকে দিয়েই বুঝতে পারো। অতনু-ভাস্বতীকে বিশ্বাস করি, কেননা, তারা ধোপে টিকে গেছে।

তরুবালা আজকে কোথায় যেন জোর পেয়েছিলেন। বললেন, সাতাশ বছর ধরে আমাকে নিয়ে তুমি ঘরকন্না করছ। এবার আমার কি ইচ্ছে জানো? তুমি সংসার থেকেও পেন্সন নাও। তুমি বিশ্বাসকেও ছাড়ো, সন্দেহকেও ছাড়ো। তোমার কাজ তুমি করেছ, এবার ওদেরকে মুক্তি দাও। ওরা যা খুশি তাই করুক, ওদেরকে তুমি বাঁধতে চেয়ো না।

আর তুমি?

তরুবালা বললেন, আমি? আমার ভবিষ্যৎ তুমিও নও, ওরাও নয়। আমি অনেক বেশী জানতে পেরেছি, যা জানতে গেলে সমস্ত জীবনটা দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে খরচ করতে হয়।—শেষের দিকে তাঁর গলাটা ধ'রে এসেছিল, তিনি কোনো-মতে নিজেকে সামলিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে চ'লে গেলেন।

মৃগেন্দ্র চুপ ক'রে রইলেন। অন্ধকারটাই ভালো, কেননা, আলো না জ্বাললেই খরচটা কমে। সাড়ে তিনখানা ঘরের মধ্যে তাঁর জীবন, তা'র বাইরে তাঁর জগৎ নেই। তাঁর কর্ম্মস্থল থেকে তাঁর আবাসস্থল পর্যন্ত যে-অনতিদীর্ঘ পথটা চিরকাল তাঁর সামনে প্রসারিত, তার বাইরে তিনি কখনও পা বাড়াননি। বছর কুড়ি আগে একবার তিনি পুরী গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে গিয়ে কত যে তাঁকে হায়রান হ'তে হয়েছিল—কুড়ি বছর ধ'রে লোকে তাঁর মুখে সে-গল্প শুনেছে। তিনি নাকি সেখানে খাবারের দোকান খুঁজে পাননি, কুলীরা নাকি

তাঁর মালপত্র নিয়ে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টায় ছিল, একটা সামুদ্রিক জন্তু নাকি তাঁকে তাড়া করে, সে বছর রথ টানতে গিয়ে নাকি তিন হাজার লোক জখম হয়, শেষ পর্যন্ত মাঝ পথে কোথায় যেন ডাকাতের হাতে পড়তে পড়তে তিনি বেঁচে যান। সেইসব গল্প শুনতে গিয়ে অতনু-ভাস্বতীকেও তাঁর পাশে ব'সে বহু সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে। সেই থেকে একা তিনি কখনও কলকাতার বাইরে পা বাড়াননি।

শেষ দিকে কয়েকটি বছর তাঁর ভালোই কাটবে, গণৎকারের এই কথাটা মনের মধ্যে বহন ক'রেই তিনি শেষের দিকে এসে পেঁৗছেছেন। কর্মতৎপরতায় তাঁর প্রয়োজন ছিল না, কেননা, ওই পরিশেষটায় তাঁর বিশ্বাস ছিল। ভাগ্য-অন্বেষণের জন্য তিনি পথে-পথে ঘোরেন নি, প্রবল পৌরুষের পরিচয় দেবার চেষ্টা কখনও তাঁর ছিল না,—সেজন্য বাঁধাধরা ছকের মধ্যেই তিনি এতকাল কাটিয়েছিলেন। তাঁর চোখের সামনে ছিল একটা গণ্ডী, ছিল সীমানাঘেরা প্রাচীর—তা'র বাইরে জগৎ আছে, জীবন আছে, সংসারের বৈচিত্র্য আছে, এসব তাঁর জানা ছিল না। তিনি ভাসতে ভাসতে এসেছেন এত দূরে। কে তাঁকে ভাসালো, পিছন থেকে কে তাঁকে ঠেলে আনলো, কোথায় গিয়ে পড়বেন তিনি ভাসতে ভাসতে,—এ সমস্তই তত্ত্বকথা, এ নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে নিশ্চয়ই তাঁর মাথাটাই ধ'রে উঠতো। স্বল্প পরিবেশের মধ্যে স্বল্পে তুষ্ট হয়ে তিনি শান্তিতে থাকবার প্রয়াস ক'রে এসেছেন! যদি কেউ প্রশ্ন করতো, শান্তি মানে কি, সুখের অর্থ কি, মানুষের সত্য পরিচয় কি, আপনার এইপ্রকার জীবনযাত্রার ব্যাখ্যা কি, আপনার এই স্বভাবজড়তার মূল কারণ কি,—তবে তিনি তাড়াতাড়ি সেসব তর্ক থামিয়ে দিতেন। তাঁর পলায়নী প্রকৃতি হোলো কূটস্থ। প্রশ্নের জবাব দেবার দায় থেকে মুক্তি নিয়ে তিনি আপন গুহায় ঢুকে নিরাপদ আশ্রয় বেছে নিতেন। বাহির বিশ্বের আলো অতিশয় উগ্র। সেই উগ্রতা তাঁর চোখে কিছুতেই সয় না।

মৃগেন্দ্রের এই প্রকৃতির প্রতিক্রিয়াটা ছিল তরুবালার জীবনে। তরুবালা শুধু যন্ত্র, তা'র বাইরে তাঁর সত্য পরিচয় নেই। নিয়তির চাকায় তিনিও বাঁধা। তাঁর একমাত্র ভূমিকা হোলো জীবপালিনীর,—রান্নাঘর থেকে ভাঁড়ার ঘর, এইটুকুতেই সেই ভূমিকার শেষ। তিনি যন্ত্র, তাঁর একমাত্র কাজ হোলো সরবরাহ। আশ্বাস কিছু নেই, প্রাণধর্মের আর কোনো প্রকাশ নেই, গৃহস্থালির বাইরে

অপর কোনো পরিকল্পনা নেই,—তিনি কেবল চাকায় বাঁধা। যৌবনকাল একটা ছিল, কিন্তু কবে ছিল সেদিন, তাঁর মনে পড়ে না। বাসন মেজেছেন তিনি অনেক, উপবাস করেছেন তার চেয়েও বেশী। আঠারো বছর ধরে তাঁর হাতে-পায়ে হাজা'র ঘা, হৃদ্‌রোগে মাঝে মাঝে তিনি কাতর, বাতের যন্ত্রণায় কখনো শয্যাগত,—কখনও বা গুরুভার অবসাদ নিয়ে তিনি আপন মনে রান্নাঘরের কোণে অশ্রুসজল হয়ে থাকেন। জীবনের এই স্বরূপ ছাড়া আর কিছু তাঁর জানা নেই। জীবপালিনীর একমাত্র কর্ম হোলো জীবের মুখে অন্ন যোগানো। তাঁকে দেখলে পিঁজরাপোলের বিগত-যৌবনা গাভীকে মনে পড়ে। বড় বড় চোখে শান্ত হতাশা আছে কিনা বোঝা যায় না, কিন্তু সেই চোখে কোনো ভাষা নেই। মুখের কাছে জাবর পেলে কাটে, না পেলে ধুঁকতে থাকে, শেষে একদিন আহার-নিদ্রার শেষ দেনা শোধ করে চলে যায়। তরুবালার যেদিন মৃত্যু হবে, সেদিন পড়ে থাকবে খান-তিনেক জীর্ণ সেলাইকরা শাড়ী, ভাঙ্গা একটা শূন্য তোরঙ্গ, দুগাছা রং-চটা শাঁখা আর দাড়াভাঙ্গা একখানা চিরুণী। ওইগুলির ভিতর দিয়ে তাঁর ইহজীবনের চরম অর্থ আবিষ্কার করে নিতে হবে।

ভাস্বতী কিন্তু একসময় হঠাৎ মায়ের দিকে মুখ তুলে তাকায়। কি যেন ভেবে বলে, এটা কিন্তু সত্যি নয় মা।

মেটে সাবান কাপড়ের ওপর ঘষতে ঘষতে তরুবালা বলেন, কি বল্‌ না?

এমন দুরবস্থা কিন্তু তখন ছিল না। অভাব-অনটন সবই ছিল, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোত না, তাও মনে আছে,—কিন্তু প্রত্যেকদিন এমন ভয়ে-ভয়ে থাকতে হোতো না।

তরুবালা বললেন, তুমি সকলের বড়, তুমি এর প্রতিকার করতে পারতে!

কথাটা দেখতে দেখতেই ঘুরে দাঁড়ালো। মায়ের মনে আজকাল যেন কেমন অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ভালো কথাটাও ভালোভাবে তিনি নেন না। ভাস্বতী শান্ত হাসিমুখে বললে, বাবা থাকতে আমি কি প্রতিকার করবো, মা?

কেন?—তরুবালা মুখ তুললেন। বললেন, একজনের ঘাড়ে কতখানি ভার সয়, এ কি তুমি জানো না? তুমি ত' কচি খুকি নও, ভাস্বতী? তোমার তিরিশ বছর বয়েসের আর দেরি কত? মা-বাপের দুঃখ যে মেয়ে বুঝতো, সেই মীনু থাকলে হয়ত আজ এত দুর্দশা হোতো না।

ভাস্বতী যেন আজ গাল বাড়িয়ে চড় খেতে এসেছিল। তবু সে ধীরে

ধীরে বললে, তোমার কথা সত্যি, মা। কিন্তু আরো ভালো করে লেখাপড়া শিখলে আমি নিশ্চয় কিছু করতে পারতুম।

তরুবালার কণ্ঠে উত্তাপ এলো। বললেন, লেখাপড়া ভালো করে শেখোনি, কিন্তু বাইরে যাতায়াত আছে ত? নিজের মা-বাপকে খুঁজে বার করে লেখাপড়া শিখলেই পারতে। অতনু ত তোমার হাতেই রয়েছে।

অতনু আমাদের কেউ নয়, মা।

তোমার কেউ নয়, কিন্তু আমাদের কেউ ত বটে। যতবার সে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে, তুমি ততবারই তাকে সরিয়ে দিয়েছ। কর্তার মান বাঁচাতে গেলে, কিন্তু ঘরে ভাত না থাকলে নিজেদের মান বাঁচবে কি? হাতের মুঠোর মধ্যে যাকে রাখলে, তাকে নিয়ে ঘরকন্না পাতলেই পারতে! তবু ত কর্তার এক মুঠো ভাতও বাঁচতো!

সাবান কাচা শেষ করে তরুবালা হন্ হন্ করে চলে গেলেন। ভিজা কাপড়গুলো সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাবার সময় যমুনা একবারটি দাঁড়ালো, তারপর অসীম বিরক্তির সঙ্গে মুখখানা ভাস্বতীর দিকে ফিরিয়ে বললে, এত কথার পরেও তোমার একটু আক্কেল হলেই আমরা বাঁচি, বড়দি।

যমুনা চ'লে যাবার পরেও ভাস্বতী বিবর্ণমুখে সেইখানে চুপ করে বসে রইলো। সে যে এ বাড়ীর মেয়ে নয়, এ বাড়ীর সঙ্গে যে তার রক্তের যোগ নেই, একথা অনেকদিন ধরেই তাকে জানানো হচ্ছে। কিন্তু এ সংবাদটা বিচিত্র আওয়াজ নিয়েই বার বার তার কানে বাজে এবং বার বারই সে সচকিত হয়ে ওঠে, যেন তার অস্তিত্বের মূল ভিত্তি পর্যন্ত নাড়া খায়। কিন্তু যমুনার দংশনের কথা থাক, মায়ের মুখ থেকে অতনুর সম্বন্ধে আলোচনাটায় তার অনেকখানি অপমানবোধ ছিল। একথাটা সে নিজেও জানে, অতনুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা আজও স্পষ্ট নয়। কিন্তু সে সম্পর্ক কোন্ কোন্ ধাতু দিয়ে তৈরী—তারা নিজেরা এই নিয়ে কখনও বিচার করতে বসেনি। তার দরকারও ছিল না, সময়ও ছিল না। এমনি করে গেছে তাদের বাল্যকাল, এমনি করেই গেছে তাদের বয়স্কাল। সেই অতনু একইরকম আছে, যুদ্ধের থেকে ফিরে এসেও তার মতিগতি বদলায়নি; সে নিজেও রয়ে গেল তেমনি, নিস্তরঙ্গ জলাশয়—তরঙ্গের কোন উৎক্ষেপ নেই।

ভাস্বতী বসে রইলো অনেকক্ষণ, তারপর সেখান থেকে উঠে সে চলে

গেল। মায়ের কথায় আজ তার সমস্ত মন যেন নিজেরই উপর ধিক্কার দিয়ে উঠেছিল। সেই গ্লানি তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলো সারাদিন। এঘর থেকে ওঘর, এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী।

ও বাড়ীর বিষ্টুবাবুর মা বললেন, মুখখানি আজ মেঘের মতন ভার কেন গো মা-লক্ষ্মী!

মেশিনে বসে ভাস্বতী জামা সেলাই করে দিচ্ছিল। মুখ তুলে হাসিমুখে বললে, লক্ষ্মী, না লক্ষ্মীছাড়ি! সেলাই করি, কিন্তু আপনারা মজুরী দেন না, তাই ত আমার মন খারাপ।

পোড়াকপাল!—বিষ্টুবাবুর মা বললেন, সোনা হাতে দিলে ছোঁও না, তুমি আবার মজুরী নেবে! পাড়ার লোকের হিংসে তোমার ওপর। গায়ে-গতরে পাঁচজনের বাড়ী খেটে দিচ্ছ, তাতেও তাদের মন পাও না। কি জানো মা, তোমার গায়ে যদি পাঁচখান গয়না থাকতো, তবেই দেখতে সবাই তোমায় খাতির করে চলতো।

বিষ্টুবাবুর মা একপাশে এসে বসলেন। নিজের হাসিমুখ নিজের কাছেই বেমানান লাগছিল, তবু আপন মনে ভাস্বতী জামা সেলাই করে চললো।

বিষ্টুবাবুর মা পুনরায় বললেন, আমাদের কালে মেয়েদের গায়ে বিশেষ জামা-জুমি থাকতো না,—ঘরকন্নায় একবার ঢুকলে অত সাজসজ্জের কথা কি আর মনে থাকতো! এখন সবই উল্টো, ভেতর যত ফোঁপরা, বাইরেটা ততই চকচকে। জানলায় জানলায় এখন পর্দা,—পর্দা তুলে দেখো, ভেতরে ছুঁচোর কের্তন!

ভাস্বতী প্রশ্ন করলো, আপনার ছোট জামাইয়ের চাকরির কি হোলো? কাজকর্ম কিছু পেলেন না?

ব'লো না মা, সে ড্যাকরার কথা আর মুখেও এনো না।—বিষ্টুবাবুর মা বললেন, পেটে দু'কলম বিদ্যে থাকলে কি হয়, বুদ্ধির দোষে সবই যে শুকিয়ে গেল। এই ত এই মাসেরই কথা। রেশনের টাকা নেই, কোলের মেয়েটার আমাশা, এক কুটো জিনিস নেই ঘরে—বাস, অমনি আমার মেয়ের হাতের রুলী জোড়াটা বাঁধা পড়লো। ও-রুলী কি আর ছাড়াবার সাধ্যি হবে! কোথায় পাবে টাকা? মাঝখানে দেশে চারটি টাকা হয়েছিল শুনতে পাই; কিন্তু সে-টাকার ছিটে-ফোঁটাও চোখে দেখতে পেলুম না। হাতী লেলিয়ে যারা

হাতী ধরতে জানে, মা-লক্ষ্মী তাদেরই দয়া করেন, মা। তুমি এই কাপড়গুলি কিনে সেলাই করে দিচ্ছ, এতেই এবার পুজোয় মেয়েটার মানসম্ভ্রম বাঁচবে!

বিষ্টুবাবুর মা নয়-হাতী মাঠাথানের আঁচলে তাঁর দুই চোখ মুছলেন। এ বাড়ীর সমগ্র দারিদ্র্যের আবহাওয়াটায় নিশ্বাস নিলে বুকের মধ্যে যেন ধক ধক করতে থাকে। এদের মৃত্যু ঘটে গেছে, অনেককাল আগে থেকেই এরা বেঁচে নেই।

সেলাই শেষ করে ভাস্বতী উঠলো। তারপর বললে, এক সময় এসে আমি টিপবোতামগুলো বসিয়ে দিয়ে যাবো, পিসিমা। মেশিন এখানে থাক্, রাঙাদিদির বাড়ীর লোক এসে নিয়ে যাবে।

ভাস্বতী তখনকার মতো চলে গেল।

পাড়াপল্লীটি ছোট, কিন্তু প্রায় সাড়ে তিন বছর তাদের এখানেই কাটলো। আগে যে অঞ্চলে তারা বছর দেড়েক কাটিয়ে এসেছে, সেই পল্লীর সঙ্গে এখানকার তফাৎ শুধু মানুষের, অবস্থার নয়। ও বাড়ী থেকে পথে নামলেই নিকুঞ্জবাবুদের দরজাটা সামনেই পড়ে। কিন্তু ও বাড়ীতে গেলে ছোট ছেলে-মেয়েরা এখন আর তাকে ছাড়বে না। তারা সবাই মিলে খাবার জন্যে এখনই তাকে অস্থির করে তুলবে। তারা শুধু খেতে চায়, ক্ষুধা তাদের মেটে না, পেট ভরে খেলেও আবার পাশের বাড়ীর রান্নাঘরে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারে। কথাটা কিন্তু আরো পরিষ্কার করে বলা চলে। নিকুঞ্জবাবুর ম্যালেরিয়া জ্বর আসে প্রায় রোজ সন্ধ্যাবেলা। বিধবা ভগিনী থাকেন একটি কানা মেয়েকে নিয়ে— মেয়েটার আজও বিয়ে হয়নি। একটি মাত্র ঘর, কিন্তু তার কোলে যেটুকু রোয়াক—সেইখানে চটের আড়াল দিয়ে মা ও মেয়ে রাত্রিবাস করে। সামনের উঠোনটা একেবারে খোলা, সেখানে পাঁচিল নেই। মেয়েটাকে নিয়ে একদিন মাঝরাত্রে কবে যেন হৈচৈ উঠেছিল এই পাড়ায়। হৈচৈ থেমে গিয়েছিল বটে, কিন্তু মা আর মেয়ের মধ্যে ঝগড়া থামেনি তিনদিন পর্যন্ত। এদিকে সন্ধ্যার সময় নিকুঞ্জবাবুর ঠিক জ্বর আসবার সময়টি এলে তাঁর স্ত্রী কনক তাঁর গায়ের ওপর কাঁথাখানা চাপিয়ে দিয়ে চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কোথায় তারা যায়, কী করে, তিন-চার ঘণ্টা কেন তারা বাইরে থাকে—এ সমস্ত খবর এদিকে কেউ জানতো না। এককালে হয়ত বা একটু সামাজিক সহানুভূতি খুঁজে পাওয়া যেতো, তখন একজনের খবর অপরে হয়ত

রাখতো। কিন্তু এখন উদ্বৃত্ত সময় ও উদ্যম কারো নেই—দারিদ্র্য থেকে প্রাণ-ধর্মের যে দুর্বলতার জন্ম ঘটে, যে অসাড়তা আসে—তারই জন্য এখন একের সমস্যা নিয়ে অপরে কেউ মাথা ঘামাতে চায় না। সুতরাং নিকুঞ্জবাবুর পারিবারিক জীবন নিয়েও কারো মাথা ঘামাবার উদ্বেগ ছিল না। কিন্তু পরে খবরটা জানা গেল। এককালের সম্ভ্রান্ত ঘরের এই বধূ সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চলে যায় কোনো এক পার্কে, সেখানে জায়গা বেছে নিয়ে নিজে অপেক্ষা করে এবং ছেলেমেয়েরা ঘণ্টা তিনেক ধরে সেই অঞ্চলের পথচারীদের কাছে পয়সা ভিক্ষা করতে থাকে। ফেরবার পথে চোরাবাজারের গলি থেকে কিনে আনে চাল আর মুদি-মশলা, আর নয়ত স্বামীর জন্য একটু-আধটু ঔষধপত্র। স্বামীর কাছে কনক ফিরে এসে বসে হাসিমুখে। পরিশ্রান্ত শিশুরা ভাত সিদ্ধ হবার আগেই এখানে ওখানে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম-চোখে একজনের ভাত তিনজনে খায়।

ভাস্বতী সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে এগিয়ে গেল। তার দায় নেই, কেন না, তার স্বার্থোদ্ধারের প্রয়োজন নেই। সে একক, কেন না, তার স্বভাবনীতির সঙ্গে কারো যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। তার আচরণটা বিচিত্র, কেন না, চলতি অভ্যাসের সঙ্গে তার মিল কম। অতনু বলে, চেনাপথ ধরে এলে চিনতে পারতো সবাই, তুমি খানিকটা অচেনা পথের লোক। তুমি মহৎ অভ্যাস এনেছ, কিন্তু তুমি মিশনারী। ব্যবহার অত্যন্ত মধুর, কিন্তু কোনো দাগ পড়ে না তোমার মনে,—কেন, জানো?

কেন?

মিশনারীর মধ্যে ন্যায়পরতা আছে, সদ্বিচার আছে—কিন্তু না আছে হৃদয়, না বা মমত্ববোধ। যেদিন তুমি এপাড়া থেকে সরে যাবে—সেদিন সবাই শূন্যতাবোধ করবে, কিন্তু হাহাকার করবে না। হৃদয়কে স্পর্শ করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।

হাসিমুখে ভাস্বতী বলে, আমার বিরুদ্ধে এমন নালিশ কিন্তু কেউ জানায়নি!

আমি জানাচ্ছি—অতনু বলে, কেন না, আসক্তির থেকে তুমি দূরে থাকো, অর্থাৎ ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলো। কেউ তোমার ধরা-ছোঁয়া পায়, এ তুমি পছন্দ করো না। তুমি নিজের মধ্যে যেখানে বাস করো, সে জায়গার ত্রিসীমানায়

কেউ যাবার চেষ্টা পেলে তুমি ভয় পাও। হয় তাকে সেখান থেকে তুমি তাড়াও, নয়ত নিজে পালাও। সকলের ভালোবাসা যে চায়, সে কেমন মানুষ জানো?

কেমন, শুনি?—ভাস্বতী প্রশ্ন করে বসে।

যে নিজেকে ভালোবাসে সবচেয়ে বেশী! কিন্তু আসল কথা, নিজেকেও তুমি ভালোবাসতে শেখোনি। তা যদি হোতো, তবে সেখান থেকেই উঠে আসতো মনের রং, চিত্তের প্রসাদ, ভাবের আবেগ, আনন্দের উচ্ছ্বাস। অপরের ভালবাসা তুমি চাও না, নিজেকেও ভালোবাসতে জানো না—তাই তুমি নির্লিপ্ত, তাই তুমি মিশনারী।

ভাস্বতী চাপা হাসি হেসে বললে, তুমি ত' একজন ভালো ডাক্তার, তুমি এর ওষুধ জানো?

অতনু বললে, এ ব্যাধির কোন চিকিৎসা নেই।

তবে উপায়?

উপায় একদিন তুমিই খুঁজে পাবে। নিজেকে কেবলই লুকিয়ে রাখছো এমন একটা কিছুর জন্যে, যার হদিস তুমিও জানো না। আশা করি, সেই আলোটা হঠাৎ কোনোদিন তুমি নিজেই দেখতে পাবে।

অতনু সেদিন আর কিছু না বলে চুপ করে গিয়েছিল।

দীপেন সেদিন আবার বাড়ী ফিরে একটা ঝড় তুলেছিল। কেননা, প্রত্যেক-দিন বাড়ী ফিরে একথাটা তার পক্ষে বোঝানো দরকার যে, পারিবারিক সমস্যাটা নিয়ে সে চুপ করে নেই। তাকে যেমন ভাবতেও হয়, তেমনি ছুটতেও হয় ততখানি। পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে পরিশ্রম আছে, সুবিধা-অসুবিধা আছে এবং তার সঙ্গে জীবন-সংগ্রামটা ত আছেই। খবরের কাগজখানা দৈনিক পড়াটা আলস্যের নয়, চায়ের দোকানে গিয়ে বসলে প্রত্যেক দিনের জনমতটাকে সামনে রেখে বুঝতে পারা যায়,—তখন নিজের পারিবারিক দুরবস্থা অথবা দুর্দশাটা বহুর মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে মনে সান্ত্বনা আনে। জীবনটাকে দীপেন দেখছে বৈ কি চারদিক থেকে। এ দেখা বাবা দেখেননি এবং বাবার যিনি বাবা—তিনিও আজকের জীবনের চেহারাটা কল্পনা করেন নি। এই যুগান্তরটার সম্বন্ধে দীপেনকে অনেকবার ভেবে তবে কাজ করতে হয়, অনেকটা সময় তাকে বাজে খরচ করতে হয়।

তরুবালা ঘর থেকে বেরিয়ে বলেন, কি বলছিস?

বলতে বাধ্য হচ্ছি, মা। দ্বিজেন তার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, আমিও ব্যস্ত—বাবার আজ বাদে কাল পেন্সন হয়ে যাচ্ছে, অন্তুকে নিয়ে তুমি কি করবে মনে করেছ?

সিগারেটটা সে লুকিয়েছিল পিছন দিকে, কিন্তু আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়াটা আসছিল এগিয়ে। তরুবালা বললেন, অন্তুকে নিয়ে আবার কি করবো?

দীপেন তপ্তকণ্ঠে বললে, নিজেদের ভাত জোটে না, তুমি নাতি-নাতনী দুটোকে পুষে আবার ঝঞ্ঝাট পোয়াচ্ছ কেন? কপালের ঘামে এ বাড়ীর ভাত সেদ্ধ হয়, সেই ভাত কাক-চিল ডেকে কতকাল খাওয়াবে? ও-ভাতটা বেঁচে গেলে আমাদের হাতখরচটাও চলে যায় ত?

তরুবালা বললেন, ওদের মা নেই, বাপ গিয়েছে সন্ন্যাসি হয়ে,—কেউ কোত্থাও নেই। ওরা যাবে কোথায়?

পৃথিবী অনেক বড়! এদেশের দশ লক্ষ মণ খাদ্য পশু-পক্ষী আর কীট-পতঙ্গরা খায়,—ওদের খাওয়া জুটবে না? খাঁচায় রেখে খাওয়ানোর চেয়ে খাঁচার দরজা খুলে দাও, বনের পাখী বনে চলে যাক্।

বনের পাখী! দূরে দাঁড়িয়েছিল ভাস্বতী, সে বললে, শিশুপাখী কি খুঁটে খেতে জানে যে, তাদের বনে পাঠাতে বলছিস? পাখীদেরও মা থাকে, দীপু।

দীপেন বললে, থাকে; কিন্তু উড়তে শিখলে আর কেউ তাকে খাওয়ায় না, বড়দি—মনে রেখো। অন্তু আর শীলু যখন হাঁটতে শিখেছে, তখন ওদের খাবার ওরাই খুঁজে খাবে। বেশ, শীলু যদি না পারে, অন্তুকে কাজ করতে দাও! পৃথিবীর সব ছেলে কিছু আর লেখাপড়া শেখে না।

তরুবালা বললেন, আট বছরের ছেলে, সে কি জানে?

আটাশ বছরের মেয়ে যা জানে না,—ভাস্বতীর দিকে কটাক্ষ করে দীপেন বললে, আট বছরের ছেলে তা জানে! কলকাতায় হোটেল নেই? খবরের কাগজের ফিরি নেই? গেরস্থ বাড়ী ফাইফরমাসের চাকরি নেই? আলু-পটলের ফড়েগিরি নেই? কী নেই বলতে পারো?

তরুবালা উষ্ণকণ্ঠে বললেন, তুই কি ভদ্দরলোকের ছেলের পরিচয়টাও নষ্ট করতে চাস? নিজের বংশের মুখে কালি মাখাতে পারলে খুশী হোস?

দীপেন হাসলো। বললে, বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াওগে। এমন অনেক ভিখিরী দেখতে পাবে, যারা তোমার আমার চেয়ে অনেক উঁচু বংশের। বংশ নিয়ে ধুয়ে খাচ্ছে—এমন কোনো লোক আজকে আর তোমার চোখে পড়বে না। তোমাদের ওই হরিহর মিত্তির ত এপাড়ার কুলীন কায়েত—দেখে এসো তার বুড়ি মা গঙ্গাস্নান করতে গেলেই দু'টাকা রোজগার করে আনে। তোমার নাতিটি যদি ছোট বয়েস থেকে নিজের পেটটা চালাতে পারে,তবে তুমি 'শ্রমের মর্যাদা' স্বীকার করবে না? চিরকাল যারা তোমাদের মুখে ভাত দিয়ে এসেছে এবং আজকে আর দিতে পারছে না—তাদের বাধ্য এবার হও দিকি? পরের ভাত খেয়ে পাড়ায় পাড়ায় যারা সমাজসেবা করে নাম কিনতে চায়, তারা আমার ভাষাটা হয়ত বুঝতে চাইবে না।

অর্থাৎ ভাস্বতী! ভাস্বতী সম্ভবত কিছু বলতে এসেছিল, কিন্তু দীপেনের মুখে-চোখে উগ্র বুদ্ধির অতিশয় চপলতা দেখে এবার সে একপাশে সরে গেল। এ বাড়ীতে তার যে অধিকার ও প্রতিপত্তি এতকাল ধরে অব্যাহত ছিল, ধীরে ধীরে সবাই মিলে সেটিকে যেন ছিনিয়ে নিচ্ছে।

যাবার আগে দীপেন মায়ের কাছে আরেকটু এগিয়ে এলো। বললে, যে যাই বলুক না মা, তুমি চাও খানিকটা নির্ভাবনা হতে, এই ত?

তরুবালা জলের বালতি টেনে তুলে এক জায়গায় রাখলেন। পরে বললেন, তাই বলে মান খোয়াবো?

মান!—দীপেন হাসলো। পুনরায় বললে, সৎশিক্ষা হয়ত আমরা কেউ পাইনি, কিন্তু হিসেববুদ্ধি পেয়েছি ত? সেই হিসেবের মধ্যেই একথা পাই যে, নদীতে ভাঙন ধরেছে! তুমি টেরও পাচ্ছ না যে, নীচের দিকে ক্ষয় ধরেছে, হঠাৎ একদিন সব কোথায় তলিয়ে যাবে—কিছুই ধরে রাখতে পারবে না। শোনো, অন্তুর জন্যে আমি কাজ ঠিক করেছি, কাজটা ভালোই।

তরুবালা প্রশ্ন করলেন, কোথায়?

কেন, যে হোটেলে আমি চা খাই। সেখানে চা দেবে, বাসন ধোবে, খদ্দেরকে খুশী রাখবে। খেতে পাবে দুবেলা নিখরচায়, মাইনে পাবে দশ টাকা। বুদ্ধি থাকলে উপরিটাও মারা যাবে না। মনে রেখো, ছোঁড়াটা ঘরে বসে থাকে

বেকার, ইস্কুলের মাইনে জোটে না, একটা হাফ প্যাণ্ট কিনে দেবার পয়সা নেই তোমার—অথচ ওকে ভাঙিয়ে পাবে দশ টাকা! এক হপ্তার রেশনের টাকার ভাবনা থাকবে না।

দীপেনের কথায় অনেক সময়ে গায়ে খোঁচা লাগে বটে, কিন্তু কথাবার্তাগুলো অনেক সময়ে যুক্তিহীন নয়। তরুবালা তার দিকে একবার তাকালেন, পরে বললেন, রান্নাবান্নার সময় এখন ওসব কথা থাক্, পরে ভেবে-চিন্তে দেখবো। এখন যা।

দীপেন হাসলো। এ হোলো টাকার গন্ধ। মা যে আজ শতকরা পঞ্চাশ-ভাগ রাজী হবে, এ ত' আগে থেকেই জানা কথা। দীপেন খুশী হয়ে তখনকার মতো চলে গেল।

তরুবালা তাঁর নিজের মনে যুক্তির জোর পাচ্ছিলেন। আর যাই হোক, অস্তিত্ব রক্ষা করে না চললে উপায় নেই। ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে তুলতে পারলে হয়ত বা কিছুকালের জন্য মানসম্ভ্রম বাঁচে, কিন্তু একেকটি অন্নের দানা পরমায়ুকে বহন করে চলে। সেখানে কোন আপোষরফা নেই,—সেখানে প্রচণ্ড সংগ্রাম, প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ক্ষুধা কখনও মানুষকে ক্ষমা করে না, প্রয়োজন ঘটলে সম্ভ্রমকে সে তচনচ করে, অসূর্যম্পশ্যাকে সে আলোয় টেনে আনে, জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে মানুষকে সে মিলিয়ে দেয়। তার পথ আলাদা, তার গতি সংঘাতময়, তার প্রকাশ ভয়াবহ। ভিতরে ভিতরে সে তার লেলিহ জিহ্বা বিস্তার করে' অন্ধবেগে ঘুরে বেড়ায়, আর বাইরে বাইরে জ্বালায় আগুন, ব্যবস্থাপনাকে চূর্ণ করে, আপন লালারসকে তৃপ্ত করার জন্য সর্বনাশকে ডেকে আনতে সে কুণ্ঠাবোধ করে না। ক্ষুধাই হোলো তার নাম।

তরুবালা তাঁর সর্বাঙ্গে কেমন একটা কম্পন অনুভব করেন। কিন্তু কোনও একটা অবলম্বন হাতের কাছে না পেয়ে তিনি রান্নাঘরে উঠে চলে যান।

দিন তিনেকের মধ্যেই দীপেনের সুপারিশে চায়ের দোকানে অন্তু কাজ পেয়ে গেল। আট বছরের সুশ্রী ছেলেটার বড় বড় সরল চোখ দুটো দেখে হোটেলওয়ালা খুশী হয়ে তাকে কাজ দিল। ভোরবেলায় আসবে, ফিরে যাবে অনেক রাতে সব কাজ সেরে। এইভাবে থাক্ কিছুকাল। মন বসলে আর বাড়ী ফিরতে চাইবে না, তখন দোকানের বেঞ্চের ওপর শুয়েই রাতটা কাটিয়ে

দেবে। সকাল-সন্ধ্যা দীপেনদের ত' এই দোকানেই আড্‌ডা, চোখে চোখেই থাকবে। অন্তুর বকশিসের পয়সাতেই দীপেনের চায়ের খরচটা চলে যেতে পারবে। সব দিকেই সুবিধা।

অন্তু খুশী হয়ে চায়ের দোকানে গিয়ে ঢুকলো।

এদিকে পঁয়তাল্লিশ টাকা বাড়ীভাড়াটার মধ্যে কোন ক্ষমা ছিল না, কিন্তু মৃগেন্দ্রবাবুর ভগ্নি যে এতকাল ধরে মাসোহারাটা পেয়ে আসছিলেন, সেটা বন্ধ করতে পারলে কে-ই বা বাধা দেয়! আজ মাস তিনেক ধরে সেই টাকাটা পাঠানো হয়নি। সুতরাং সেই ভগ্নি হঠাৎ একদিন কাঁকালে এক পুঁটলী নিয়ে এই বাড়ীতে এসে উঠলেন। মৃগেন্দ্র আপিসে গেছেন। ভাস্বতী রান্না-ঘরে ছিল, তরুবালা বাতের ব্যামোয় ক'দিন থেকে কষ্ট পাচ্ছেন—তাই মুড়ি দিয়ে এক জায়গায় পড়ে ছিলেন। যমুনা আর বরুণা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো।

ভিতরে ঢুকেই বৃদ্ধা হাঁক দিলেন, বড়মানুষের মেয়ে কোথায় গো?

প্রায় পাঁচ বছর পরে দেখা। তরুবালা বললেন, এসো দিদি।

মৃগেন্দ্রর চেয়ে উনি তিন বছরের বড়। বড় ননদকে দেখলেই ভাই-বৌরা অপরাধীর মতো কুঁকড়ে যায়। মুখে কথা সরে না। তিনি বললেন, রেলে চড়ে গঙ্গা পেরিয়ে এলুম তাই খাতির করছ, কিন্তু আসতে আমি চাইনি, বৌ। তোমরাই কান ধরে আমাকে টেনে আনলে।

তরুবালা বললেন, আর বলো না দিদি, এখানেও হাঁড়ি-চড়া দায় হয়ে উঠলো।

বাঁকা চোখে কান পেতে বৃদ্ধা ভ্রাতৃজায়ার কথাগুলি শুনে ফোঁস করে উঠলেন, কিন্তু আমার হাঁড়িটি বন্ধ করলে কেন, বৌ? পঞ্চাশ বছর আগে দলিলে লেখাপড়া ছিল,—বাপের আমল থেকে পেয়ে আসছি মাসোহারা। সেই মাসোহারা বন্ধ করবার তোমরা ত' কেউ নয়, বৌ!

যমুনা ক্রুদ্ধ চক্ষে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়েছিল, তার পাশে দাঁড়িয়ে বরুণা সকৌতুকে হাসাহাসি করছিল।

তরুবালা শান্তকণ্ঠে বললেন, সে দলিলও নেই, সেসব পৈতৃক সম্পত্তির চিহ্নও নেই! কবে কি ছিল, তাই নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না। চাকরির

টাকা—ঘরভাড়া দিয়ে পেট চালিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন, আর দেবেই বা কোত্থেকে?

বৃদ্ধা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, তাই বলে আমার মাসোহারা বন্ধ? সোয়ামি-সন্তান নিয়ে ঘর করছ, আমাকে না খাইয়ে মারলে তোমাদের কোন্ সুবিধেটা হবে বৌ? পনেরো বছর বয়সে বিধবা হয়েছি, পঞ্চাশ বছর ধরে মাসোহারা ভোগ করছি। আমার বাপ-পিতামোর টাকা তোমরাই ত খেয়ে মুখ মুছেছো, ভাই? হিসেব-নিকেশ আমি ত' কোনকালে দেখতে যাইনি। তিন কাঠা জায়গা আছে আমার হুগলীতে, কিন্তু ঘরখানা ছাইতে পারিনি আজ সাত বছর। রাতে কাঁথা মুড়ি দিয়ে বর্ষায় ভিজি। একটি গরু আছে, সেইটিই সম্বল! ভিক্ষেশিক্ষে করে খাওয়াই, ঘুঁটে বেচি, দুধ বিক্রী করে পাঁচ দশ টাকা পাই,—কোনমতে চলে। কিন্তু গরু গাভীন্ হলে পেট চলে কোত্থেকে? তোমাদের আক্কেল বিবেচনা নেই? ধর্মভয় নেই?

যমুনা আর থাকতে পারলো না। বলে উঠলো, আপনি বুঝি দুপুরবেলা আমাদের শাপমন্নি দিতে এলেন, পিসিমা?

বৃদ্ধার ঘাড় একটু কাঁপে, চোখেও দেখেন কম। ঘাড়টা তুলে তিনি একবার মেয়েটাকে নিরীক্ষণ করলেন। পরে বললেন, ওমা, খুব ত' ধানি-লঙ্কা পেটে ধরেছিস, বৌ? ছোট মুখে বড় কথা! ননদ-ভাজের কথায় ফোড়ন দিতে আসিস কেন, লা?

জবাবটা মুখের মতো। গালে চড় খেয়ে যমুনা সরে দাঁড়ালো।

আড়ালে গিয়ে বরুণা হেসে লুটিয়ে পড়ছিল। যমুনাকে কাছে ডেকে সে বললে, কেমন, থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিলে ত? কেন তুই ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলি?

রাগে ফুঁসিয়ে যমুনা বললে, ওকে আমি ওই ধুলোপায়ে বাড়ী থেকে তাড়াবো, তবেই আমার নাম,—ব'লে রাখলুম।

তোর ভারি সাধ্যি! মাকেই হিমসিম খাইয়ে দেবে।

এদিকে পুঁটলিটি একপাশে রেখে পিসিমা গুছিয়ে বসলেন। তারপর বললেন, তোর সেই মেয়েটা কোথায় গেল বৌ,—সেই যাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিল তোর সেই সতীন মাগি?

তরুবালা বললেন, আছে!

এখনো আছে? আমি ভাবলুম মরেছে বুঝি! বে'থা দিলি, না এখনও তুই খাওয়াস পরাস?

কে আর কা'কে খাওয়ায়-পরায়, দিদি! বলে, জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। আমার কাছেই আছে, যাবে আর কোথায়?

পিসিমা বললেন, সতীনের কাঁটা এখনো পুষছিস? ছুঁড়ির জাতজন্ম ভালো ত?

তরুবালা বললেন, আমি আর অতশত জানবো কেমন করে বলো? উনিই তাকে মানুষ করেছেন নিজের হাতে।

পিসিমা কিছুক্ষণ চুপ করলেন। পরে বললেন, পথের জঞ্জালকে ঘরে তুলে তোমরা ভাত-কাপড় দিচ্ছ তিরিশ বছর। আর আমি হলুম মায়ের পেটের বোন, আমার ভাত কেড়ে নিলে তোমরা! মৃগেন আসুক, আমি এর হেস্তনেস্ত না করে এ বাড়ীতে জল খাবো না। আমিও মনোহর চক্কোত্তির মেয়ে, একথা জানিয়ে রাখলুম।

পিসিমা একেবারে শিকড় নামিয়ে সেইখানে বসে রইলেন। কিন্তু কথাটা হোলো এই, জল তিনি এ বাড়ীতে সেদিন ঠিক সময়েই খেয়েছিলেন। কেননা, সকল প্রতিজ্ঞাকেই নষ্ট করে ক্ষুধা। তাঁর জন্য আতপ তণ্ডুল কোথাও পাওয়া গিয়েছিল কিনা বলা কঠিন, কিন্তু ভাস্বতী নানা উপচার সংগ্রহ করে তাঁকে রেঁধে দিয়েছিল।

মনোহর চক্কোত্তি আবার কে? এ বাড়ীর ছেলেমেয়েরা আজও ঠাকুরদাদার নাম শোনেনি। ঠাকুরদাদারা একালের আলোচ্য বস্তু নন, তাঁরা প্রাগৈতিহাসিক, তাঁরা হলেন প্রাচীন ভারত। তাঁদের নাম-খ্যাতির সঙ্গে আজকের জীবনের কোন যোগ নেই। উইপোকা-খাওয়া পুরনো কুলজীর মধ্যে কোথাও কোথাও তাঁরা মুখ লুকিয়ে আছেন।

কিন্তু পিসিমার মুখে সেই ঠাকুরদাদার রূপকথা শোনা গেল সন্ধ্যাবেলা। মনোহর চক্কোত্তি ছিলেন মস্ত লোক। তাঁর গড়গড়াটা ছিল রূপোর, আর নলের মুখ ছিল সোনা বাঁধানো। হুঁকো-বরদার ছিল একজন, আর ছিল কাপড় কোঁচাবার লোক,—এবং বলা বাহুল্য, পা টিপবার লোক ছিল আলাদা। তামাকের সুগন্ধে পুকুরঘাটে মেয়েদের আসরে তর্ক যেতো থেমে। হাতীশালে

হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া। লোকলস্কর, পাইক আর বরকন্দাজ,—পিসিমার গল্পে সবাই মুগ্ধ।

তিন

রান্নাবান্না সেরে গুছিয়ে রেখে ভাস্বতী বাইরে যাচ্ছিল, হঠাৎ বরুণার দিকে চোখ পড়তেই সে ফিরে দাঁড়ালো। বরুণার হাওয়ায় একটি মিষ্ট গন্ধ ঘুরছে। পরণে তার নতুন তাঁতের শাড়ী, কানে এক জোড়া দুল, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ,—বেশ মানিয়েছে ওকে। ওকে দেখে অন্য বোনেরা ঈর্ষান্বিত হোক।

বরুণা ফিরে দাঁড়ালো হাসিমুখে। ভাস্বতী বললে, কোথায় চললি রে?

কাজে।

এমন কী কাজ, যেখানে এত সেজেগুজে যেতে হয়?

বরুণা বললে, রান্নাঘরের কাজ হলে তোমার ওই সজ্জাতেই চলতো। আমাকে ভদ্রসমাজে যেতে হয়, বড়দি।

ভাস্বতী হাসিমুখে বললে, কানের দুল পেলি কোথায়? ভ্যানিটি ব্যাগ! এমন শাড়ী! জরির চটি!—এদের দাম ত অনেক?

হ্যাঁ, অনেক দাম। আমার কাজের দাম তার চেয়েও বেশী। এ আমার উপার্জনের পয়সা।

এ ত' খুবই আনন্দের কথা, ভাই।—ভাস্বতী বললে, আমরা কিছু করতে পারিনি,—তুই যদি কিছু সুবিধে করতে পারিস, সব দিকেই ভালো।

বরুণা বললে, আমি সুবিধে করতে পারলে তোমাদেরও ভালো হবে, এমন আশা কিন্তু ক'রো না, বড়দি। ওতে কিন্তু তোমরাই ঠকবে।—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বরুণা নিজের মুখে একটু পাউডার বুলিয়ে নিল।

ভাস্বতী বললে, তোদের কাজের জায়গা কতদূরে রে?

বরুণা বললে, জায়গা অনেকগুলো, কোন্‌টার কথা তোমায় বলবো? শুনেই বা তোমার লাভ কি?

ভাস্বতী বললে, লোকে চাকরি করে দশটা-পাঁচটা, তোর সেরকম কোনো নিয়ম নেই?

বরুণা বললে, তোমার কথার কোনো মাথামুণ্ডু নেই! তুমি নিজেই ভালো

লেখাপড়া শেখোনি, তুমি আবার আমার গুরুগিরি করতে! আমি কি বাবার মতন মাছিমারা কেরাণি যে, দশটা-পাঁচটা করবো? ক্যান্‌ভ্যাসারের চাকরিতে কতখানি স্বাধীনতা, তা কি তুমি জানো? একথা মনে রোখো, ওই সুশান্ত-বাবুদের জন্যেই তোমাদের মানরক্ষে হচ্ছে!

ভাস্বতী যাবার সময় ব'লে গেল, আর কিছু নয়, তুই নিরাপদে থাকবি,—এইটুকুই আমি চাই বরুণা!

ভাস্বতী চ'লে যাবার পর তরুবালা এসে দাঁড়ালেন। বরুণা বললে, তোমার বড় মেয়েকে মানা ক'রো, মা—আমার ওপর যখন তখন যেন কর্ত্রীত্ব না করতে আসে। যেমন মানুষ তেমনি যেন থাকে। অমন করলে এর পর আমি মান রেখে কথা বলতে পারবো না, ব'লে দিচ্ছি।

তরুবালা বিরক্ত হয়ে বললেন, ভাস্বতীর আক্কেল-বিবেচনা দিন দিনই কমে যাচ্ছে। সময় কেন যে সামনে এসে দাঁড়ায়, বুঝিনে। লক্ষণ-অলক্ষণ ত একটা আছে!

বুড়ি পিসিমা ঘাড় কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, এবার আমাকে তোমরা বাহাদুরি দাও! আমিই ব্যবস্থা করলুম যে, পথো মেয়েটাকে ঘরকন্নার কাজে ঢোকাও। কুট্‌নো, বাটনা, ঘরদোর-ঝাঁট-পাট, সাবানকাচা, নোংরা ঘাঁটা, বাসন মাজা,—সব ওকে দাও। হাতীহনো গতোর, বসিয়ে খাওয়াবে কে মা? তোমরা বললে, বাউনের মেয়ে, নেহাৎ বেজাত নয়,—আমিও রাজি হলুম। ওর কাছেই বা তোমরা সব কথা বলো কেন? শোবার ঘরেই বা ওকে উঠতে দাও কেন?

এতটা বোধ হয় বরুণারও কানে ভালো লাগলো না; অন্তত এটা তারা আশৈশব জেনে এসেছে, ভাস্বতী তাদের বড়দিদি। তারা বড়দিদির উপর কথা বলেনি কোনোদিন। বড়দিদির বিলিব্যবস্থার বাইরে তাদের সকলের জীবন-যাত্রার কোনও ভিন্ন ব্যবস্থাও ছিল না,—যেখানে মা ও বাবা পর্যন্ত এতকাল ধ'রে বশ্যতা স্বীকার ক'রে এসেছেন।

পিসিমার কথা শুনতে শুনতে আড়ষ্ট মনে ধীরে ধীরে বরুণা বেরিয়ে চ'লে গেল। পিছন থেকে তরুবালা বললেন, দুগ্গা দুগ্গা—কি জানো দিদি, আমার ছোট মেয়েটির বরাবরই একটু সুখী ধাত—

ঠাকুরদাদার ধাত পেয়েছে! ওদের গুষ্টি রুইমাছের মুড়ো ছাড়া পাতে

বসেনি! আধমণ দুধের মালাই হোতো রোজ। ঘরে ঘোল-মাখনের মৈ-মাড়ন। দাদখানি চালের ঘি-ভাত দুবেলা। তোমার পেরথম শাউড়ীর গায়ে ছিল একশো ভরি সোনা! আমাদের সৎমা গো—মাগি মরবার তেরো বছর পরে আমাদের মা এলো ঘরে। সে আজ ধরো আশী বছরের কথা,—পাঁচ বেটা গেল একজনের পর একজন। তারপরে এলুম আমি, পোয়াতির বাঁধন,—আমার কোলে মৃগেন। সে সব কি আর আজকের কথা? ওদের ধাতই হলো নবাবী। ওদের কোনো পুরুষে কখনও ভেবে খেতেও হয়নি, খেটে খেতেও হয়নি।

যমুনা এক পাশ থেকে বললে, আজ তোমাদের তবে এমন দুর্দশা হলো কেন, পিসিমা?

তা হবে না, বাছা?—পিসিমা বললেন, সেকালে মদন চক্কোত্তির জ্ঞাতগুষ্টি কি কম ছিল? মকোদ্দমা উঠলো হাইকোর্টে, দশ-বিশটে উকীল-মোক্তার লুটে পুটে খেলো,—চারদিক শুকিয়ে চড়বড় ক'রে উঠলো! নইলে কি আর এই রাখু বামুনি এসে মাসোহারার জন্যে তোমাদের ঘর কামড়ে প'ড়ে থাকে?

যমুনা বললে, তালপুকুরের নামই আছে পিসিমা, কিন্তু ঘটি আর এখানে ডুববে না!

পিসিমা বললেন, ওমা, ছুঁড়ির চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শোনো! রাশি-নক্ষত্তরের দোষে মেয়েটার জন্ম, বুঝলে বৌ? তোর খাই, না পরি, লা? পরের ঘরে গিয়ে ঝাঁটা আছে তোর কপালে!

তরুবালা বললেন, যমুনা, দূর হয়ে যা এখান থেকে।

যমুনা বললে, বাইরের জঞ্জাল আমরাও ঝেঁটিয়ে ফেলতে জানি।—এই ব'লে সে চ'লে গেল।

পিসিমা চীৎকার ক'রে উঠে কদর্য ভাষায় যখন সকলকে ধ'রে গালমন্দ আরম্ভ করলেন, ঠিক সেই সময় দীপেন এসে উপস্থিত। দীপেন হাঁ হাঁ ক'রে এসে বললে, হয়েছে কি?

তরুবালা তেড়ে গিয়েছিলেন যমুনার পিছনে। হাসিমুখে দীপেন বললে, পিসি, চেঁচাচ্ছ কেন? এসব ত' রামায়ণ-মহাভারতের গালাগাল, তুমি শিখলে কোত্থেকে? চুপ চুপ—

পিসি চীৎকার করলেন, ওরে বাবা, কে আছিস রে—সবাই আমাকে ধ'রে মারতে এলো রে—

থামো পিসি—দীপেন ধমক দিল, গরু পুষেছ খোঁয়াড়ে, কিন্তু গরুর ডাক এনেছ গলায় পুষে। উড়ে এসে জুড়ে বসেছ, কই—বিদায় নেবার নামটিও ত' করো না! চুপ করো বলছি—

এমন সময় ছুটতে ছুটতে এলো ভাস্বতী। চোখ পাকিয়ে সে প্রথমেই সরিয়ে দিল দীপেনকে। তারপর বুড়ির কাছে ব'সে সে বললে, পিসিমা, আপনি চুপ করুন, ওরা ছেলেমানুষ—ওদের অপরাধ নেবেন না। আমি ওদের হয়ে মাপ চাচ্ছি, পিসিমা। আপনি চুপ করুন—

পিসিমা বললেন, কিচ্ছু আমি বলিনি, মা। আমি ওদের বাপকে কোলে নিয়ে মানুষ করেছি, আমাকে অপমান করতে এলো। দেখুক পাড়ার সব লোকেরা, আমি থানায় খবর দেবো, ওদের হাতে দড়ি বাঁধবো,—আমাকে ধ'রে অপমান করতে আসে!

পিসিমা, আপনি চুপ করুন—ভাস্বতী মিনতি জানালো। পুনরায় বললে, ওরা মানুষ হয়নি, ওদের জ্ঞান হয়নি—ওদের দুঃখ-দারিদ্র্য অনেক নীচে নামিয়ে দিয়েছে সবাইকে। আপনি শান্ত হোন, আমি আপনার সব ব্যবস্থা ক'রে দেবো। আপনি যাতে হাসিমুখে ফিরে যেতে পারেন তাই আমি দেখবো।

দীপেন বললে, হ্যাঁ, তুমি সবই পারবে, ইচ্ছে করলেই পারবে, এ আমি বিশ্বাস করি বড়দি। কেবল যে-ঘর থেকে তুমি নিজে ভাত কাপড় পাও, যে-ঘরে থেকে তুমি মানুষ হয়েছ—সেই ঘরটা বাঁচাবার কোনো চেষ্টাই তুমি করতে পারো না! তোমায় কে না চেনে?

রাগে কাঁপতে কাঁপতে দীপেন সেখান থেকে চলে গেল।

পিসিমার চীৎকার থেমে গেল, কিন্তু দীপেনের কথাগুলো শুনে ভাস্বতী স্তব্ধ হয়ে রইলো খানিকক্ষণ। এটা কেবল স্পর্ধার কথা নয়, এর পিছনে রয়েছে সম্পর্কটাকে অস্বীকার করার কথা। সমগ্র অবস্থাটার পিছনে রয়েছে অতনু। মৃগেন্দ্রের মাসিক বেতনের টাকা হাতে করে নিত অতনু, নিঃস্বার্থ-ভাবে এ সংসার অতনুই চালাতো। অভাব ছিল প্রতি পদে পদে, কিন্তু অনাহার ছিল না। এখানে অতনুর কড়া শাসন দেখে ভাই-বোনেরা অসন্তুষ্ট হতো, কিন্তু অতনুর অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা লক্ষ্য করে মৃগেন্দ্র অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতেন। মৃগেন্দ্রের টাকার মধ্যে অতনু নিজের টাকা কিছু কিছু গুঁজে দিত, টের পেতো না কেউ। সেই অতনুকে কৌশলে সরানো হোলো।

কেন না, ভাই-বোনেরা এ বাড়ীতে এখন প্রতিপত্তি লাভ করেছে। অতনুকে তারা মানতে চায় না। ভাস্বতীর সন্দেহ ছিল, এ বাড়ীর খরচের মধ্যে অতনু টাকা দেয়, এটার মধ্যে সে অপমান বোধ করতো। অহেতুক দান করলে বাবার অপমান হবে—ভাস্বতীর মনে এই কথা ছিল। অতনু এ বাড়ীতে কেন আসে, এখানে তার আকর্ষণ কি—কেনই বা তার এখানে কর্তৃত্ব প্রচলিত, এ সমস্তই ভাস্বতী বিচার করেছে। অতনুকে সরিয়ে দিল সে নিজে। কিন্তু তার সরে যাবার পর এ বাড়ীতে দারিদ্র্যের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলা বেড়েছে, ইতরতার সঙ্গে বেড়ে গেছে স্বার্থপরতা। দিনে দিনে ভাস্বতীর যেন গলা বুজে আসছে।

পিসিমা শান্ত হয়েছেন। ভাস্বতীর চেষ্টায় স্নানাহার সেরে শরীর সুস্থ করে তিনি একপাশে দিবানিদ্রার জন্য একখানা মাদুর বিছিয়ে পড়ে রইলেন। এ পরিবারের সবাই যে তাঁর আপন এবং সন্তানের সমতুল্য—একথাটা তাঁর বোঝবার দরকার ছিল না। এ যুগে বলা হচ্ছে, আসলে অর্থনৈতিক সম্পর্কটাই হোলো সকল সম্পর্কের ভিত্তি,—কথাটা পিসিমার ওপরে কম খাটে না। ভাস্বতীর কাছে আশ্বাস পেয়ে তিনি এরই মধ্যে ভাস্বতীর প্রতি স্নেহসিক্ত হয়েছেন এবং চুপি চুপি এরই মধ্যে জানিয়েছেন, তাঁর ওই ভাদ্দরবৌ হোলো চিরকেলে ডাইনী, ওর কোনো ধর্মভয় নেই, ওর যদি হাড়ির দুর্দশা না হয়, তবে আমি মনোহর চক্কোত্তির মেয়ে নই। আর ওই ওর ছেলেমেয়েরা—ওরা যেন চিররোগা ছিরিহিন্নি হয়ে থাকে!

শাপ-শাপান্ত করে পিসিমার চোখে যখন তন্দ্রা এলো, তখন ভাস্বতী আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো। তার হাতে ছিল একটি ছোট কবিরাজী তেলের শিশি। দশ নম্বর বাড়ীর মণি মজুমদারের স্ত্রীর জন্য এই তেলটুকু অনেক চেষ্টায় সে যোগাড় করেছিল। মেয়েটির বিবাহ হয়েছে প্রায় বছর পাঁচেক আগে, ছেলেপুলে এখনও হয়নি। সম্প্রতি কিছুকাল থেকে তার ফিট হচ্ছিল, এখন ফিট কম, কিন্তু সব কাজের মধ্যে হঠাৎ আজকাল কী যেন বিড়বিড় করে বকে ওঠে এবং নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে। স্বামী চাকরি করে কোন্ কারখানায়—সকালে যায় এবং ফিরে আসে সেই সন্ধ্যার পর। পুত্রবধূর এই ব্যাপারটা শাশুড়ীর মুখ থেকে ভাস্বতী শোনে এবং অতনুকে গিয়ে বলে। সুতরাং, যেমন চিরকাল, ভাস্বতী একবার কিছু একটা জিদ ধরলে তাকে এড়ানো

বড় কঠিন। এলোপ্যাথী শাস্ত্রে এ সব রোগীর ওষুধ খুঁজে পাওয়া যায় না, অতএব কলকাতা শহর ঘুরে অতনু এক কবিরাজকে ধরে সেই মাথার তেলটুকু এনে দিয়েছিল।

কিন্তু হিতে বিপরীত ঘটতে পারে, একথাটা ভাস্বতী কল্পনা করেনি। শাশুড়ীকে বলে তেলটুকু হাতে নিয়ে বৌটির কাছে যেতেই বৌটি হঠাৎ আজ উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

ভাস্বতী মিষ্টকণ্ঠে বললে, তোমার মাথায় তেলটুকু মাখিয়ে দিতে এলুম, ভাই।

মাথায় তেল মাখাতে এলে না মাথা খেতে এলে, বলো ত? তোমার মতলব কি, আমি জানিনে মনে করেছ? বেরিয়ে যাও ঘর থেকে, দূর হয়ে যাও,—

মেয়েটা একেবারে হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করতে লাগলো। শাশুড়ী ভয়ে ভয়ে বললেন, পাগল ক্ষেপেছে, তুমি বেরিয়ে এসো মা ঘর থেকে।

ভাস্বতী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু মেয়েটির গলার আওয়াজে নীচের ভাড়াটেদের গিন্নি ছুটে এসেছিলেন, এবং তাঁর পিছনে আরো নানা লোক। গিন্নি এসে প্রথমেই বললেন, তুমিই বা এমন গায়ে পড়ে উপ্‌গার করতে এসেছিলে কেন মা? কে তোমাকে ডাক্তারি করতে ডেকেছিল? পরের ঘরের বউ, তার স্বামীর বিনা হুকুমে তুমি কেন তেল মাখাতে যাও?

একজন বললে, ওঁর মতলবটা কি একবার শোনাই যাক না! উনি তো অন্য বাড়ীর মেয়ে, উনি কেন দুপুর বেলায় চুপি চুপি এ বাড়ীতে এসে ঢোকেন? আজকাল কত লোকের কত রকমের অভিসন্ধি, কার মনে কী আছে, কে বলতে পারে!

আরেকজন বললে, নিজের ঘর-সংসার হয়নি কিনা, তাই পরের বৌএর ওপর হিংসে। ভেতরকার মতলবটা কি? নতুন বৌএর গায়ে গয়নাগাঁটি সব ঠিক আছে ত?

পিছন থেকে আর একজন কে যেন নোংরা টিটকারি দিয়ে বললে, মাখাতে এসেছিলে, না খাওয়াতে এসেছিলে?

বৌটি চীৎকার করছিল, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি,—ভালো হবে না বলে দিচ্ছি—বেরিয়ে যাও—

অতনু অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার আশৈশব সহচরীর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর এক সময়ে সে আবার মাসিকপত্রখানা হাতে নিয়ে শুয়ে পড়লো। পড়তে লাগলো সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে, কিন্তু ইংরেজি অক্ষরগুলোর জটিলতার ভিতর দিয়ে তার চোখের তারাদুটো ছুটে ছুটে চললো—তাদের যে কোনো অর্থ আছে, উপলব্ধি আছে, এ সমস্ত কিছুই তার বোধগম্য হলো না। এক সময় ক্লান্ত চোখের সামনে থেকে বইখানা সে সরিয়ে নিল। অন্তরের অতল তল থেকে এক প্রকার নিগূঢ় সমবেদনা কখন যেন গলার কাছ পর্যন্ত উঠে এসে তার চোখ দুটোকে ঝাপসা করে দিয়েছে। ঘরের সমস্ত বাতাসটা যেন সেই বেদনায় থমথম করছে। অতনু শান্তচক্ষে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে রইলো।

পরিশ্রান্ত ক্লান্ত শরীরটা ঘণ্টা দুই পর্যন্ত ঘুমের মধ্যে অসাড় ছিল, তারপরে এক সময় ভাস্বতীর চমক ভাঙলো। তাড়াতাড়ি সে উঠে বসলো। খাটের উপরে অতনু নেই, খাটের নীচে চটিজোড়াটা নেই। ভাস্বতী একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ বসেই রইলো। এখানে এলে তার ঘুম পায়, তার সমস্ত শরীরটা যেন অপরিসীম ক্লান্তিতে শিথিল হয়ে আসে। তার দায়িত্ববোধ থাকে না, কোথাও কোনো উদ্বেগ আছে তার মনে হয় না। বাড়ীতে রান্নাবান্নার কাজটা সে নিয়েছে। কাজটা ভালো, এক কোণে এক মনে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকা যায়। আর রান্নাই বা কি! কোনোদিন চচ্চড়ি, কোনোদিন বা ডালের সঙ্গে কিছু সিদ্ধ। ভাত থেকে ফ্যান ফেলতে গেলে ভাতে কুলোয় না। তরকারির খোসা ফেলা যায় না তাদের বাড়ীতে। শেষ পাতে হয়ত বা খানিকটা তেঁতুল গোলা। সুতরাং রান্নার ফর্দ প্রত্যেক দিনই প্রায় এই। রান্নাঘরে ভাস্বতীর পরিশ্রম নেই, কিন্তু দুর্ভাবনা আছে। কেমন করে থালা সাজাবে এই হোলো সমস্যা। খাওয়া সেখানে বড় নয়, উদরপূর্তিটাই লক্ষ্য। এবেলায় রান্না নেই, তাই ভাস্বতীর ছুটি।

অতনু ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। ভাস্বতী হাসিমুখে চেয়ে বললে, ডাক্তার, শরীরটা কিছুদিন থেকে ভালো যাচ্ছে না কেন, বলতে পারো?

অতনু বললে, বিনা পরিশ্রমে বসে খেলেই শরীর খারাপ হতে থাকে!—এই বলে সে আলনায় জামা গুছিয়ে রাখার জন্য এগিয়ে গেল।

ভাস্বতী খুব হাসলো। অতনু পুনরায় বললে, আমার কি মনে হয়

জানো? তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতিই হচ্ছে দিন দিন। তোমার শরীর খারাপ কেউ বিশ্বাস করবে না।—কই ওঠো, চা হয়েছে!

চা! —আমি যে এখনও চান করিনি!

মানে? —অতনু দাঁড়িয়ে গেল। —এখন বেলা পাঁচটা বাজে, তা জানো? দুপুরবেলা খাওয়াও হয়নি বলো?

হলুদের দাগলাগা শাড়ীখানা কোনোমতে গুছিয়ে নিয়ে ভাস্বতী ঘর থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। আজ রান্না সেরে সেই যে সে বেরিয়ে পড়েছিল, আর ফিরে যেতে পারেনি।

এমন ঘটনা নতুন নয়। এটা মেয়েদের ঘরোয়া ইতিহাস। দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা কী খায়, সে কথা আজ ওঠে না। অনাদৃত জীবনের অন্তরালে কোন্ ধিক্কার মেয়েদের জন্য লুকোনো থাকে, সে কথা নিয়ে কেউ চেঁচায় না। হৈ-চৈটা পুরুষের, মেয়েদের নয়। পুরুষের পেট ভরছে না একালে, তাই মেয়েদের দিয়ে তারা উপার্জন করিয়ে নিচ্ছে, খাটিয়ে খাওয়াচ্ছে। আগেও মেয়েদের অন্ন জোটেনি, আজও তারা উপবাসী। ঘরে বসিয়ে বুড়ি পিসিকে যদি খাওয়াতে হয়, তবে প্রথম মার খায় ভাস্বতী—একথা অতনুর জানা ছিল বৈ কি।

বুড়ো হরিদাস কলতলায় একখানা ধুতি রেখে এলো। তার সঙ্গে দিয়ে এলো কাপড়-কাচা একখানা সাবান। ভাস্বতী অপরের পরিশ্রম নেয় না, নিজের কাপড়ে নিজেই সে সাবান ঘষবে। হরিদাস এতে অত্যন্ত বিরক্ত, কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করা চলবে না।

স্নান সেরে ধুতি পরে ভাস্বতী বেরিয়ে এসে বললে, হরিদা, আজ তুই কালীঘাটে পুজো দিস—তোর জন্যে কাপড় ছেড়ে এসেছি, সাবানকাচা করে দিস, ভাই।

হরিদাস ছাড়বার পাত্র নয়। বললে, কালীঘাটে পুজো দেবো সেইদিন, যেদিন তোমার হাতের রান্না খাবো, দিদি।

উঠোনের এদিকে ছোট ছোট তিনটি ঘর। একটিতে থাকে হরিদাস, একটি ভাঁড়ার, আরেকটিতে রান্না হয়। ভাঁড়ারঘরের একটি কোণে ভাস্বতীর দুএকটি সামগ্রী থাকে। পুরনো একটি আয়না, একখানা চিরুণী, নারকেল তেলের একটি বোতল এবং দুএকটি হোমিওপ্যাথির শিশি। সামনের দেওয়ালে

ঝোলানো ঠাকুরের একখানি ছবি—ছবিখানা সে এনেছিল সে-বছর রথতলা থেকে। অতনু বলেছিল, মেলাতে এসেছ, তুমি যা কিনতে চাও, তাই আমি দেবো। —ওই ছবিখানা কিনেছিল ভাস্বতী,—দাম নিয়েছিল চার আনা। সেই থেকে এখানেই টাঙানো আছে; এখানেই সহজে জায়গা পেয়েছে।

মাথাটা আঁচড়ে, চেহারাটা ভদ্র করে তুলে, ভাস্বতী এসে দাঁড়িয়ে বললে, আমাকে না জানিয়ে চা করতে গেলে, আমি বুঝি চা করতে পারতুম না? চক্ষের পলকে এত খাবার জোগাড় করলে কোত্থেকে? খাবারে পেট ভরে না, তা জানো, ডাক্তার?

অতনু হাসিমুখে বললে, টাকার গোছা পেটে পুরলেও ক্ষিধে যায় না!

আমি বুঝি খাবার জন্যেই তোমার কাছে এসেছিলুম?

রাম বলো! —অতনু বললে, তুমি রাঁধবে একখানে আর খাবে অন্যখানে, এই বা ভাববো কেন? বাঃ স্নানের পর চেহারাটা কিন্তু তোমার মন্দ দাঁড়ায়।.., -সরুপাড় ধুতিপরা একপ্রকার বিধবা আজকাল দেখা যায় এখানে ওখানে—ঠিক তেমনি! ছিমছাম চেহারা গলায় চিকচিকে হার, হাতে মিহি আংটি, মাথায় আলগা এলো খোঁপা, বেশ আধুনিক ধরণের বিধবা! আবার ওর মধ্যে বয়সটাও ঠিক ঠাহর করা যায় না!—তোমার চেহারাটা প্রায় সেই রকমই দাঁড়িয়েছে!

ভাস্বতী বললে, বর্ণনার মধ্যে তোমার লোভের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে অতনু!

অতনু পরিহাস করে বললে, আমি যুদ্ধ-ফেরত লোক, পাঁচ বছর ধরে অসংযম আর লোভের মধ্যে কাটিয়েছি, তার গন্ধ গা থেকে আজো যায়নি। নাও, এবার বসো।

ভোজ্যবস্তুর আয়োজন ছিল প্রচুর। বুঝতে পারা যায়, নৈশ-ভোজনের একটা অংশ এরই মধ্যে অতনু রান্নাঘর থেকে চায়ের আসরে আনিয়েছে। মনে পড়ছে বয়স যেদিন অল্প ছিল, দুজনে বসে মুড়ি চিবিয়েছে তারা অনেকদিন। বালক অতনু সেদিন এত নিরীহ ছিল না, তরুণ অতনু সেদিন এত ভদ্রও ছিল না। চিলে কোঠায় বসে ভাস্বতী নিজের মনে গল্প বলতো, শ্রোতা ছিল নিজেই। সেই শ্রোতা আর বক্তা ভাস্বতীর চোখে মুখে ছিল একপ্রকার বন্যতা, একপ্রকার নীলাভা—যা লক্ষ্য করে তরুবালা পর্যন্ত অনেক সময় অন্যমনস্ক হতেন। মৃগেন্দ্র সেই কথা শুনে নিজের মনে ভাবতেন অনেক রকমের কথা। হঠাৎ সেই চিলে কোঠায় এসে দাঁড়াতো অতনু, ভাস্বতীর গল্প যেতো থেমে

মুখ তুলে সে তাকাতো এই তরুণ যুবকের মুখের দিকে। ভাস্বতীর চোখের সেই নীলাভা আজও আছে, কিন্তু সেদিনকার সেই তরুণ অতনুর মুখে চোখে বিগত দিনের চপলতা কোথায় যেন মিলিয়ে শান্ত হয়ে গেছে। ওরা কখনও যেতো ভরা দুপুরে নিরিবিলি গঙ্গার তটে। নরম পলিমাটির উপরে ভাস্বতীর পা দু'খানা বসে যেতো—সেই পেলবতার স্পর্শে পা দু'খানা শিউরে উঠতো। কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে সারি সারি শিবের মন্দিরগুলি দেখতে তার ভালোই লাগতো। ফিরবার পথে আনতো প্রসাদী ফুল, সেই ফুল মৃগেন্দ্রের শিয়রে রেখে দিত। অতনু ছিল যেন তার উপলক্ষ্য, যেন তার আত্মপ্রকাশের উপকরণ! সমস্ত বিষয় থেকে, সমস্ত পরিপার্শ্ব থেকে ভাস্বতী এক এক সময় ছুটি নিয়ে কোথায় যেন সরে যেতে চাইতো,—যেখানে নিজের মনকে পৌঁছানো অতনুর পক্ষে কঠিন ছিল। অতনু হাসিমুখে বেরিয়ে পড়তো ভাস্বতীর ...গী, কিন্তু ফিরে আসতো কেমন যেন দুর্ভাবনা নিয়ে।

অতনু?

অতনুর চমক ভাঙলো। ভাস্বতী হেসে উঠে বললে, এতক্ষণ খাচ্ছিলে, না জাবর কাটছিলে?

বোধ হয় শেষেরটাই। কি বলো?

একটা কথা বললে রাগ করবে?

অতনু বললে, রাগ করবো না এমন কথা কি তুমি কখনো বলেছ?

ভাস্বতী কিয়ৎক্ষণ ভাবলো। তারপর বললে, আমাদের পাড়ায় এত লোক লুকিয়ে লুকিয়ে আমার কাছে হাত পাতে, আমি কি করি বলো ত?

তুমি কি পৃথিবীর দুঃখ ঘোচাবার ভার নিয়েছ?

ভাস্বতী বললে, আমি মা-বাবার জন্যে কখনো তোমার কাছে হাত পাতিনি, অতনু। তুমি অনেকবার দিতে চেয়েছ, কিন্তু আমি বাধা দিয়েছি তোমাকে। আমি দাঁড়িয়ে দেখতে চাইনি, তুমি দান করছ বাবাকে, আর বাবা হাত পেতেছেন তোমার সামনে। সেই অপমান আমি নিজের চোখ দিয়ে দেখবো, এর চেয়ে আমার মৃত্যু ভালো। দারিদ্র্যের মধ্যে একদিন গৌরব ছিল, সেই গৌরব তোমার হাত দিয়ে ম্লান হতে দিইনি, অতনু।

অতনু বললে, দারিদ্র্যের গৌরব? সে কেমন, চীনু?

চীনু হলো ভাস্বতীর ডাক-নাম—এ নাম অনেক সময় অতনুও ব্যবহার করে। ভাস্বতী বললে, হ্যাঁ গৌরব, কিন্তু তোমাকে আমি বোঝাবো কেমন করে? কেমন করে বললে তুমি আমার মনের কথা বুঝবে?

অতনুর কান দুটো যেন একটু রক্তিম হয়ে উঠল, তার ছায়া পড়লো তার চোখের দুপাশে। বললে, তোমার মুখের দিকে তাকালে কি তোমার মনের কথা আমি ধরতে পারিনে?

ভাস্বতী বললে, দারিদ্র্যের দহনে পুড়ে-পুড়ে মানুষ খাঁটি হয়, এ কি তুমি বিশ্বাস করো না?

দারিদ্র্য মানুষকে নষ্ট করে, চীনু!

সেটাও তার গৌরব। সত্য পরিচয়কে বাইরে টেনে আনে, এ শক্তি কেবল দারিদ্র্যের আছে। সৌভাগ্য মানুষের আসল চেহারাটাকে চাপা দিয়ে রাখে, তাকে সঠিক বুঝতে দেয় না, একথা কি তুমি মানো না, অতনু? টাকার জোরে ধার্মিক হয়েছে, দানশীল হয়েছে, টাকার জোরে শ্রদ্ধা আর সম্মান কুড়োচ্ছে, টাকার জোরে ক্ষমতাকে কিনে বেড়াচ্ছে, মানুষের উপর প্রভুত্ব করছে,—এমন অনেক নীচ নোংরা লোক কি তোমার চোখে পড়ে না? সৌভাগ্য লাভ করে অনেক মহৎ মানুষ নষ্ট হয়ে গেছে, এও কি তুমি দেখোনি?

অতনু বললে, কিন্তু দারিদ্র্যের ভিতরে পড়ে অনেক মহৎ প্রাণ যে নষ্ট হয়ে যায়, এ ঘটনাও তো আছে।

নেই। —ভাস্বতী হাসিমুখে বললে, নেই! প্রকৃত মহত্ত্ব নষ্ট হয় না, অতনু। কেন না, তার লোভ নেই, তার মোহ নেই—সে যত পোড়ে, ততই তার আভা বাড়ে। সেই হোমের আগুনের চারদিকে যারা থাকে, তারাও জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে।

অতনু এবার হাসলো। বললে, তোমার কথা শুনলে মন নেচে ওঠে, কিন্তু যুক্তি খুঁজে পাইনে। তুমি কি এইজন্যেই মেসোমশাইকে আমার সাহায্য নিতে দাও না?

ভাস্বতী বললে, হয়ত এইজন্যেই! আমি জানতে চেয়েছিলাম, যিনি আমাকে পথ থেকে কুড়িয়ে আমাকে প্রথম সন্তান বলে বুকে তুলেছিলেন, চিরদিন যাঁকে বাবা বলে জেনে এসেছি,—সমস্ত প্রকার দুঃখদারিদ্র্যের ভেতর দিয়ে তাঁর স্নেহের মহিমা উজ্জ্বল হোক, চিরকাল আমার কাছে সুন্দর হয়ে থাক।

আমার জীবনেরও একটা আদর্শ আছে, অতনু—সে আদর্শ আমি ওই প্রতি-পালক পিতার কাছেই পেয়ে এসেছি!

ভাস্বতী হাসলো। পুনরায় বললে, আকন্দফুল ফুটে থাকে জঙ্গালের চারদিকে অনাদরে, কিন্তু বাবা সেই ফুল তুলে দেখেছিলেন, তার মধ্যে রয়েছে এক ফোটা নীল রং—সেইটুকুই আমার প্রাণ, সেইটুকুই আদর্শ। মনে রেখো অতনু, বাবা কোনোদিনই তোমার সাহায্য চাননি। তোমার টাকায় তাঁর লোভ ছিল না, কিন্তু তোমার ব্যবস্থাপনায় তাঁর বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি তাঁর মাসিক টাকা তোমার হাতে তুলে দিতেন।

অতনু কিয়ৎক্ষণ কী যেন চিন্তা করলো। তারপর বললে, একথা কি সত্যি, তোমাদের খরচপত্রের যে ব্যবস্থা আমার হাতে ছিল, তোমার কথাতেই সে ব্যবস্থা আমার হাত থেকে সরে গেছে?

সত্যি!

তোমাদের ওখানে দিনরাত আমি যাতায়াত করে এসেছি এতকাল,—কিন্তু সেই আনাগোনা এখন তুমিই কি বন্ধ করতে ইচ্ছুক?

ভাস্বতী বললে, হ্যাঁ, এও সত্যি। তুমি ওখানে মেমাবান, এই আমার ধারণা। তুমি গেলে আমার ভাই-বোনদের লোভ বেড়ে ওঠে, কেননা, তুমি টাকার মানুষ। ওরা তোমার টাকা চায়,—ব্যবস্থাপনা চায় না। তোমার টাকায় আমার লোভ নেই বলেই ওরা আমার ওপর বিরক্ত। আমি নাকি ওদের পথের কাঁটা!

হাসিমুখে অতনু বললে, কিন্তু টাকা নিয়ে নিজে আমি কী করবো, একথা বললে না তো?

আহারের পর্বটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। হাসির উত্তরে হেসে ভাস্বতী বললে, আমার মতন গরীব-দুঃখীদের এমনি করে ডেকে খাওয়াবে, তাহলেই তোমার টাকার সদ্ব্যয় হবে! ভয় নেই, তোমার টাকা আমিই ফুরিয়ে দেবো।

দিতে মন উঠবে?

কেন উঠবে না! চারদিকের অভাবের মাঝখানে বসে তুমি টাকা সঞ্চয় করে চলবে,—এ অপমান তোমাকে কেন সইতে দেবো? তুমি যদি বিয়ে করে ঘর-সংসারী হতে, ছেলেপুলে হতো,—আমি তখন হয়ত অন্য কথা বলতুম!

অতনু হাসিমুখে বললে, ঘর-সংসারী হলে তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকতো কতটুকু?

ভাস্বতী বললে, ঠিক যতটুকু আজকে আছে!

তখন ঘরের লোক যদি বেঁকে দাঁড়াতো?

ভয় পাইনে তার জন্যে অতনু, মুখ ফিরিয়ে তখন অন্যদিকে চলে যেতুম! এবার আমি উঠি।

হরিদাস এসে সুইচ টিপে আলো জেবলে দিয়ে গেল। বাইরে কিছু আলো থাকলেও ভিতরে অন্ধকার হয়ে এসেছিল। ভাস্বতী উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু তার পরনের ধুতিখানা অতনুর—তার নিজের শাড়ীখানা শুকোতে দেওয়া হয়েছে। এ ধুতি পরে অন্তত বাড়ী ফেরা চলবে না। তা হ'লে যমুনার হাত থেকে সে নিস্তার পাবে না।

অতনু বললে, কথাটা থেমে গেল কিন্তু। বিয়ে করে আমি ঘর-সংসারী হলে তুমি কি নিশ্চিন্ত হতে?

ভাস্বতী মুখ ফিরিয়ে বললে, হয়ত হতুম! কিন্তু আমার মনের অস্বস্তি তুমি তো কোনোদিন বুঝতে চাওনি, ডাক্তার।

তোমার অস্বস্তি? একথা কি কখনো প্রকাশ করেছ?

ভাস্বতী বড় বড় চোখে তাকালো। বললে, তোমার সমস্ত জীবনের মাঝখানে আমি কি অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়ে নেই?

অতনু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো।—তার মানে?

সবাই জানে, অতনু। তোমার সব থাকতেও তোমার শূন্য ঘর। তোমার এই শূন্যতার জন্যে আমাকে দায়ী করে রেখেছে সবাই। তুমি সরে যেতে পারতে, আমিই নাকি তোমাকে বেঁধে রেখেছি।

কে বললে?—আর্তস্বরে জানতে চাইলো অতনু।

ভাস্বতীর কণ্ঠে ক্ষণকালের জন্য উত্তেজনা এসেছিল, কিন্তু সে নিজেকে দমন করলো। এবার শান্তকণ্ঠে বললে, কই সে-অধিকার আমি ত' নিইনি। দেড় বছরের মেয়ে আমি, তখন বাবা আমাকে এনেছিলেন; তোমার বয়স তখন বোধ হয় ছয়। আজ প্রায় তিরিশ বছর বয়স হ'তে চললো আমার। সেই দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রয়েছি। মন্দ কথা যদি থাকতো এর মধ্যে, মন্দ পথ কি খুঁজে পাওয়া যেতো না? আমাদের চেতনা কি অসাড় ছিল, আমরা

কি জড় পদার্থ ছিলুম? নিজের দেহের উপরে কি ভরাগঙ্গার তটের ঢেউ দেখিনি? তোমার দেহের আগুনের আভা কি আমার চোখে পড়েনি, বলতে চাও? কিন্তু তবু অধিকার আমি নিইনি, জাতিগোত্রহীন পথের মেয়েকে বাবা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেই মেয়েকে কুটুম্বের ঘাড়ে তিনি চাপিয়ে দিতে চাননি।

অতনু বললে, তোমার আমার শেষ কথা কি সেখানেই হয়ে গিয়েছিল, চীনু?

হঠাৎ ভাস্বতী হেসে উঠলো,—তুমি আমার ডাকনাম ধ'রে ডাকলে আজও আমার শরীর কেঁপে ওঠে, মন কেঁদে ওঠে, ডাক্তার! ডাক-নামে ডেকো না!

অতনুর কণ্ঠে ঈষৎ কাঁপন এলো। সে বললে, আমি যদি এই ব'লে নালিশ জানাই যে, তুমি আমাকে এগিয়ে যেতে দাওনি, পিছিয়ে যেতেও বলোনি?

বোধ হয় সেইটিই আমার আসল দুর্বলতা। মেয়ে ব'লেই মোহমুক্তি ঘটাতে পারিনি। জীবনে তুমি কোনো অপরাধ করোনি ব'লেই বোধ হয় আমি পালাতে পারিনি!—ভাস্বতী বললে, সেইখানেই আমার ত্রুটি, সেখানেই আমার মৃত্যু! তুমি যদি কোনোকালে আমার অপমান ঘটাতে, কিংবা নিষ্ঠুর হয়ে আমাকে নীচে নামিয়ে দিতে,—তোমাকে ত্যাগ করা আমার পক্ষে সহজ হোতো। যেদিন তুমি আমার ওপর রাগ ক'রে যুদ্ধে চলে গেলে সেদিন সবচেয়ে আমি তোমার ওপর খুশী হয়েছিলুম। কেন জানো? আমি জানতুম, এবারের যুদ্ধে মানুষের নোংরামি আর অসৎ প্রকৃতি যখন এত উঁচু হয়ে উঠেছে, তখন তুমি এর মধ্যে তলিয়ে যাবে, পাঁকের মধ্যে নেমে তোমার অপমৃত্যু ঘটবে। কিন্তু তুমি আবার ফিরে এলে! নিষ্কলঙ্ক হয়েই ফিরে এলে! তোমার ফিরে আসাই হোলো আমার পক্ষে শাস্তি অতনু! তুমি কোথাও চলে গেলে আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে আমার পথ দেখে নিতুম। তোমার উদারতা আর সৌজন্যই আমার পা দুটোকে বেঁধে রেখেছে।

ভাস্বতীর কণ্ঠস্বরে কোথাও আড়ষ্টতা, কোথাও বাষ্পাচ্ছন্নতা খুঁজে পাওয়া গেল না। সেইজন্যই অতনু চুপ ক'রে গেল। ভাস্বতী উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলো, হরিদা'?

সাড়া এলো,—কেন, দিদি?

আমার কাপড় শুকিয়েছে, ভাই?

ছাদে মেলে দিয়ে এসেছি, শুকোতে দেরি হবে।

নিরুপায় হয়ে ভাস্বতী চায়ের বাসনগুলি সযত্নে একত্র করে গুছিয়ে নিল। অতনু বললে, ওসব কী হচ্ছে? ওতে কোন্ বাহাদুরি? হরি আছে কি করতে?

বাসনগুলি তুলে নিয়ে কলতলায় যাবার আগে একবার ভাস্বতী অতনুর দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালো, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অতনু গলা বাড়িয়ে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে, এই চাইনিটুকুই হোলো মরণ-বাঁচনের অধিকার। এর থেকে মুক্তি নিয়ে পালাতে পারলে আমিও বাঁচতুম।

বাইরের থেকে ভাস্বতীর উল্লসিত হাসির শব্দ শোনা গেল। স্ফটিকের পাত্রগুলি যেন চূর্ণবিচূর্ণ হোলো।

বাসনগুলি একটি একটি করে ধুয়ে একে একে ভাস্বতী গিয়ে ভাঁড়ার ঘরে তুলে রেখে এলো। হরিদাস দাঁড়িয়েই রইলো পিছন দিকে, প্রতিবাদ জানাবার সাহস তার হোলো না। এক সময় ভাস্বতী বললে, কাপড় শুকোতে লাগবে এখনও দু ঘণ্টা, ততক্ষণ আমি কি করবো বলো ত' হরিদা'?

কাজের জন্য যেন তার হাত-পা নিসপিস করছে। হরিদাস রাগ করে বললে, কুটনো-বাটনা, জল তোলা, রান্নাঘর ধোয়া, দাদাবাবুর বিছানা করা—সব রকমের কাজই ত রয়েছে!

ভাস্বতী আবার হেসে উঠলো। বললে, হরিদা', তুমি চটলে চলবে কেন, ভাই? মেয়েরা জন্মায় ঘরের কাজ নিয়ে। তা জানো? কাজ পেলেই তবে তাদের মুখে কথা ফোটে।

হরিদাসের অনেক বয়স হয়েছে। অতনুর বাপের ছোটবেলায় সে এই পরিবারে চাকরি নিয়ে এসেছিল। সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চললো। যাদের হাতে করে সে মানুষ করেছে, তাদের মনের কথার আঁচ সে পায় বৈকি! বিজ্ঞের মতো সে বললে, ঘর থাকলে ঘরের কাজ করতে হয় বৈ কি, দিদি!

কথাটা শুনে ভাস্বতী একবার থমকে দাঁড়ালো। তারপর বললে, এবার তোমার মরবার বয়স হয়েছে হরিদাস—আর তোমার বেঁচে কাজ নেই!

ভাস্বতী খরপদে এসে অন্য ঘরে ঢুকলো। সেটা অতনুর শোবার ঘর। বুড়ো হরিদাস একা হাতে অনেক কাজ করে। সুতরাং তাকে একটু সাহায্য

করা অসংগত নয়। ভাস্বতী ক্ষিপ্রহস্তে ঘরখানা গুছিয়ে বিছানাটা ঝেড়ে-ঝুড়ে সাজিয়ে দশ মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে এলো। কেউ জানতেও পারলো না।

এঘরে এসে ভাস্বতী একখানা চেয়ার টেনে বসলো। তারপর বললে, এই ত চার পাঁচ ঘণ্টা তোমার এখানে কাটলো, কিন্তু কই, একটি রোগীকেও ত আসতে দেখলুম না!

অতনু হাসিমুখে বললে, একটি রোগীকে নিয়েই এতক্ষণ হিমশিম খাচ্ছি, এরপর আবার রোগী?

আমার রোগটা কী?

জটিল রোগ! চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইরে। ঘানিতে ঘুরছে, চোখ দুটো বাঁধা। ভাবছে, বহু রাস্তা পেরিয়ে চলেছি, এবার বোধ হয় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবো। কিন্তু আসলে ঘুরছে অল্প জায়গায়। এই বিশ্বাসটাই অসুখ। এর ওষুধ নেই।

ভাস্বতী বললে, জীবনটা কোনোমতে কাটিয়ে দেওয়া ত চলছে।

অতনু বললে, হ্যাঁ, তা চলছে। অন্তত কাজের চাকার সঙ্গে বাঁধা আছে, খেটে খেতে পাচ্ছে এই সুখ—এই আনন্দ!

তুমি নিশ্চয়ই জানো, ঘানির গরুর বিদ্রোহ করার মানে কি?

অতনু বললে, এও জানি, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জন্তু হোলো মানুষ। কেন না, একমাত্র এই জীবটিরই বুদ্ধিবিচার আছে! জৈব জীবনের বাইরেও এর কল্পনাশক্তি আছে!

ভাস্বতী চুপ করে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বললে, তুমি কি বলতে চাও আমি দড়ি ছিঁড়ে একদিকে ছুটে পালালেই মুক্তি পাবো?

অতনু বললে, নীচের থেকে ওপরে মাথা তোলবার জন্য চেষ্টা না করে অবস্থার কাছে মাথা হেঁট করে থাকা—সেটাই কি খুব ভালো, চীনু?

আমি ত তাকে ভালো বলিনে! কিন্তু পথ কই?

অতনু বললে, দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবার সংগ্রাম, অপমান থেকে উঠে দাঁড়াবার সংগ্রাম,—সেটাকেই কি মনুষ্যত্ব বলে না? দারিদ্র্য তাকেই বলি, যে-বস্তু স্বাধীনতা-লাভের ইচ্ছাকে নষ্ট করে। পথে যে নামে, সে-ই পথ খুঁজে পায়, এ কি তুমি মানো না? একথা কি মানো না, চলতে যে জানে, সেই খুঁজে পায় পথের সংগী? আদর্শ যার সত্য, কর্মধারাও তার নির্ভুল! যুদ্ধ

করবার জন্য যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নেয়, যুদ্ধ চালাবার অস্ত্র সে ঠিকই আবিষ্কার করে! এগুলো কি কেবল কথার কথা? এর ভিতরকার সত্য কি তোমার চোখে পড়ে না?

ভাস্বতীর গলার ভিতরে কিছু একটা জড়িয়ে এসেছিল। ঢোক গিলে সে চুপ করে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বললে, তুমি কি করতে বলো আমাকে?

অতনু বললে, আমার কথার দাম কতটুকু? তখন তুমি বলতে চেয়েছিলে দারিদ্র্যের মধ্যেই মহত্ত্বের অগ্নিপরীক্ষা! কিন্তু দারিদ্র্য যদি মনের পঙ্গুতা আনে? যদি মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে? মানুষকে যদি তার দুর্দশা থেকে উঠতে না দেয়? সেই সর্বনাশের হাত থেকে কি তুমি মুক্তি পাবার চেষ্টা করবে না? সাঁতার যারা জানে না, তাদের সঙ্গে সাঁতার জেনেও ডুবে যাওয়া, তাকে কি বলবে মহৎ আত্মোৎসর্গ?

ভাস্বতী মুখ তুলে বললে, সবাইকে ছেড়ে আমি চলে যাই, এই কথাই কি তুমি বলছ?

না, আমি বলছি, তোমার চারদিকে যারা আছে, তাদের সবাইকে তুমি টেনে তোলবার চেষ্টা করো!

কিন্তু সে-শিক্ষা যে তাদেরো নেই, আমারও নেই! তারা শুয়ে থাকতে জানে, উঠে দাঁড়াতে জানে না।—ভাস্বতী বললে, বোঝার পর বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপাও, ঘাড় তাদের বেঁকে দুমড়ে যাবে, কিন্তু মাথা ঝাড়া দেবে না! অবস্থার কাছে হার মেনে মুখ থুবড়ে তারা নরকের মধ্যেই পড়ে থাকতে জেনেছে, কিন্তু কোনো বলিষ্ঠ ইচ্ছা তাদের নেই। তারা কেবল মৃত্যুর দিন গুণতে জানে! আমি তাদের কেমন করে তুলবো, ডাক্তার? তাদের ছেড়ে চলতে গেলে আমার পায়ে শেকল বাজে, উঠতে গেলে আমার মাথা ঠুকে যায়, ভাঙতে গেলে নিজের কপালটাই ফুটো হয়, ছুটে পালাতে গেলে অনভ্যাসের জন্যে নিজেই হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ি। অতনু, আগে তুমি মুক্তির কথা বলো, পরে বলো মনুষ্যত্বের কথা, তোমার ওই আদর্শের কথা!

অতনু বললে, মুক্তির জন্যে লড়াই করতে হয় চীনু!

ভাস্বতী বললে শোনো অতনু, পালালে মুক্তি হয় না;—বিদ্রোহ করলেই প্রতিকার হয় না। যুদ্ধে গিয়েছিলে তুমি—তুমিও দেখে এসেছ, পৃথিবীসুদ্ধ যুদ্ধ চালালেও সমস্যার মীমাংসা হয় না, হয় কেবল অপচয়!

দুজনে চুপ করে গেল। বাইরে পায়ের শব্দ হোলো। তারপরেই হরিদাস এসে ঢুকলো শাড়ীখানা হাতে নিয়ে। বললে, উনুন পাড়ের ধারে দড়ি টাঙিয়ে শুকোতে দিয়েছিলুম, এবার পরা চলবে, দিদি।

ভাস্বতী লক্ষ্য করে দেখলো, ইতিমধ্যে কাপড়খানা কখন যেন সাবান কাচা করে হরিদাস এর ওপর ইস্তিরি বুলিয়ে দিয়েছে। শাড়ীখানাকে এবার ভদ্র-সমাজের যোগ্য করে তুলেছে।

শাড়ী নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ গলা নামিয়ে পুনরায় সে বললে, কত দুঃখে আমরা ভাইবোনেরা মানুষ হয়েছি, তুমি দেখেছ ত? কী কষ্ট গেছে বাবার সারা জীবন! মাকে কোনোদিন আমরা একটু স্বস্তি দিতে পারিনি। সেদিনও আমাদের চোখের সামনে কোনো আলো ছিল না, আজও কোথাও কোনো আলোর চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছিনে।—নিঃশ্বাস ফেলে ভাস্বতী অন্য ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

একটু রাত হয়েছিল বৈ কি, ভাস্বতীকে পৌঁছে দেওয়াই উচিত। জামাটা বদলে অতনু তৈরী হয়ে নিল। কিন্তু ওই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ভাস্বতী আবার কলতলায় গিয়ে অতনুর ধুতিখানা কেচে বারান্দায় মেলে দিয়ে এলো। কোথাও কোনও ত্রুটি সে রেখে দিয়ে যেতে চায় না।

দুজনে পথে এসে নামলো, কিন্তু তারপরে আর কোনো তর্ক নেই। শরৎ-কালের আমেজ আছে বাইরে। অন্ধকারে উপরে তারাগুলো দপদপ করছিল। পথ বেশী দূর নয়, একটা রাস্তা ঘুরতে পারলেই ওদের গলিটা পড়ে। এদিকটা শহরের শেষাংশ, সেইজন্যই কতকটা নিরিবিলি।

মাঝপথে এসে অতনু বললে, তুমি যে টাকা চেয়েছিলে?

অন্ধকারে মুখ তুলে ভাস্বতী বললে, হ্যাঁ, চেয়েছিলুম। তুমি সঙ্গে আনোনি?

এনেছি।—অতনু টাকা বার করে তার হাতে দিল।

ভাস্বতী বললে, তুমি ত জিজ্ঞেস করলে না, এটাকা নিয়ে আমি কি করবো?

সে-অধিকার আমার নেই!—অতনু আবার জবাব দিল, শুধু এই কথাই জানি, নিজের জন্য দরকার হলে টাকা তুমি হাত পেতে নিতে না।

ভাস্বতী একটু হাসলো। বললে, কোনোদিন নিজের জন্যে যদি টাকা

চাই, সেদিন টাকা দিতে কি তোমার হাত কাঁপবে? সেদিন কি আমি সত্যই তোমার কাছে ছোট হয়ে যাবো?

অতনু হঠাৎ কোনো জবাব দিতে চাইলো না। কিন্তু কয়েক পা গিয়ে সে বললে, এমন ত' হতে পারে, যেদিন আমাকে সত্যিই তোমার দরকার, সেদিন আমাকে হয়ত কোথাও খুঁজে পাবে না!

কি বললে?—ভাস্বতী যেন একটু চমকে উঠলো। পুনরায় বললে, এ সব কথা আলোচনা করাও ভালো নয় অতনু। তুমি আছো চোখের সামনে, তাই নিজের জোরে ঘুরে বেড়াই! তাই সব জিনিসের মানে খুঁজে পাই, সকল দুর্দশার সান্ত্বনা দেখতে পাই। তুমি যেদিন নেই, সেদিনের পৃথিবী কেমন! সেদিনের সূর্যের আলোটার কী চেহারা! অতনু, সেদিন কি প্রলয় নয়?

অতনু বললে, ও কি ছেলেমানুষী হচ্ছে!

বাঁ হাতখানা দিয়ে ভাস্বতী অতনুর একখানা হাত ধরলো। সে-হাত ঠাণ্ডা, যেন সে-হাতে রক্তচলাচল নেই। তারপর বললে, ঠাকুর জানেন, তুমি আমার সমস্ত লোভের বাইরে, সমস্ত আসক্তি থেকে দূরে! এ যদি আমার সত্য হয়, তবে দেখে নিও, ঠাকুর তোমাকে চিরদিন সুস্থ রাখবেন। আমার দেবতা আমারও মুখ রাখবেন, অতনু।

বাড়ী এসে পড়েছে। অতনু আগে-আগে গিয়ে ঢুকলো। অন্ধকারে শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছে পিছনে-পিছনে ভাস্বতীও ভিতরে এলো। প্রথমেই পিসিমার চড়া গলার আওয়াজ তাদের কানে পেঁৗছালো। অতনু দরজার কাছে অগ্রসর হয়ে দেখলো, তরুবালা বসে রয়েছেন ঘরের এক পাশে, তক্তার উপরে মৃগেন্দ্র বসে রয়েছেন এবং ঘরের মাঝখানে বসে হাত-পা নেড়ে কথা বলছেন বুড়ি পিসিমা। আলোটা জ্বলছে টিমটিম ক'রে। ওদিক থেকে ভাইবোনেদের বিশেষ কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। অতনু ঘরের ভিতরে ঢুকে জানলার ধারে গিয়ে ব'সে পড়লো। নবাগতকে দেখে পিসিমা কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

পিসিমা বললেন, তা'হলে এই কথাই তোমরা বলছ যে, আমাকে শুধু হাতেই ফিরে যেতে হবে! গরুটা গাভীন্ অবস্থায় না খেয়ে মরবে আর আমি পাড়ায় পাড়ায় আমানি ভিক্ষে ক'রে বেড়াবো! এই কথাই বলছ তোমরা?

আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নি-উদ্‌গিরণের একটা আশু সম্ভাবনা লক্ষ্য করে সকলেই কাঠ হয়ে উঠেছিল, এমন সময় হঠাৎ আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো যমুনা। বাইরে দাঁড়িয়েই সে বললে, হ্যাঁ, এই কথাই সকলে বলছে। কপালে যদি তোমার তাই লেখা থাকে, ভিক্ষেই করবে। বাবা তোমাকে মাসোহারা দেবে, আর তাই দিয়ে তুমি গরুর জাব মাখবে? কেন, বাবা ত' চোর-দায়ে ধরা পড়েনি!

তরুবালা হেঁকে উঠলেন, তুই চুপ কর যমুনা—

কেন চুপ করবো মা,– দিয়ে সাহায্য করে কেউ? মরতে বসলে কেউ খবর নেয়? আমরা কেউ নই? আমরা কাপড় পাই বছরে কখানা? কী খেয়ে দিন যায় আমাদের? কেউ খোঁজ রাখে? কেউ হাত উপুড় করে? পরগাছার খাওয়া-পরা বাবা টানবে ক'দ্দিন? কেন আমি চুপ করবো মা?

তরুবালা স্তব্ধ, হতবুদ্ধি। মৃগেন্দ্র নতমুখে একেবারে চুপ। মাথাটা তাঁর একেবারে নত হয়ে পড়েছে। অতনু বিস্ময়-বিমূঢ়! এই প্রকার ভাষা প্রকাশের বয়স যে যমুনার হয়েছে, এই প্রথম জ্ঞান হোলো তার।

পিসিমা রক্তমুখে ঘাড় কাঁপাচ্ছেন। এক সময়ে বললেন, পরগাছা তুই কাকে বলিস?

যমুনা হয়ত আরো কোনো নোংরা কথা বলতে পারে, এই মনে করে হঠাৎ ভাস্বতী সামনে এসে বললে, অতনু মাঝখানে বসে পরের ঘরের ঝগড়াগুলো না গিললে তোমার আর চলছে না? তোমাকে ডেকেছে কেউ? কোনো কাজে তুমি লাগবে?—যাও নিজের বাড়ী চ'লে যাও।

অতনু তৎক্ষণাৎ উঠে জুতোটা পায়ে দিয়ে বেরিয়ে চ'লে গেল।

ভাস্বতী পুনরায় বললে, পিসিমা, ছেলেমানুষের কথায় তুমি রাগ করো না। আজকের রাতটা থাকো—কাল সকালে আমি তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবো। টাকাকড়ি নিয়ে তুমি সকালেই চ'লে যেয়ো। যা যমুনা, তুই এখান থেকে। রাগ পড়ে গেলে বুঝবি, গুরুজনদের সামনে গুরুজনকে কথা শোনালে কতখানি মাথা হেঁট হয়!

আগুনের শিখার মতো কাঁপতে কাঁপতে যমুনা অন্যদিকে সরে গেল।

চার

বরুণার কাছে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সুশান্ত একদিন বলেছিল, মামার মোটরখানা প্রায় সকল সময় তা'র জিম্মাতেই থাকে। মামা হ'লেন মোটর-বিলাসী, এবং মোটরের মালিক হ'তে পারলেই তিনি খুশী। মোটরে তাঁর বড় সাধ! মামারা হলেন খাস কলকাতার নিমে তাঁতীর গোষ্ঠী। এককালে পুঁটিবাগানের নিমে তাঁতীদের ডাকে বাঘেগরুতে জল খেতো। তবে কিনা দিদিমা অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন, এবং কোলে-কাঁকালে তিনটি ছেলে-মেয়ে ছিল ব'লেই মন্মথ গড়াইদের বাড়ীতে তাঁকে রান্নাবান্না করতে হোতো। ছেলে দুটো একরকম গড়াইদের ঘরে খেয়েই মানুষ। মেয়েটারও বিয়ে হয়ে গেল।

সেই মামাদের মধ্যে একজনের অবস্থা ফিরেছে এই গত যুদ্ধে। বাল্তি আর লোহা-গালাইয়ের কারখানা ছিল। সেই কারখানায় মামা নিজের হাতে ঃাপর চালিয়েছেন। যেমন অমানুষিক পরিশ্রম, তেমনি অনন্যসাধারণ কর্ম-নিষ্ঠা। লক্ষ্মী সেইজন্যেই দয়া করলেন। মোড়লদের কারখানায় হাঙ্গামা বাধলো, মামা কায়দা ক'রে যুদ্ধের অর্ডারগুলো টেনে নিলেন। কারখানা ফুলে-ফেঁপে উঠলো। আজ দেখে এসো গিয়ে সেই কারখানার কী নাম-ডাক! হিন্দুস্থান ইন্জিনীয়ারিং অ্যান্ড মেশিনারিজ্ লিমিটেড—রেল লাইনের ধারে প্রকান্ড সাইনবোর্ড! আগে ছিল খোলার চালা, এখন করোগেট শেড,—প্রায় আড়াইশো লোক খাটে। কিন্তু মামার কপাল! মামার মাথার ওপর যখন পাখা ঘুরলো, আর কানের কাছে টেলিফোন বাজলো—অমনি মামা কারখানাটা উচ্ছন্নে দিলেন। মোড়লরা পুরনো দলিল দেখিয়ে মামলা ঠুকতে গেল মামার নামে—মামা নাকি কারখানার আসল মালিক নয়,—শুনেছ এমন কথা? মামা ধার্মিক লোক, হাঙ্গামা চান না, সুতরাং তিনি এক ভাটিয়াকে ধ'রে কিছু টাকা নিয়ে কারখানাটা তা'র হাতে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। বাকী জীবন তিনি পুজো-আর্চা, জপতপ নিয়ে থাকবেন। আর বড়মামা? তিনি অবিশ্যি একটু নেশা-টেশা ভালো বাসতেন। কিন্তু ওই যে চোরবাগানের দেবেন চৌধুরী—ওরা না পারে হেন কাজ নেই। একটা মিথ্যে চুরি আর খুনের দায়ে বড়মামাকে ওরা চোদ্দ বছরের জন্যে জেলে পাঠালো। অবিশ্যি আমরা এসব কিছুই

জানতুম না! আর আমার কথা? আমি চিরকাল লেখাপড়া নিয়েই কাটিয়েছি!

বরুণা চুপ ক'রে গল্প শুনে যায়।

কিন্তু ওই যা বলো, মামা একটু দৃষ্টি-কিপ্পুনে! মোটরখানা বসিয়ে রেখে কলকব্জায় মর্চে ধরাবে সেও ভালো, তবু দু' দণ্ড হাওয়া খেতে বেরোবে না। এইভাবেই চলছিল। কিন্তু মামা যে এত ছোটলোক, এ কি আমি আগে জানতুম? ওর গাড়ী বরাবর থাকে আমার জিম্মায়, তাই আমাকে একটা হাতখরচ দিত; আর মামার যখন ছেলেপুলে নেই, তখন ত' আমিই সব! ওমা, হঠাৎ সেদিন আমার ওপর কী আক্রমণ!

আক্রমণ মানে?

এই ধরো না কেন, শারীরিক লাঞ্ছনা! আমি নাকি মোটরের কলকব্জা নষ্ট ক'রে ফেলেছি। সেই যে, মনে নেই, সেই যেদিন তোমাকে নিয়ে হাওয়া খেতে গেলুম তক্তাঘাটের ওদিকে? একটু জোরে চালিয়েছিলুম গাড়ীখানা!

বরুণার মুখখানা একটু রাঙ্গা হোলো। বললে, হ্যাঁ, মনে আছে!

আমাকে বলে কিনা বাড়ী ঢুকলে গলা ধাক্কা দেবো! তুমি কিছু মনে ক'রো না, বরুণা! লোকটা অমনিই! নইলে সহোদর ভাই হয়ে আমার মায়ের অল্পবয়সের সব পুরনো কথা তুলে আমাকে এমন গালমন্দ করে যে, কানে আঙ্গুল দিতে হয়! শেষ পর্যন্ত কিনা আমার হাতখরচের টাকাটাও দিতে রাজি হোলো না?

হাঁটতে হাঁটতে তা'রা অনেক দূর চ'লে এসেছিল। বরুণা এক সময়ে বললে, তা হ'লে এখন কি করবে?

দাঁড়াও না, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, কোনো ভয় নেই।—সুশান্ত বললে, বন্ধুরা শুধু জানে, আমি মোটর-ড্রাইভার। তোমার মেজদাও ত' কত ঠাট্টা করে আমাকে! কিন্তু ওরা কি জানে, আমি কিছুতেই হার মানবার ছেলে নই! আবার আমি ঠিক সব দিক সামলে উঠে দাঁড়াবো। তুমি দেখে নিয়ো, কী জব্দ করি আমি মামাকে! এবারে একেবারে ঘুঘুর ফাঁদ দেখাবো!

তোমার মামার ওখানে সেদিন যে মহিলাটিকে দেখে এলুম, উনি কে?—বরুণা মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করে।

মহিলা!—সুশান্ত মুখের একটা শব্দ ক'রে বললে, আসশ্যাওড়াতলার পেত্নী! ওকে তুমি বলো মহিলা?

কে উনি?

থাক্ বরুণা, বিশেষ কিছু জানতে চেয়ো না। মামা যত মন্দই হোক, আমি কিন্তু তার সম্বন্ধে কিছু রটাতে চাইনে। তবে হ্যাঁ, মামা কিন্তু অধার্মিক নয়! ওঁর জপতপ আহ্নিক দেখলে আমার এখনও গা শিউরে ওঠে!

বরুণার পায়ে ছিল একজোড়া চটি—সুশান্তেরই কেনা। কিন্তু তিন মাস হ'তে না হ'তেই তা'র ফিতে গেছে ছিঁড়ে। ছেঁড়া ফিতে বেধে যাচ্ছে চলতে গিয়ে, তার ওপর এক-পা ধুলো।

তবে কি জানো—সুশান্ত বললে, গেল যুদ্ধে যারা বড় বড় টাকা কামিয়েছে—তা সে যেভাবেই হোক—তারা কিন্তু অনেকে ভালো হয়ে গেছে। এই মামার কথাই ধরো না কেন!

ক্লান্তিতে বরুণার মুখখানা শুকিয়ে গেছে। এক সময় সে বললে, মনে হচ্ছে বেলা প্রায় তিনটে বাজে। তোমার কিন্তু এখনও নাওয়া-খাওয়া হয়নি! কী রোদ আজ!

সুশান্ত বললে, তুমিও ত' সেই সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়েছ, তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

বরুণা একটু হাসবার চেষ্টা করলো। বললে, আমরা গরীবের মেয়ে, আমাদের ওসব গায়ে লাগে না।

তোমরা গরীব!—সুশান্ত হেসে উঠলো, তোমার বাবার অত বড় চাকরি, তোমার দুই দাদা—তোমার ভাবনা কি, বরুণা? চলো, আর এক পেয়ালা চা খাওয়া যাক্।

চা—বরুণা একটু ইতস্তত করলো। তারপর বললে, বেশ ত' চলো!

ওরা এক চায়ের দোকানে এসে উঠলো।

বিশ্বাস করতে চায় না কেউ যে, বরুণার বাবা বড়লোক নন্। বরুণাদের সমস্ত পারিবারিক অবস্থা জেনেও যারা তাদেরকে অবস্থাপন্ন বলে বিশ্বাস করে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধি এখনও হয়নি। কুড়ি বছরের মেয়ের সামনে পঁচিশ বছরের ছেলে এসে দাঁড়ালে বুঝতে পারা যায়, ছেলেটা কী অনভিজ্ঞ! বুঝতে পারে না মেয়েটার বাস্তব হিসাব-বুদ্ধির কাছে সে কতখানি শিশু। আর

সুশান্ত যে শিশুর মতো সরল, একথা শিশুও বোঝে। এই ছ' মাসে বরুণার মনে রংয়ের উপর রংয়ের তুলি বোলানো হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক মেয়েরই মাথা অনেককে ছাড়িয়ে ওঠে। সুশান্ত শুধু যে নিজের পায়ে দাঁড়াবে তাই নয়, বরুণাও দাঁড়াবে আপন স্বকীয়তার ভিত্তিতে। বরুণার স্বাতন্ত্র্য পাওয়া দরকার, কেননা সুশান্তকে জীবনে অনেক কাজ করতে হবে। বড় একটা কাজের আরম্ভে অনেক ভুল ত্রুটি, অনেক পরিশ্রম আর নৈরাশ্য, অনেক-প্রকার বাধা-বিপত্তি,—সেইটিই হোলো সকল কাজের আগে পৌরুষের পরীক্ষা। সেই পরীক্ষার কালটার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে না পারলে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছনো যায় না। এর পরে দেখা যাবে সৌভাগ্যের নিশানা। পথ অনেক দূর, পায়ে ব্যথা হলে চলবে না। জীবনটা অনেক দীর্ঘ, সকল ক্লান্তি সইতে হবে হাসিমুখে। বরুণার মনে রং আছে ব'লেই আশ্বাস আছে; সাহস আছে ব'লেই সান্ত্বনা আছে। মন তার প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছে,—সুশান্তর সাহায্যের দ্বারাই সে কোনো একটা কাজে লিপ্ত হবে। তখন তার কি আর ভাবনা থাকবে কিছু?

প্রথম আলাপের উপলক্ষ্যটা বরুণা কিন্তু আজও ভোলেনি। সুশান্তর হাতে নাকি অনেক চাকরি আছে,—অনেক মেয়েই নাকি সুশান্তর মারফৎ ভাগ্য ফিরিয়েছে। বরুণাকে একটি কাজে বসিয়ে দেওয়া তা'র পক্ষে কী এমন কঠিন! তবে হ্যাঁ, আর্ট এক্‌জিবিশনের কথাটা অবশ্য সত্যি নয়। ওটা সময় মতো বানিয়ে বলা—ওরকম কিছু একটা না বলতে পারলে গুরুজনদের কাছে সহসা ছুটি পাওয়া যায় না। আর্ট এক্‌জিবিশনের কথাটা সুশান্তই তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল, এবং এ মিথ্যা-ভাষণে দ্বিজেনের সায় থাকবে, এটাও ধ'রে নেওয়া হয়েছিল। বরুণা যেদিন গোছা গোছা টাকা এনে সকলের নাকের ওপর ধরবে, তখন দুটো মিছে কথার ইতিহাস নিয়ে কে-ই বা মাথা ঘামাতে যাবে? সুতরাং দ্বিজেন কোনও উচ্চবাচ্য করেনি।

চা খাওয়া শেষ ক'রে দুজনে উঠলো। সুশান্ত হঠাৎ হাতখানা বাড়িয়ে বললে, খুচরা পয়সা আছে? দাও ত' আনা চারেক!

সুশান্তেরই দেওয়া সেদিনের দুটো টাকা; তার অবশিষ্টাংশ থেকে চার আনা বরুণা বের ক'রে দিল। চায়ের দাম ফেলে দিয়ে দুজনে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। বেলা প'ড়ে আসছে। চা খাওয়ার একটা সুবিধে শুকনো গলাকে

ভিজানো যায়। অথচ ক্ষুধারও কিছু উপশম হয়। ওরা সকাল থেকে চা খেয়ে বেড়ালো বা'র পাঁচেক। এর দরকার ছিল বৈ কি। এমন-এমন সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায় যে, স্নানাহারের কথা ভুলতে হয়। এখানে সমস্যা জটিল, কেন না, দু'জনেই বেকার। মেয়ে-ইস্কুলে সুশান্তের জানাশুনো ছিল বৈ কি, কিন্তু বরুণা কী শেখাবে সেখানে? পেটে কি এককলম বিদ্যে আছে? যে-কোনো ভালো আপিসে আজকাল নাকি মেয়েদের চাকরির ছড়াছড়ি, যাকে বলে হরির লুট। কিন্তু কোন্ মুখে বরুণা সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে? আছে কি তা'র কোনো কাজের অভিজ্ঞতা? আরো বহু রকমের কাজ আছে মেয়েদের, কিন্তু সেখানে দরকার কাজ-জানা মেয়ে। শুধু মেয়ে হ'লে এককালে চলতো—যখন মেয়ের দাম ছিল বেশী; একালে মেয়ের সঙ্গে আরো কিছু চাই, কিছু একটা বিদ্যা, কিছু একটা গুণপণা—যেটা অর্থনৈতিক জীবনে কাজে লাগে। সেইজন্য এযুগের মেয়েরা কাঁকন ছেড়ে কলম ধরেছে; চুড়ি ছেড়ে ঘড়ি পরেছে। এবারে ওরা চুল কেটে ভুল শোধরাবে; শাড়ীর বদলে চুড়িদার! আর একটা পথ আছে মেয়েদের—সে-পথ আবহমানকাল থেকেই আছে—সেখানে দেহ-সৌন্দর্যের বাইরে আর কোনো গুণপণারই প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু মেয়েমানুষ অনেক দুঃখের পর জেনেছে, সে-পথে অনেক বিপদ। কেন না, রূপ স্থায়ী নয়, এবং বয়সটাও দাঁড়িয়ে থাকে না। তারপরে প'ড়ে থাকে বাকী জীবনের অনিশ্চয়তা। অনিশ্চয়তাটা মেয়েমানুষের দু' চোখের বিষ। বরুণা বোঝে, তাই সে এখন থেকেই দাঁড়াতে চায়। ভাস্বতীর জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে, যমুনা ব্যর্থ হতে বসেছে, মায়ের জীবনটা মরুভূমি,—সুতরাং নিজের ভবিষ্যৎ অঙ্কটাও সে কষতে শিখেছে।

অবেলার পড়ন্ত রোদ বাঁচিয়ে দু'জনে পথের এক পাশ দিয়ে আবার চললো। কপালে আঠা-আঠা ধুলোজড়ানো ঘাম, পায়ে এক-পা ধুলো, ভ্যানিটি ব্যাগটা সারাদিন হাতে ঝুলিয়ে রাখা অস্বস্তিকর, শাড়ীখানা সারাদিনের ধুলোয় রগ্ড়ানো, জামাটা তথৈবচ। এর পরে সন্ধ্যা হবে। বরুণা জানে, সন্ধ্যা মানে কী! ছ' মাস ধ'রে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যা হয়ে আসছে তাদের দুজনের চোখের ওপর দিয়ে। সন্ধ্যায় কোনও পার্কে গিয়ে বসা জন্তুর মতো ক্লান্ত হয়ে। সুশান্ত অনর্গল কথা বলে, আর বরুণা ব'সে ব'সে হাঁপাতে থাকে। হাঁপাতে সে বাধ্য। পথে এক ঘণ্টা ঘুরলেই পেটের ভাত হজম হয়ে যায়। আর ভাত

মানে, সেই রাঙগা আলুসিদ্ধ ভাত। বড় জোর ডাল ভাত আর বেগুন পোড়া! কতক্ষণ থাকে পেটে? কতক্ষণ থাকে মনে? সুতরাং সারাদিনের অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে বরুণা ব'সে থাকে। পাশে ব'সে সুশান্ত অনর্গল ভাষায় ভবিষ্যতের জাল বুনে যায়।

বরুণাও জাল বুনেছে! শহরে সে চাকরি করবে, আনবে প্রচুর টাকা, দুঃখী-গরীব মা-বাবার মুখে হাসি টেনে আনবে, তারপরে নিজের সাজসজ্জা, নিজের সমস্ত চাপা ইচ্ছাগুলির পরিপূর্তি। কাজ করবে শহরে, থাকবে শহরতলীর কোনও নিরিবিলি পল্লীতে। বাড়ীর কোলে ছোট্ট একটি ফুলবাগান, মাঝখানে একটি জলের ফোয়ারা। সুন্দর একটি ছোট্ট বাড়ী, কোথাও বুকচাপা নয়,—প্রচুর সূর্যের আলো, অবারিত মিষ্ট হাওয়া, পর্যাপ্ত-পরিমাণ আহার্য সামগ্রী! সারাদিনের খাটুনির পর একজন এলো সুন্দর মোটর গাড়ীটি নিয়ে। চললো তারা সেখান থেকে অনেক দূরে, সমস্ত লোকালয়ের বাইরে জনবিরল নদীর ধারে,—যেখানে আছে জ্যোৎস্না আর নদীর জোয়ার, সমস্ত আকাশভরা কবিতা! কিন্তু সে-ব্যক্তি কে, সেকথা এখন থাক্। বসন্তসমীরণ নিশ্বাস রুদ্ধ করে শুনবে তাদের সেই মৃদু কাকলী,—সেই কাকলীর প্রকৃত ভাষাটা কি, সে কথাও এখন গুপ্ত থাক্। কৌমার্যের মধুর সঙ্কোচ যেন বরুণার দুই চোখের পল্লবগুলিকে জড়িয়ে ধরে, দেখতে দেখতে নম্র লজ্জায় তার মাথা নত হয়ে আসে। সুশান্ত তার দিকে কেমন যেন অদ্ভুত রহস্যভরা চোখে তাকায়। কথা ফুরিয়ে যায় দুজনের।

সুশান্ত এক সময়ে বলে, বরুণা, গান জানো?

বরুণার বলতে ইচ্ছা করে, গান সে জানে, কিন্তু সে চাতকের গান। আকাশ শিউরে ওঠে সেই চাতকের গানে, কিন্তু সে কি অনন্ত পিপাসার আর্তস্বর নয়? আস্তে আস্তে সে বলে, কই না, গান ত' আমি শিখিনি।

সে কি, গানও শেখোনি? তবে লোকসমাজের মাঝখানে কেমন করে গিয়ে দাঁড়াবে?

বরুণা জবাব দেয়, কোনো গুণ আমার নেই! তুমি আছো বলেই ত' আমার কোনো ভয় নেই!

সুশান্ত একটু পুলকিত হয়ে বলে, সে নিশ্চয়ই! আমি একাই একশো। তুমি একটুও ভয় পেয়ো না, বরুণা।

বরুণা এক সময়ে বলে, আচ্ছা, আমাদের কাজের সুবিধে আর কতদিনে হবে বলো ত? ধরো, আমার কিছু একটা হতে যদি দেরি হয়, তোমার তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা হওয়া চাই ত?

হালকা হেসে সুশান্ত বলে, আমার ব্যবস্থা, সে ত' হাতের পাঁচ! করলেই হলো! কতক্ষণ লাগে? ও তুমি কিচ্ছু ভেবো না, বরুণা। দাঁড়াওনা, আগে মামার ব্যাপারটার একটা সুরাহা করি! তারপরে সব দেখতেই পাবে! আমার বিলেত যাওয়া আটকায় কে? কিন্তু এও বলে রেখে দিচ্ছি বরুণা, তোমার দায়িত্ব অনেক বেড়ে যাবে। হয়ত বা তোমাকে বিলেতেও পাড়ি দিতে হবে!

বিলেত! বরুণা সর্বাঙ্গে যেন একটা শিহরণ অনুভব করে। সে কোথায়? কতদূরে সে-দেশ! তার অবারিত স্বাচ্ছন্দ্য কি এদেশ থেকে সে-দেশ পর্যন্ত প্রসারিত হবে? বরুণা চুপ করে যায়। আনন্দে তার মন কাঁপে, উল্লাসে যেন সাত সমুদ্র আর তেরো নদী উদ্দাম উতরোলে মেতে ওঠে! কোনো একটা অভিব্যক্তি দিতে গিয়েও তার মুখ দিয়ে কথা ফোটে না।

সন্ধ্যা রাত্রি ঘন হয়ে ওঠে তাদের চোখের সামনে। কিন্তু চোখের সামনে বরুণা যা দেখছে, সেটা মিথ্যে! নোংরা এক বস্তির মধ্যে খোলার খুপরি তার বাবা সম্প্রতি ভাড়া নিয়েছেন, আঠারো টাকা তার ভাড়া। বাবার পেন্সন হয়েছে কেঁদে-কেটে আটষট্টি টাকা ক'আনা। দুখানা ঘর, সামনে দাওয়া, রান্নার জায়গা ওরই পাশে। নর্দমাটা সর্বসাধারণের, কুয়াতলাটা সর্বজনীন। সামনের ঘরে এক বিড়িওয়ালা থাকে তার মেয়েছেলে নিয়ে। ওপাশে থাকে কয়েকজন বোষ্টম, ভোর রাত্রে তারা গান গাইতে বেরোয়। এপাশে মুদির দোকানের এক সহকারী ঘর নিয়ে আছে—বর্ধমানের এক গ্রাম থেকে কয়েকদিন আগে একটি মেয়েকে সে ধরে এনেছে। নর্দমার গা বেয়ে গলিপথ, তারই দুপাশের কয়েকটি ঘরে থাকে কয়েকজন ঝি—তারা সকাল বিকেল ঠিকে কাজ করতে যায় গৃহস্থ-পল্লীতে। সন্ধ্যার পরে তারা বেশ ফিটফাট হয়ে গায়ে হাওয়া লাগায়। নেশাখোরেরা এই গলিতে ঢুকলে তারা হাসাহাসি করে। গলিটি দিনে ছায়াচ্ছন্ন, রাত্রে অন্ধকার।

এ মিথ্যে! মা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, সে এখনও ফেরেনি! এ দৃশ্যটা অবাস্তব! বাবা তাঁর সমস্ত বিড়ম্বিত জীবনের প্রতিক্রিয়ার বোঝা নিয়ে ওই খোলার ঘরের মেটে মেঝের উপরে মুখ থুবড়ে আছেন, সেও মিথ্যে! কষ্টের

ঘরকন্না, শোচনীয় দারিদ্র্য, মৃত্যুর মতো আবহাওয়া, আশা-আশ্বাসশূন্য অন্ধকার ভবিষ্যৎ, গ্লানিনৈরাশ্য বিষ-নিশ্বাসে ভরা প্রতিটি মুহূর্ত,—এগুলোও সত্য নয়, বাস্তব নয়। এরা ছায়া, এরা স্বপ্ন, এরা মায়া! সত্য হোলো,—সে যা হয়ে উঠবে! ঐশ্বর্যশালিনী সে, সর্বালঙ্কারভূষিতা, দুই চোখ আনন্দে উচ্ছলিত, দশ দিক মাধুর্যে আন্দোলিত। প্রাসাদ-কাননে অজস্র গোলাপ প্রস্ফুটিত, জ্যোৎস্নালোকে সুদূর আকাশে নৃত্যরতা অপ্সরার দল, সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে সে শয়ান, প্রিয়বাহুডোরে সে বন্দিনী! সেইটি সত্য, সেইটি নির্ভুল—কেন না, তার আঙ্কিক পরিণতিকে সে সুস্পষ্ট চক্ষে নিরীক্ষণ করতে পারে। এই সত্যের মধ্যে অলীকতার কোনো দাগ নেই! কল্পনাটা সত্য, বাস্তবটা একেবারে মিথ্যে!

বরুণা খুশী হয়ে এবার উঠে দাঁড়ালো। বললে, এবারে চলো।

সুশান্ত বসেই রইলো। ডাকলো, বরুণা?

কেন?

আমার সেদিনকার কথাটার কোনো জবাব দিলে না? আমি শুনবো বলে রোজ অপেক্ষা করে থাকি!

আচ্ছা, জবাব দেবো, ঠিক দেবো। কিন্তু তাড়াতাড়ি ত' আর নেই। মনের কথা যখন জানো তখন আর মুখের কথা শুনে কি হবে?

সুশান্ত বললে, তুমি কিন্তু রোজ ফাঁকি দিয়ে পালাও!

বরুণা বললে, বারে, কই ফাঁকি দিলুম? সারাদিনই ত' দুজনে এক সঙ্গে থাকি!

সুশান্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আগে বলো তুমি আমার কথা শুনবে?

খিলখিল করে বরুণা হাসলো। বললে, বেশ যা হোক, তোমার কথা ত' সারাদিন শুনছি, তাতে হয় না? আচ্ছা, এবার থেকে শুনবো, খুব শুনবো—হোলো ত? চলো এবার!

কাল আমাদের কখন্ দেখা হবে?

বলো কখন?

বেলা ঠিক চারটের সময় এসপ্লানেডের গুমটিতে।—সুশান্ত ওকে শুনিয়ে রাখলো।

চলো।

ওরা দুজন ঘণ্টা দুয়েকের পর পার্ক থেকে বেরিয়ে চললো যার যেদিকে বাসা। বরুণা আজকাল বেশ একা একা আনাগোনা করে। অন্তত এটুকু যে তার উন্নতি হয়েছে—এ মানতেই হবে।

দুজন গেল দুদিকে,—ছাড়াছাড়ি হোলো আজকের মতন। যেন একই আত্মা, দুই তার প্রকাশ। সুশান্ত ফিরে তাকালো না, কিন্তু অনেকটা পথ গিয়ে বরুণা পিছন ফিরে থমকে দাঁড়ালো। সুশান্ত তখন চলে গেছে অনেক দূরে। কী যেন কথা ছিল তার সঙ্গে! হয়ত টাকার কথাই। তরুবালার হাতে আজ পাঁচটা টাকা দেবার কথা ছিল। যাকগে!

পিসিমা গল্প করে গেছেন, মদন চক্কোত্তির ছিল এগারোখানা তালুক। মালখানায় পাঁচ পুরুষের দরুণ লাখো টাকার গয়না, সাচ্চা জরির তাজ, নবাবী আমলের শিরোপা, ময়ূরপঙ্ক্ষী পালকি, মখমলের সাজসজ্জা আর আশাসোঁটা! মদন চক্কোত্তির ঠাকুরদাদার আমলেই উল্টোডাঙ্গার মাঠে অশ্বত্থের তলায় সাত হাত মাটির নীচে ছিল কষ্টিপাথরের অষ্টভুজা মহাকালী—সেই কালীকে যখন তোলা হোলো, তখন সেকালের নবাব শা নিজে এসে তার সামনে কুর্ণিশ করেন। চারদিকে রৈ রৈ পড়ে গিয়েছিল। এখন সেখান দিয়ে বয়ে গেছে মরা সরস্বতীর সোঁতা। বর্ষায় বনবাদাড় পেরিয়ে সেখানে হাঁটুখানেক জল এখনও আসে।

মদন চক্কোত্তির আমলে ভয়ানক পাপ ঢুকেছিল বংশে। মনোহর চক্কোত্তির আমল আসতেই মামলা বেধে উঠলো, সে আজ আশী বছর আগের কথা। মনোহর চক্কোত্তি তখন নাবালক। সে-মামলা আর মিটলো না। মামার বাড়ীতে গিয়ে তাকে আশ্রয় নিতে হোলো। সেই থেকেই সব বেহাত। বুড়ো বয়সে বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করলেন। আমরা দুজন তাঁরই ছেলে-মেয়ে। মৃগেন আমার ছোট।

ঘরটি খুব ছোট নয়। কিন্তু এই ঘরেই মৃগেন্দ্রমোহনের বিশ্রাম। ঘরের বাইরে জঞ্জালের ঢিবি জমে উঠেছে অনেককাল, তার পাশে নোংরা জল জমে রয়েছে, কয়েকদিন আগের বৃষ্টিতে তার দুর্গতি আরো বেড়েছে। ঘরের সামনে মেটে দাওয়া, কিন্তু তার বাইরে পা বাড়াবার উপায় নেই। অন্যান্য গৃহস্থেরা রয়েছে পাশাপাশি। এক গৃহস্থের উনুনের ধোঁয়ায় অন্য গৃহস্থের ঘর ভরে যায়। এক ঘরে পচা মাছের রান্না হয়, কিংবা নোনা ইলিশের ঝাল,—

অন্য ঘরে গিয়ে ঢোকে তার দুর্গন্ধ। ভাস্বতীকে সব সময়ে নাকে কাপড় দিয়ে থাকতে হয়।

ছেঁড়া কাপড়ের দাম অনেক, কলাইয়ের বাটির দাম বোধ হয় তার চেয়েও বেশী। দাওয়ায় কোনো জিনিস ফেলে রেখে ঘরের দরজা বন্ধ করার উপায় নেই। এর মধ্যে অনেকগুলো সামগ্রী হাত-সাফাই হয়ে গেছে। চুরি লেগেই আছে বস্তিতে।

যমুনা একদিন চেঁচিয়ে বলতে গিয়েছিল; সামনের ঘর থেকে বিড়িওয়ালার মেয়েছেলেটা তেড়ে এলো—খোঁটা দিয়ে কথা বলো না, লাখ কথা শুনবে ব'লে রাখছি! পাঁচ ঘর নিয়ে বস্তি. একজনের অত দপদপা কেন গা?

যমুনা গলা বাড়িয়ে বলতে গেল, তুমি কেন ছুটে এলে কোমর বেঁধে?

আসবো না? ভাল মানুষের মেয়ে হয়ে অসৈরণ সইবো কেন?

কত ভালো মানুষের মেয়ে, সেত' দেখতেই পাচ্ছি!

মেয়েছেলেটা এবার চেঁচিয়ে উঠলো, বাপ তুলে কথা কইলে কিন্তু ভালো হবে না! তোর বাপ খুব ভদ্দল্লোক! শুকিয়ে ত থাকিস, এত তেজ কিসের লা? আমার মন্দর দোকান থেকে ত' পোস্ত মুসুরি ধার ক'রে পেট ভরাস,—আবার লম্বা লম্বা কথা! বিষ ঝেড়ে দিতে পারি, তা জানিস?

এ ধরণের ঝগড়া চালিয়ে যাওয়া যমুনার মত খরমেজাজী মেয়ের পক্ষেও সম্ভব নয়। তরুবালা পিছন দিক থেকে এসে যমুনাকে টেনে নিয়ে গেলেন। অপমানবোধে যমুনা ঠকঠক ক'রে কাঁপছিল। কিন্তু ওঘর থেকে সেই ভাল মানুষের মেয়েটা গুমরে গুমরে বিবাদটা চালিয়ে গেল ঝাড়া দু'ঘণ্টা। ওধার থেকে দুজন ঠিকে-ঝি এঘরের দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করছিল। এরা নাকি কোথাকার বনেদী ভদ্র গৃহস্থ, এটা ওদের পক্ষে কৌতুক।

কুয়াতলার এক পাশে গিয়ে ভাস্বতী বাসন মাজতে বসেছিল, এমন সময় দীপেন এসে হাজির। বললে, আজ তিন দিন থেকে ঘুরছি তোমার পিছনে একটা টাকার জন্যে। ভেতরে ভেতরে বেশ মোটামুটি জমিয়েছ, একটা টাকা ছাড়ো দিকি?

মুখ ফিরিয়ে ভাস্বতী হাসলো। বললে, গাছ পুঁতেছি, দাঁড়া, আগে টাকা ফলুক!

দীপেন বললে, চালাকি ক'রো না, বড়দি। বাড়ীসুদ্ধ সবাই জানে, তোমার

একটা লুকোনো তপিল আছে! সেখানে কেবল নিজের জন্যেই পুঁজি ক'রে যাচ্ছ। তা'র থেকে বে'র ক'রে দাও।

কথাটা অত্যন্ত অস্বস্তিজনক হলেও ভাস্বতী আবার হাসলো। বললো, মাঝরাত্তিরে চোরের মতন লুকিয়ে তুই আর দ্বিজেন কতদিন সব ওলোটপালট করেছিস, আমার তপিল খুঁজে পেয়েছিস?

চোরের মতন খুঁজেছি, তুমি কেমন ক'রে জানলে?

ভাস্বতী বললে, বেড়ালের পায়ের শব্দেও আমার ঘুম ভেঙেগ যায়, তা জানিস?

দীপেন বললে; ও, তাহ'লে যা সন্দেহ করি তাই, কেমন? দ্বিজু বিশ্বাস করেনি, আমি কিন্তু জানতুম। রাত জেগে তুমি নিজের টাকার ওপর পাহারা দাও, আর এদিকে আমাদের কা'রো ভাত-কাপড় চলে না! এখন বুঝতে পাচ্ছি, আমাদের টাকা থেকেই তুমি পিসিমাকে দু'হাত তু'লে দিয়েছিলে! তুমি যে ভেতরে-ভেতরে আমাদের সবাইকে নিংড়ে নিজের ভবিষ্যৎ গোছাচ্ছ, বাবা বোধ হয় একথা আজও বিশ্বাস করেন না?

ভাস্বতী থালা ক'খানা ধুয়ে একপাশে রেখে বললে, তোর কথায় হাসবো, কাঁদবো, না রাগ করবো দীপু?

হাসবে বৈ কি—দীপেন বললে, ভেতরের পাপ হাসি দিয়ে তোমরাই ত' ঢাকতে জানো! বড়দি, রাগে আগুন হয় কা'রা জানো? ভেতরে যাদের মিথ্যে নেই?

এমন সময় মৃগেন্দ্র বেরিয়ে এলেন। দীপেন একটু জড়োসড়ো হোলো। ছ'মাস আগে যারা মৃগেন্দ্রকে দেখেছে, তাদের চোখে আজকের মৃগেন্দ্র অনেক বেশী জরাজীর্ণ, অনেক বেশী বৃদ্ধ। চোখের ঘোলাটে চশমাখানা সরিয়ে তিনি দীপেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, যে-মানুষ একটি প্রতিবাদও করেনা, তা'কে আঘাত করা ভারি সুবিধে, না রে?

দীপেন দমবার ছেলে নয়। মুখ তুলে বললে, তুমি কতটুকু জানো বাবা, বড়দিকে?

আমি?—মৃগেন্দ্র বললেন, তুই জন্মাবার অন্তত বছর পাঁচেক আগে থেকে? তখন তোর মায়েরও বিয়ে হয়নি!

তুমি কি বলতে চাও, বড়দি লুকিয়ে টাকা জমায় না?

বজ্রকণ্ঠে মৃগেন্দ্র বললেন, জানিনে! যদি এতকাল পরে ওর সেই লোভ হয়ে থাকে, তবে সেই লোভের জন্ম হয়েছে তোদের নোংরামির থেকে! তোরা এ যুগের কাপুরুষ! তোরা লক্ষ্মীর হাঁড়ির থেকে তার পুঁজিপাটা ছিনিয়ে নিয়ে যাস, সমস্ত সংসারের আনন্দকে হরণ করিস, তোরা—

বাবা!—হাত ধুয়ে ভাস্বতী ছুটে এলো। বললে, বাবা, এখানে নানান্ লোক আছে, তুমি ঘরে যাও। ওরা ছেলেমানুষ, ওদের এখনও জ্ঞান হয়নি! তুমি চেঁচিয়ে কথা বললে বড় লজ্জা হবে আমার, বাবা। ঘরে চলো—

মৃগেন্দ্র ঘরে এসে আবার বসলেন। ভাস্বতী তাঁর মাথার পাশের ছোট্ট জানলাটি খুলে দিল। তারপর হাসিমুখে বললে, ওদের মনে একটা কথা পেয়ে-বসেছে, আমি নাকি পরের ঘরের মেয়ে! আমার চোখ নাকি বাইরের দিকে! তুমি দেখো বাবা, ওদের জ্ঞান হ'লে নিজেদের ভুল ওরা ঠিকই বুঝতে পারবে! ওদের ওপর আমার একটুও রাগ হয় না। তুমি ওদের কিছু বলতে যেয়োনা।

মৃগেন্দ্র অনেকটা শান্ত হয়েছিলেন। এবার বললেন, শুধু দারিদ্র্য আর অশিক্ষা নয়, চীনু—সাত পুরুষে আমরা মানুষ হ'তেও শিখিনি! আমার নিজেরও জানা ছিল না, মানুষ হওয়া কাকে বলে! এসব সেই পাপেরই ফল!

বাইরে মিনিট খানেক দীপেন চুপ ক'রে ছিল, এবার সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বললে, তুমি বড়দিই হও, আর যেই হও, আমি কাকেও পরোয়া করিনে! তোমার ওই অতনু এসে এতকাল ধরে আমাদের ঘরকন্নায় দালালি ক'রে গেছে, তাই আজ আমাদের এই দুর্দশা! তাকে তাড়িয়েছি, এবার তোমাকেও দেখে নেবো!

মৃগেন্দ্রর বালিশের তলা থেকে ভাস্বতী একটা টাকা বের ক'রে নিয়ে বাইরে এলো। তারপর হাসিমুখে বললে, আচ্ছা শোন, একটা টাকা পেলেই তোর রাগ কমবে?

দীপেন বললে, এবার বুঝি ভয়ে-ভয়ে মন ভোলাতে এলে?

ভাস্বতী খুব হেসে উঠলো। বললে, ওকি কথার ছিরি তোর? এই নে, যা—নিয়ে যা—এই ব'লে টাকাটা রেখে দিয়ে সে অন্যত্র চ'লে গেল।

ওঘর থেকে যমুনা বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো। বললে, দাদা, দেখলে ত? এবার সব বুঝলে?

দীপেন টাকাটা তুলে নিল। বললে, খুব বুঝলুম। সরষে টিপলেই তেল বেরোয়।

যমুনা বললে, আমরা কেউ না। আমরা হলুম বাবার দু'চোখের বিষ। বাবার চোখ আর খুলবে না!

তরুবালা আসছিলেন কুয়াতলায়। গলা বাড়িয়ে তিনি বললেন, ভাস্বতীর ত' আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! ভাই-বোনেদের সঙ্গে দুবেলা দাঁত-কচকচি। সেই ত' দিলি বাপু, দু'দণ্ড আগে টাকাটা বে'র ক'রে দিলেই পারতিস? ওরা কি আর সাধে সন্দেহ করে! ওদের আর দোষ কি!

দীপেন একগাল হাসলো। হেসে চ'লে যাবার আগে হাল্‌কা চালে ব'লে গেল, চোখ মেলে তোমরাই চেয়ে দেখো, এক গাছের ছাল আর এক গাছে জোড়া লাগে না!—বলতে বলতে সে বেরিয়ে গেল।

বাসন মাজার নোংরাগুলো এবার দুই হাতে তুলে নিয়ে ভাস্বতী পিছন দিককার পগারের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় পিছন থেকে যমুনা বললে, দাদাই ঠিক জানে, কেমন ক'রে বাঁকা আঙুলে ঘি তুলতে হয়। দাদা মানুষ চেনে!

ভাস্বতী ফিরে দাঁড়িয়ে হেসে বললে, তুই ত খুব কথা বলতে শিখেছিস, যমুনা?

শিখলুম আর কোত্থেকে! তুমিই সব শিখিয়েছ?

পগারের দিকে নোংরা ফেলতে গিয়ে ভাস্বতী দেখলো পাশ কাটিয়ে চোরের মতন শীলু এসে ভিতরে ঢুকছে। ভাস্বতী বললে, ছি ছি, এদিকে নোংরা... এদিক দিয়ে ঢুকছিস কেন?

শীলু বললে, সরো বড়মাসি—আমার দরকার ছিল!

কী দরকার তোর! সামনের দিকে রাস্তা নেই!

তরুবালা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। বললেন, আয় শীলু, আমি তোর পা ধোয়ার জল দিচ্ছি!

শীলু নোংরা ডিঙিয়ে চ'লে যাচ্ছিল, ভাস্বতী জিজ্ঞেস করলো, হাতের মুঠোয় তোর কী রে, শীলু?

উচ্চকণ্ঠে তরুবালা বললেন, তুই যা করছিস তাই কর না, চীনু! তোর চোখ আজকাল বড্ড ঘোরে!

শীলুকে নিয়ে তরুবালা অনেকটা যেন গা-ঢাকা দিলেন। পিছন থেকে ভাস্বতী অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। তরুবালা তাঁর আচরণ আর ভঙ্গীর দ্বারা নিজেই যেন জানিয়ে গেলেন, শীলুর এই লুকোচুরির ভিতরে কিছু একটা চাপা রহস্য রয়েছে। তিনিই ভাস্বতীর মনে সন্দেহ ধরিয়ে দিলেন। শীলুর চোখমুখের উত্তেজনাটা লক্ষ্য করার মতো।

অতনু একদিন বলেছিল, মৃত্যুই বলো আর অকালমৃত্যুই বলো—কোনোটাই শোকাবহ নয়, কিন্তু জীবনের মধ্যে যে-মৃত্যু ঘটে প্রতিদিন, সেই মৃত্যু ভয়াবহ। সেই মৃত্যু কেবল ব্যক্তিবিশেষকে নষ্ট করে না, তা'র পারিপার্শ্বিক সমস্ত হাওয়াকে দূষিত ক'রে সবাইকে নিয়ে সে ধ্বংসের দিকে ছোটে। মনুষ্যত্বের প্রকাশ হোলো প্রতিপদে অপমৃত্যুর হাত থেকে কল্যাণকে বাঁচানো, অশুচিতা থেকে রক্ষা করা, ক্লেদ আর কালিমার হাত থেকে জীবনকে প্রতি মুহূর্তে উত্তীর্ণ করা। এর চেয়ে বড় কাজ আর মানুষের নেই।

স্নান সেরে আধ-ভেজা শাড়ীখানা কোনোমতে গায়ে জড়িয়ে ভাস্বতী মৃগেন্দ্রর কাছে এলো। ওদিককার খুপরির মধ্যে কোনো এক কীর্তনীয়ার বাংলা খবরের কাগজ পড়ার শখ আছে—সেই কাগজখানা দুপুরের দিকে ভাস্বতী মৃগেন্দ্রর জন্য চেয়ে আনে, আবার সন্ধ্যার আগে নিজেই গিয়ে পৌঁছে দেয়। মৃগেন্দ্র সেই কাগজখানা পড়ছিলেন। ভাস্বতী এসে সামনে বসতেই তিনি একবার মুখ তুলে বললেন, তুমি কিছু জানো মা?

কি বাবা?

দ্বিজেন কেনই বা রাগারাগি করছে, কেনই বা যখন তখন বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে—বলতে পারো?

ভাস্বতী বললে, ওর বিশেষ দোষ নেই, বাবা। এবাড়ীতে জায়গা কম, সেইজন্যই ওর অসুবিধে। ও একটুখানি হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে চায়। মা'র সঙ্গে এই নিয়ে বচসা, তাই মাঝে মাঝে দ্বিজু রাগ ক'রে বেরিয়ে চ'লে যায়।

মাঝে মাঝে রাত কাটায় কোথায়?

ওর এক বন্ধু আছে কোন্ হোটেলের ম্যানেজার,—তার ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকে।—ভাস্বতী বললে, এ পাড়াটা খুব ভালো নয়, বাবা! যদি কেউ এর বাইরে গিয়ে থাকে সে ভালোই।

মৃগেন্দ্র বললেন, আঠারো টাকায় এর চেয়ে ভালো পল্লী আজকাল হয় না, মা।

ভাস্বতী বললে, চলো না বাবা, আমরা সবাই মিলে আমাদের সেই দেশে চ'লে যাই? খরচপত্র কিছু কমবে!

মৃগেন্দ্র জবাব দিলেন, দেশও আছে, দেশের সেই পুরনো মাটিও আছে, কেবল আমাদেরই থাকার কোনো ঠাঁই নেই!

এমন সময় তরুবালা কিছু একটা সন্দেহক্রমে এঘরে এসে ঢুকে কান খাড়া ক'রে এটা ওটা নাড়তে লাগলেন। সেই দিকে একবার তাকিয়ে ভাস্বতী বললে, তুমি গিয়ে তোমার দাবী যদি সেখানে জানাও?

মৃগেন্দ্র হাসলেন। পরে বললেন, আজ থেকে প্রায় আশী বছর আগে তোমার ঠাকুরদাদা নাকি সেই দাবী জানাতে গিয়ে লেঠেলদের হাতে পড়েছিলেন! সেই ঘটনার প্রায় আঠারো বছর পরে আমি জন্মেছিলুম।

এবার ভাস্বতীও না হেসে থাকতে পারলো না। কিন্তু দেখতে দেখতে তা'র নিজেরই মুখখানা গম্ভীর হয়ে এলো। সে বললে, বাবা, একটা কথা বললে তুমি রাগ করবে জানি—আগেও তুমি এ নিয়ে একবার রাগারাগি করেছিলে,—কিন্তু চারদিকে এত অভাব-অনটন না বেড়ে উঠলে আমিও তোমাকে বলতুম না।

মুখ তুলে মৃগেন্দ্র তাকালেন,—কি মা?

তরুবালা ওপাশে মশলার কৌটাটা খুলতে খুলতে উৎকর্ণ হলেন। ভাস্বতী নম্রকণ্ঠে বললে, সব মানুষেরই অসময় আসে, অসময়ে কেউ না কেউ সাহায্যও করে! দুই ভাই যেদিন রোজগার করবে, সেদিন কি আর এত অভাব থাকবে?

ওধার থেকে তরুবালা বললেন, তুই বুঝি সেই আশাতেই ব'সে আছিস, ভাস্বতী?

ভাস্বতী একটু থতিয়ে গেল। মৃগেন্দ্র মুখ তুলে বললেন, তুমি আমি সবাই সেই আশাতে ব'সে আছি, ছোটবৌ।

তরুবালা মেঝের উপরে বসলেন। উত্তেজিতকণ্ঠে বললেন, হাত জোড় ক'রে বলছি, তোমরা ব'সে থেকো না। আমার ছেলেদের ওপর আমার দখল! তা'রা যেদিন আনতে শিখবে, আমি আর সেদিন কারো তক্কা রাখবো না। ওদের নিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায়, আমি চ'লে যাবো।

সেটা কি স্বার্থপরতা হবে না?

হয় হোক, তোমার সংসারে এসে এতকাল ভাত-কাপড়ের জন্যে ঝি-গিরি করেছি,—হাড়মাস-মজ্জা সব বিলিয়ে দিয়েছি।—তরুবালা বললেন, এবারে আর নয়। এবারে আমি মুক্তি নেবো, ওদের আখেরও আমি আর নষ্ট হতে দেবো না।—এই ব'লে তিনি মুখ ফিরিয়ে বসলেন।

পিতা ও কন্যা দুইজনেই চুপ। কিছুক্ষণ পরে ভাস্বতী বললে, কিন্তু ভাইদের রোজগারের আগে ঘরকন্না চলা চাই ত' বাবা! তুমিই বা কেন এক-জনের সাহায্য নেবে না?

বাইরের রোদ্দুরের একটা বাঁকা ছায়া পড়েছে ঘরের মধ্যে। বুঝতে পারা যায় যমুনা এসে দাঁড়িয়েছে আড়ালে। ইদানীং ভাস্বতী ওদের কা'রো বিশ্বাসের পাত্রী নয়।

মৃগেন্দ্র পুনরায় মুখ তুললেন। প্রশ্ন করলেন, তুই কি অতনুর কথা বলছিস, মা?

হ্যাঁ, বাবা!

কিন্তু তা'র সাহায্য ত' এতদিন ধরে' নিয়ে এলুম মা!

ভাস্বতী বললে, একটি কানা কড়ির সাহায্য আজও হাত পেতে তুমি তা'র কাছে নাওনি, বাবা। তোমারই সব টাকা, কিন্তু তা'র হাতে ছিল খরচের ভার, ব্যবস্থার ভার। সে আমাদের ভাত খাইয়েছে রোজ, এমন কি অনেকদিন, নুন দিয়েও ভাত খাইয়েছে। কিন্তু সেই নুন-ভাত তোমারই ছিল, বাবা। আমি বলছি, এবার তুমি সত্যিকার সাহায্য নাও তা'র কাছ থেকে; কেন না, এখন নুন হয়ত যোগাড় করা যায়,—উনুন ধরাবার আর কোনো উপায় নেই!

মৃগেন্দ্র বললেন, টাকা চাইতে বলছিস অতনুর কাছ থেকে?

চাইবার আগেই সে সাহায্য পাঠাবে, বাবা!

শান্তকণ্ঠে মৃগেন্দ্র পুরাতন কথায় চ'লে গেলেন। বললেন, তোমার প্রথম মা—যিনি তোমায় প্রথম তুলে নিয়েছিলেন, তাঁর বোনের ছেলে অতনু। ছ'বছরের ছেলে অতনুকে আমার কাছে রেখে গিয়েছিলেন তার মা,—তিরিশ টাকা তিনি অতনুর মাসিক খরচ দিতেন। পরে ছোটবৌকে ঘরে এনে অতনুকে সরিয়ে দিলুম। কিন্তু সেই টাকা আজও আমার গলার কাছে আটকে আছে, চীনু। সেই যে ছোট হ'তে আরম্ভ করেছি, আজও মাথা তুলতে পারিনি! অতনুর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিলে এবার আমার জীবনের শেষ সম্ভ্রমবোধটুকু

নষ্ট হয়ে যাবে। না খেতে পেয়ে বরং মৃত্যু হোক, কিন্তু সেকালের কুটুম্বের ছেলের কাছে অপমান থেকে মুক্তি পাবো—সেই আমার কাম্য। অতনুর কাছে এ জীবনে আমি আর্থিক সাহায্য নিতে পারবো না, চীনু। নুন-ভাতের ভাতটা যদি তোমরা না জোটাতে পারো, তবে নুন খেয়েই তোমরা মরো একে একে।

মৃগেন্দ্র চুপ ক'রে গেলেন। নতমুখে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ব'সে রইলো ভাস্বতী। স্বামীর এই জিদটি যে আজও বজায় রয়েছে, এজন্য বিরক্ত হয়ে এক সময়ে তরুবালা নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে গেলেন।

স্নিগ্ধকণ্ঠে এক সময়ে ভাস্বতী ডাকলো, বাবা?

মৃগেন্দ্র পুনরায় মুখ তুললেন। ভাস্বতী বললে, মায়ের শরীর আর টিকছে না, আমাদের কি কিছুই করবার নেই?

আমি হৃদয়হীন নই, চীনু!

মায়ের হার্টের ব্যামো তুমি ত' জানো। রোজ সন্ধ্যেবেলা বুক ধড়ফড় করতে থাকে,—একটু নারকেল তেলও জোটাতে পারিনে! রোগের আসল কারণটা কি, এ জেনেও আমাকে মুখ বুজে থাকতে হয়।—বলতে বলতে ভাস্বতীর গলার আওয়াজ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো।

তরুবালা আবার এসে ঘরে ঢুকলেন। ডাকলেন, ভাস্বতী?

কেন, মা?—ভাস্বতী মুখ ফেরালো।

আমার শরীরের কথা বললে কি মরা মানুষ জেগে উঠবে? এসব কথা তুই কেন ওঁর কানে তুলিস? আমার ছেলেরা যখন আনতে শেখেনি, তখন অনেক খোয়ার আছে আমার কপালে। তুই যা এখান থেকে।—ধমক দিয়ে তরুবালা আবার এসে এক জায়গায় বসলেন।

মায়ের তিরস্কারে ভাস্বতীর মুখের প্রসন্নতা নষ্ট হয় না। স্মিতমুখে উঠে সে বাইরে চলে গেল। মৃগেন্দ্র বললেন, তোমার ছেলেরা মানুষ হয়েছে কিনা আমার জানা নেই, আনতে পারবে কিনা তাও হয়ত আমি জেনে যেতে পারবো না। কিন্তু এই কথাটা জেনে রাখো, দীপু একটু আগে যে টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে গেল,—সেই টাকাটা চীনু আমারই বালিশের তলা থেকে বার করে দিতে বাধ্য হোলো!

তরুবালা সবিস্ময়ে মুখ তুলে বললেন, ও টাকা ভাস্বতীর নিজের টাকা নয়?

নিজের টাকা! নিজের বলতে আছে কিছু তার? তোমার অন্য মেয়েরা যে কাপড় ছিঁড়ে একদিন ফেলে দেয়, যে-কাপড় পরে তুমি নিজে রান্না করতেও লজ্জা পাও,—ভাস্বতী সেই কাপড় জোড়াতালি দিয়ে পরে, একি দেখতে পাওনা?

তরুবালা বললেন, কিন্তু পাড়ায়-পাড়ায় ও যে এতদিন দান-খয়রাত করে এলো—সেসব খরচ এলো কোত্থেকে?

মৃগেন্দ্র বললেন, খুব সহজ কথা! অতনু সব যুগিয়েছে!

অতনু তাহলে ওর ভাত-কাপড়ের খরচটাই বা যোগায় না কেন? হাত পেতে ওটা যখন নিচ্ছে, এটা নিচ্ছে না কেন?

এটা নেবে কোন্ সুবাদে, ছোট বৌ?

তরুবালা বললেন, যে-সুবাদে ওটা নিচ্ছে হাত বাড়িয়ে! বুড়ো বাপের জন্যে সে নিতে পারে! নিতে পারে মা-বোনের জন্যে! দরকার হলে নিজের জন্যেও!

মৃগেন্দ্র বললেন, সাধারণ মেয়ের সঙ্গে ওর যেটুকু তফাৎ, সে কি তুমি আজও বোঝোনি?

না, আমাকে বোঝাতেও চেয়ো না তোমরা! মানুষের মান-অপমানের কথা আমি বুঝি,—কিন্তু পেটের দায়ে কারাই বা আজকাল চুলচেরা মানসম্ভ্রম বজায় রাখতে পারছে? খোলার বস্তিতে শেষকালে মাথা গুঁজে তোমারই কতটুকু মান বাঁচলো?

তরুবালা চোখের কান্না চেপে উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, কোথায় আমাদের এনে ফেলেছ তুমি, জেনেছ কি? কারা থাকে এ পল্লীতে, কিসের ব্যবসা তাদের, তোমার মেয়েদের তারা কী ব'লে টিটকিরি দেয়, কেমন করে ফুসলোবার কথা তোলে, সন্ধ্যের পর কারা এসে উঁকিঝুঁকি মারে—এসব খবর তুমি রাখো কি? মানসম্ভ্রম! অতনুর কাছ থেকে সাহায্য নেবার বেলাতেই কি যত মানসম্ভ্রমের কথা ওঠে?

মৃগেন্দ্র বললেন, তোমার দুই ছেলেকে এখান থেকে সরে যেতে বলো, আমি অতনুর কাছে সাহায্য নেবো। দুই ছেলে যদি একবার পরের সাহায্যের প্রশ্রয় পায়, তাহলে কোনোদিন তারা আর রোজগারের দিকে মন দিতে চাইবে।

না, এ আমি বেশ জানি। ওদের তাড়িয়ে দাও, ওরা পথে পথে ঘুরুক—ওরা জানুক, বাপের হোটেলে চিরকাল বসে খাওয়া যায় না।

প্রবল উত্তেজনা রোধ করে মৃগেন্দ্র চুপ করে গেলেন বটে, কিন্তু এক সময় আবার তিনি কথা বলে উঠলেন, তোমার ছোট মেয়ে ত শুনি কোথায় কাজ করছে। কত টাকা পায়?

এখনো পায়নি, পাবে।

পায়নি কেন?

তরুবালা বললেন, পেটে এককলম বিদ্যে নেই, এত তাড়াতাড়ি টাকা কেমন করে আনবে? নিজের চেষ্টায় কিছু কিছু শিখছে, সময় হলে আনবে বৈকি। দু'-পাঁচ টাকা মধ্যে মাঝে হাতখরচ পায়, তাইতে নিজেরটা ওর চলে।

মৃগেন্দ্র বললেন, যমুনা ত সেলাইয়ের কাজ শিখছিল ভাস্বতীর কাছে, কি হোলো তার?

ভাস্বতীর সঙ্গে ওর বনিবনা হয়না।

মানে, ও ভাস্বতীর বাধ্য নয়, এই ত?

তরুবালা চুপ করে গেলেন। কিন্তু সমস্ত কথার পিছনে আসল কথাটা বাকী রয়ে গেল। সে-কথাটা অন্নবস্ত্রের, প্রাত্যহিক জীবনধারণের। সেখানে মৃগেন্দ্রের কোনো নতুন পরিকল্পনা নেই, সেখানে তাঁর সমগ্র জীবনের অভ্যস্ত সংস্কার তাঁকে কোনো নতুন ব্যবস্থা ভাবতে শেখায়নি। সেখানে আছে তাঁর নিরুপায় চিত্তক্ষোভ আর বঞ্চিতের আত্মগ্লানি। শৈবালের দল কেবল স্রোতে ভেসে চলেছে, স্বকীয়তা তার কিছুমাত্র নেই।

অনেকদিন পরে মৃগেন্দ্র একখানা খাটো পুরনো ধুতি আর ছেঁড়া কামিজ গায়ে চড়ালেন, তারপর চটিজুতো পায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বস্তির নোংরা গলিপথ পেরিয়ে।

দ্বিজেন সোজা গিয়ে উঠলো অতনুর চেম্বারে। বেলা তখন আন্দাজ দশটা।

কয়েকটি রোগী নিয়ে অতনু ব্যস্ত ছিল। দ্বিজেনকে দেখে বললে, কিরে, এমন অসময়ে? খবর কি?

খবর কিছু নেই, দরকার আছে।

ব'স এখানে। কাজ শেষ করি

দ্বিজেন বসলো চেয়ার টেনে। অতনু রোগী দেখতে লাগলো এবং ব্যবস্থা-পত্র লিখে চললো। দ্বিজেন পাথরের মতো বসে রইলো প্রায় আধঘণ্টা। আধঘণ্টা পরে অতনু কাজ শেষ করলো। রোগীরা একে একে বিদায় নিল। চেম্বার এবেলার মতো বন্ধ।

অতনু বললে, শুনি, ব্যাপার কি?

দ্বিজেন বললে, অনেকদিন ধরে ভেবেছি তোমার এখানে আসবো কিনা। আজ সাহস করে এসেছি একটা কথা বলতে।

কি বল্?

তোমাকে আর ভয় করিনে।

হঠাৎ অতনু হেসে উঠলো। বললে, এই কথাটা বলতে এতদূর থেকে ছুটতে ছুটতে এলি, হতভাগা?

দ্বিজেন বললে, এই কথাটা বলতে গেলেই অতটা রাস্তা ছুটতে হয়। তোমাকে আমরা কেউ আর ভয় করিনে। এতদিনে আমাদের চোখ খুলেছে!

অতনু বললে, তুই যেন ঝগড়া করতে এলি মনে হচ্ছে?

না, সত্যি কথাটা বলতে এলুম। তোমার যত বিদ্যেবুদ্ধিই থাকুক, তুমিই আমাদের জন্যে দায়ী। তোমার জন্যে আমাদের এই অবস্থা।

হাসিমুখে অতনু বললে, বেশ ত, কি বলতে চাস বল্?

দ্বিজেন বললে, টাকা দাও!

টাকা! কেন?

আমার নেই, তোমার আছে—সেই জন্যেই দাও!

অতনু বললে, তুই ত' অনেকবার আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিস?

দ্বিজেন বললে, প্রত্যেকবার ভিক্ষে করে নিয়েছি, এবার জোর করে নেবো। টাকা দিয়ে তুমি তোমার ভুল শোধরাও। আমার টাকা চাই।

টাকা নিয়ে কি করবি?

জুয়া খেলবো! বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াবো! যেখানে খুশি সেখানে যাবো!

অতনু আবার হাসলো। বললে, এই সর্তে পৃথিবীতে কখনো কেউ টাকা দিয়েছে, শুনেছিস?

দ্বিজেন বললে, কেউ দেয়নি, কিন্তু তুমি দেবে আমি জানি। তুমি বড়দিকে নষ্ট করবার জন্যে টাকা দাও, আমাকে দেবেনা কেন?

নষ্ট করবার জন্যে টাকা দিই? মানে?

মানে, যে রুগী কিছুতেই বাঁচতে পারেনা, তাকে বড়দি বাঁচাবার চেষ্টা করে! যাদের নিশ্চয় মরা উচিত, সেই সব অ-দরকারী লোকদের সে খাওয়ায়। এসবগুলো কি টাকা নষ্ট নয়? কিছু টাকা আমাকে এবার দাও, আমি নষ্ট করবো!

অতনু বললে, টাকা নষ্ট করবি, তবু কাজ করবিনে? কাজ না করলে মা-বাবার অবস্থা কি দাঁড়াবে, ভেবে দেখেছিস?

দ্বিজেন বললে, হ্যাঁ দেখেছি। শুধু তুমিই দেখোনি, বড়দা। তুমি আমাদের মানুষ করে তুলেছ এই তুমি ভাবো, কেমন? তুমি কি আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ ভেবেছিলে? তা যখন ভাবোনি, তখন শিগগির টাকা দাও। তুমি যতদিন না দেশ ছেড়ে পালাবে, ততদিন তোমাকে টাকার জন্যে জ্বালাবো।

ওর কথার ভঙ্গীতে অতনুর চোখে মুখে হাসির আভাস লেগেই রইলো। এক সময় অতনু বললে, বেশ, টাকা আমি দেবো তোকে। কিন্তু আগে একটা কথা স্বীকার কর্?

কি?

যা জিজ্ঞেস করবো, তাই বলবি?

হ্যাঁ, বলবো।

অতনু বললে, মাস দুই আগে তুই শ্যামপুকুরের এক গলি থেকে কারো সাইকেল চুরি করেছিলি?

দ্বিজেন বললে, হ্যাঁ করেছিলুম, কিন্তু আমি একা তার টাকা খাইনি! মাকে দিয়েছিলুম দশটা টাকা।

অতনু কিয়ৎক্ষণ থামলো। পুনরায় প্রশ্ন করলো, এক মাস আগে তুই বৌবাজারের মোড়ে পকেট মারতে গিয়ে নাকি মার খেয়েছিলি? সত্যি বল্?

দ্বিজেন বললে, না, এ ভয়ানক মিথ্যে কথা, তোমার দিব্যি করে বলছি, বড়দা! সত্যি কথাই বলবো। আমি হাত-সাফাই করেছিলুম, কিন্তু মার খেয়েছে অন্য লোক। এইসব ছোট কাজে যেদিন ধরা পড়বো, সেদিন নিজের হাতই আমি কেটে ফেলবো।

কত টাকা পেয়েছিলি?

আশী টাকা পেয়েছিলুম। সর্দারকে দিয়ে আমি পেয়েছিলুম পঁচিশ টাকা। দাও, এবার টাকা দাও।

দেবো।—অতনু আবার কিয়ৎক্ষণ চুপ করে রইলো। পরে পুনরায় প্রশ্ন করলো, আর একটা কথা সত্যি বল্?

দ্বিজেন বললে, আজ তুমি যা জানতে চাইবে, তাই বলবো!

বেশ তার আগে জিজ্ঞেস করি,—তোর এত বুদ্ধি, এত মাথা পরিষ্কার তোর,—তবে লেখাপড়ায় তোর মন বসেনি কেন?

আবার সেই পুরনো কাসুন্দি!—দ্বিজেন বললে, তুমি ত যুদ্ধে গিয়েছিলে, আমাদের খবর রেখেছিলে কিছু! বোমা পড়বার ভয়ে আমরা কোথায় গিয়েছিলুম, দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের কেমন করে চললো, কন্ট্রোলের চাল ধরতুম কেমন করে, কাপড়ের জন্যে ছুটতুম কোথায়, কয়লা আনতুম কোন্ কায়দায়, বছরের পর বছর কী অশান্তিতে কেটেছে, রেশন পাবার জন্যে কী মারামারি,—এসব জেনেছ কখনো? আমি কি একা? হাজার হাজার ছেলে কি রকম খারাপ হয়ে গেছে জানো? লেখাপড়া? একমুঠো ভাত আর একখানা কাপড়ের জন্যে দিনরাত এখানে ওখানে হানাহানি আর দাঙ্গা! তুমি খবর রেখেছিলে কিছু?

অতনু বললে, কিন্তু এমনি করে তোর কদ্দিন চলবে?

যদ্দিন চলে।—তারপর একবার দেখে নেবো সবাইকে। জানের পরোয়া করিনে। মা-বাপের তক্কা রাখিনে।

অতনু আড়চোখে ওর মুখ-চোখের দিকে একবার তাকালো। সে-চোখ রাঙা, সে-মুখ উত্তেজনায় ভরা। সমস্ত চেহারাটায় কেমন একটা বেপরোয়া বন্যতা। শান্তকণ্ঠে অতনু বললে, তুই আজকাল বাড়ীর বাইরে মাঝে মাঝে কোথায় থাকিস রে?

দ্বিজেন বললে, কেন, সর্দারের আড্ডায়। মাটির তলায়। সেখানে ভালো খাওয়া, ভালো থাকা। যত নবাবী করো, কেউ বলবার নেই। পুলিশ কি জানে না? সব জানে। দাও এবার টাকা দাও?

অতনু বললে, এতই যদি ভালো আছিস, তবে আবার টাকা চাস কেন?

দ্বিজেন হঠাৎ চুপ করে গেল। মুখখানা দেখতে দেখতে যেন তার একটু নরম হয়ে এলো। বললে, সত্যি বলবো? অনেকদিন মাকে টাকা দিইনি।

মার বুকের ব্যামো, মা কি বাঁচবে? বাঁচতেই পারে না। একখানা কাপড় আজো দিতে পারিনি! আর ওই বড়দি। শালা, কুমোরটুলির প্রতিমা। মাথা হেঁট হয়ে আসে। তোমার ত এত ভাব বড়দির সঙ্গে। কী খায় জানো? কী পরে জানো? কিন্তু শালা, চুরির টাকা ওদের হাতে দিতে লজ্জা করে। মাইরি, বড়দা। মা-বোনের জন্যে শালা এ জন্মে জান্ দিয়ে যেতে পারতুম।

অতনু সব শান্তভাবে শুনলো। তারপর বললে, দ্বিজু, এবার আমার শেষ কথাটার জবাব দে?

কি বলো?

বরুণার সঙ্গে তুই ওই ছেলেটার আলাপ করিয়ে দিলি কেন?

দ্বিজেন বললে, আমি আলাপ করিয়ে দিলুম? ও বেটা নেড়ি কুকুরের মতন আমার পায়ে পড়েছে আলাপ করবার জন্যে। ওর মামা চাক্‌রি করে দেবে বরুণার, এই বলে কালীঘাটের দিব্যি করলো। ও বেটা পাকা বদমাইস। তার পরে শুনলুম, বরুণা নাকি সুশান্তর কাছে টাকা নিয়ে মাকে দিয়েছে। আর মামার কাছে ত গলাধাক্কা খেয়ে এখন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বরুণাকে ওর খপ্পর থেকে সরাতে পারো, বড়দা?

অতনু বললে কত টাকা চাস, দ্বিজু?

তুমি ত জানো বড়দা, তোমার টাকা আমি নোংরায় ফেলবো না। তোমার ওপর যতই রাগ করি না কেন! আচ্ছা, পঁচিশটে টাকা দাও।

অতনু ড্রয়ার খুলে ছোট একতাড়া নোট্ বার করে বললে, যা, নিয়ে যা।

মোট একশত টাকা! পরিমাণটা কেবল অপ্রত্যাশিত নয়, বিস্ময়করও বটে। হেঁট হয়ে অতনুর পায়ের ধুলো নিয়ে দ্বিজেন বেরিয়ে গেল। অতনু একবারও সন্দেহ করলো না যে, দ্বিজেনের সঙ্গে তার ফাউণ্টেনপেনটাও অদৃশ্য হলো।

পাঁচ

ভাস্বতীর প্রকৃত পরিচয়টাকে নিয়ে লোফালুফি করাটা ভদ্র মনের পরিচয় নয়, এই কথাটাই মৃগেন্দ্র বরাবর ধরে সকলকে বলে এসেছেন। রেল-আপিসের একটি বাবু—প্রায় ঊনত্রিশ বছর আগের কথা—মৃগেন্দ্র সেই বাবুটিকে চোখেও দেখেননি, এবং সুশীলাও তাকে দেখে গেছেন কি না, এতকাল পরে সে সব কথা আর ওঠে না। তারা কোন্ জাতি, কি নাম, কোথায় বাড়ী, কিই বা তাদের গোত্র-পরিচয়,—সমস্তটাই অজ্ঞাত। একদা সেই বাবুটি ভাস্বতীকে ভাসিয়ে দিয়ে সপরিবারে যখন অন্তর্হিত হয়েছিল, তখন একথা মৃগেন্দ্র কিংবা তাঁর প্রথমা স্ত্রী সুশীলার একবারও মনে হয়নি যে, এই সুশ্রী শিশু-কন্যাকে নিয়ে পরবর্তী কালে কোনো জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। মেয়েটি তার রূপ এবং স্বাস্থ্যের গুণে সকলকেই বিভ্রান্ত করেছিল।

সমস্যা যারই হোক, অতনুর মনে কোনো আবিলতা ছিল না। ভাস্বতীর আসল পরিচয় ভাস্বতী নিজে, জাতিগোত্র সেখানে কিছুমাত্র বড় নয়। অতনু হৃদয়ের বিচারই করে এসেছে, জাতিবিচারের কথা তার একবারও মনে হয়নি।

কিন্তু ভাস্বতীর বিয়ের কথা দু'একবার উঠে যথাসময়ে থেমে গিয়েছিল। ভাস্বতী বিয়ে করবে না, এইটিই প্রকাশ, কিন্তু কেন করবে না, সে কথা ওঠেনি কোনোদিন। ওদিকে অতনুর পক্ষে বিয়ে করা কোনোমতেই সম্ভব নয়, এই কথাটাই রয়ে গেল।

অতনুর মা হলেন মৃগেন্দ্রের প্রথম পক্ষের বড় শালী। তিনি জেনে গেছেন, অতনুর বিয়ে না করার কারণ। কারণ হোলো ভাস্বতী—যার জাতি এবং বংশপরিচয় অতনুর মায়ের জানা নেই। মৃগেন্দ্র নিজে এরকম বিবাহের বিরোধী ছিলেন, কেন না, জাতিগোত্রপরিচয়হীনা একটি মেয়েকে তিনি তাঁর কুটুম্বের ঘরে তুলে দিতে প্রস্তুত নন। মৃগেন্দ্রের এই মনোভাবের কথা ভাস্বতীর জানা ছিল।

বছরের পর বছর চলে গেছে, দুটি নরনারী দুটি প্রশ্নের মতো সকলের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছে, কিন্তু জবাব মেলেনি কারো মুখে। ভাস্বতী তার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের ধারাটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে

গেছে। অতনু তার মায়ের পীড়াপীড়ি আর মন-কষাকষি এড়াবার জন্য হঠাৎ একদিন নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল যুদ্ধে। সে আজ নয়-দশ বছর হতে চললো।

কিন্তু এর জন্য দুজনের জীবনই কি নষ্ট হয়েছে? এ ধারণা ভুল, এ ধারণার মধ্যে ভাবাবেগের দুর্গতি আছে বৈ কি। একজনের সঙ্গে আরেকজনের আবাল্যের আত্মিক সম্পর্কটাই যেখানে প্রধান, সেখানে লৌকিক সম্পর্কের তথাকথিত ব্যর্থতার কথাই ওঠে না!

তোমার কি মনে হয়, অতনু?

অতনু নিজের মনে কোথায় যেন ডুব দিয়েছিল। বললে, কার কথা বলছ?

তোমার মুণ্ডু! আমি বলছি হরিদাস যে সেই তখন থেকে একেবারে গুম হয়ে রয়েছে, ও কি রাগ করেছে আমার ওপর?

অতনু তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তোমার মুণ্ডু! দেখছ না, ও একেবারে আহ্লাদে আটখানা! ও আজ বিনা পরিশ্রমে খেতে পাবে, এই ওর পরম লাভ।

রান্নাঘরের বারান্দায় বসেছে অতনু একখানা চেয়ার নিয়ে। ভিতরে সমস্ত রান্নার আয়োজন নিজের হাতে প্রস্তুত করে নিয়ে মাঝখানে বসেছে ভাস্বতী। হরিদাসকে রেঁধে খাওয়াবে বলে ভাস্বতী আজ কোমর বেঁধেছে। হরিদাসের কপাল ভালো।

অতনু এক সময় বললে, মা-বাপের কথা নিয়ে একবারও কি তোমার মন খারাপ হয় না?

ভাস্বতী বললে, মা-বাপ যে পেয়ে গেছে, মা-বাপের জন্যে তার মন খারাপ হবে কেন? তোমাদের চেয়ে আমি অনেক বেশী সুখী, তা জানো? মা পেয়েছি তিনবার! প্রথম—যাঁর কোলে আমার জন্ম; দ্বিতীয়—যিনি আমাকে প্রথম কুড়িয়ে নেন; তৃতীয়—আমার আজকের মা। এর পরেও যদি আমি দুঃখ করি, তবে লোকে বলবে, তুমি হরিদাসের চেয়েও বোকা! কি বলো ভাই, হরিদাসদা'?

হরিদাস জল এনে রাখছিল একপাশে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললে, আমাদের বোকা ভাবলেই তোমাদের আনন্দ, দিদি!

অতনু একবার মুখ টিপে হাসলো। তারপর বললে, তুই একটা গর্দভ।

হরিদাস মুখখানা গোমড়া করে সেখান থেকে সরে গেল।

অতনু পুনরায় বললে, তোমার কি মনে হয় না যে, আগাগোড়া তোমার ওপর একটা অবিচার ঘটে গেছে?

ভাস্বতী বলে, কই না, কিসের অবিচার?

নিজের জীবনটাকে মাঝে মাঝে মিথ্যে মনে হয় না তোমার?

কেন মিথ্যে মনে হবে! যেটা সব চেয়ে সত্যি তাকে মিথ্যে বলবো কেন?

একটু সঙ্কোচের সঙ্গে অতনু বললে, ফাঁকা মনে হয় কি না, তাই বলছি।

ভাস্বতী বললে, এবারে বুঝি তুমি মন-জানাজানির কথা তুলছো? তুমি সব ছেড়েছ ডাক্তার, শুধু লোভ ছাড়োনি! যাদের ভেতরটা শূন্য, তারাই বাইরেটাকে ফাঁকা মনে করে! শূন্যতা আমার কোথাও নেই! কিন্তু আমাকে এত করে জানতে চাও কেন তুমি?

অতনু দমলো না। পুনরায় বললে, ছোটবেলা থেকে কি তুমি কোনো সাধ নিয়ে বড় হওনি? এইটুকু আমাকে জানতে দেবে না কেন?

ভাস্বতী উনুনের উপর কড়া চাপিয়ে বললে, স্রোতের শ্যাওলা, তারও যদি একটা সাধ থাকে, আমার থাকবে না কেন?

অতনু হাসলো। বললে, চিরকাল তো মুখ বুজেই কাটিয়ে দিলে। আসল কথাটার জবাব কোনোকালেই পেলুম না। কিন্তু বলই না একবার, সাধ কি তোমার সত্যিই কিছু ছিল?

ছিল বৈ কি?

যথা?

ভাস্বতী বললে, স্রোতের শ্যাওলার সাধ হোলো সমুদ্রে গিয়ে পড়া, অথৈ অনন্তের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া! ছোট্ট জায়গার থেকে উৎপত্তি, বড় জায়গায় গিয়ে নিবৃত্তি!

অতনু একটু কৌতুক বোধ করে বললে, সাধটা ভালো, কিন্তু তার সাধনা দেখছিনে তো?

মুখ তুলে ভাস্বতী বললে, তুমি কি এবার আমার অহঙ্কারের কথাটা শুনতে চাও? ছোটবেলায় বাবা আমাকে বলতেন, আমি নাকি আকন্দ ফুল, আমার চোখে আছে নাকি নীল রংয়ের আভা!

হাসি চেপে অতনু বললে, নীলটুকু আজো আছে, ওই দেখেই তো অনেকের বিপদ ঘটেছে!

ভাস্বতীও এবার হাসি চাপলো। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো, হরিদাস সেখানে নেই। এই সতর্কতাটা মেয়েদের সহজাত। তারা যখন মন খোলে, তখন আশপাশে দেখে নেয়, মনের ঘোমটা তুললে আর কেউ লক্ষ্য করে কি না। ভাস্বতীও একবার দেখে নিল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, তুমি ছাড়া আর কার বিপদ ঘটেছে, ডাক্তার?

অতনু বললে, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং হলেন কবি, আর মেয়েরা হোলো তাঁর কবিতা—সুতরাং তোমার কথার জবাবটা কাব্য করেই বলতে ইচ্ছে করে!

হাসিমুখে ভাস্বতী বললে, ভালো করে কাব্য করবে কিন্তু, যাতে ব্যঞ্জনাটা বুঝতে আমার অসুবিধে না হয়।

অতনু এবার হেসে উঠলো। বললে, কাব্য-বিচার কোনোকালে মেয়েদের হাতে নেই, তা জানো? এর কারণ খুব সোজা কথা! পৃথিবীর সব কবি মেয়েদের নিয়েই কাব্য করে এসেছে, কেননা মেয়েরাই হোলো কবিতা। ললিত-কলার অধিষ্ঠাত্রী যিনি, তিনি স্বয়ং মেয়ে। মেয়ে ছাড়া গতি নেই!

ভাস্বতী বললে, কিন্তু পুরুষ ছাড়াও মেয়েদের যে গতি নেই!

আছে—অতনু বললে, পৃথিবীর সব মেয়ে যদি তাদের চক্ষে ওই আকন্দের নীল আভাটুকু নিয়ে জন্মাতো, তবে সব সমস্যারই মীমাংসা হয়ে যেতো!

কেমন করে?

স্রোতের শ্যাওলারা একে একে নাচতে নাচতে সমুদ্রের ভেতর গিয়ে মিলিয়ে যেতো!

ভাস্বতী একচোট খুব হাসলো, যেন তুফান উঠে গেল তরঙ্গে তরঙ্গে। কপালে তার ঘামের ফোঁটাগুলি জমে উঠেছে উনুনের লাল আভায়,—অবাধ্য চুলের দু-একটি ঝলক সেই ঘামে জড়িয়ে রয়েছে। দার্শনিক কেউ এখানে উপস্থিত থাকলে বলতো, কোনো চলতি অবস্থাই মেয়েটার মনটাকে আচ্ছন্ন করে রাখে না, ও জানে কেমন করে সমস্তটা অতিক্রম করে যেতে হয়। ছোট-বেলায় চিলেকোঠায় উঠে ওই মেয়েটা নিজের মনে গল্প করে যেতো—শ্রোতা হোতো নিজেই—আর ওর চোখের সামনে গাছপালা লতাপাতা বাড়ীঘর আকাশ-পথের পথিক পাখীরা—সবাই যেন উৎকর্ণ হয়ে থাকতো, মেয়েটা কী বলে! খেলতে খেলতে হঠাৎ নিজের হাতেই খেলাটা দিত ভেঙে, তারপর নীচে নেমে যাবার সময় বলে যেতো, তোরা সবুর কর, আবার আমি আসবো! কিন্তু

কাদেরকে আশ্বাস দিয়ে আসতো? কে তারা? তারা কোন্ ছায়াচারী? সম্ভবত পৃথিবীর সকল দার্শনিকই ওই প্রশ্নটার কাছে হার মেনে এসেছে!

ভাস্বতী বললে, চুপ করলে যে? কাব্য করে জবাবটা ও দিলে না তো?

অতনু বললে, কাব্যবর্ণনা কোথায় হার মানে জানো?

কোথায়?

ছবির কাছে! সন্ধ্যাবেলার ছবি! কবিতার ওপর পড়েছে আগুনের আভা, আনন্দের আর সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনাটা দীপ্তিলাভ করেছে সর্বাঙ্গে, জগদ্ধাত্রীর পায়ের নীচে মহিষাসুরের উগ্র বাসনা আর অভিসন্ধি রক্তাক্ত দেহে মূর্চ্ছিত! এ ছবির তুলনা আছে কোথাও?

আঁচল দিয়ে ভাস্বতী কপালের ঘাম মুছলো। তারপর মধুর হাসি হেসে বললে, এবার কড়াখানা হাত থেকে পড়বে, আর খুন্তিখানা যাবে ছিটকে। শ্রীমতী জগদ্ধাত্রী আপাতত রান্নায় ব্যস্ত, যদি গরম তেলের ছিটে লাগে তাঁর মুখে—তবে তোমার মুখে না থাকবে কবিতা, না থাকবে ছবিতা! যাও, নিজের ঘরে গিয়ে বসগে। আজকের আসর তোমাকে জমাতে দেবো না, আজ হোলো শ্রীমান হরিদাসের আইবুড়োভাত!

অতনু হাসতে হাসতে উঠে পালিয়ে গেল। তারপরেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো বৃদ্ধ হরিদাস। ভাস্বতীকে সামনে রেখে সে দরজার চৌকাঠে ঢিপ করে এক প্রণাম করলো, তারপর—যেমন চিরকাল তার মুখে কোনো কথাই বাধে না—ঠিক তেমনিভাবেই বললে, দিদি, অপরাধ নিয়ো না। পঞ্চাশ বছর আগে আমার আইবুড়োভাতের বাজার নিজের হাতেই করেছিলুম, কিন্তু আমি ছাড়া সে-মেয়ে আর কেউ পছন্দ করলে না!

ভাস্বতী বললে, তাই নাকি? কেন পছন্দ করলে না, হরিদাস?

কেউ বললে, খুঁড়িয়ে হাঁটে, কেউ বললে, ট্যারা। আবার কেউ বা বললে, ও যাত্রাদলের ছেলে, মেয়ে সেজে নাচতে আসছে। হোক না ময়লা, হোক না প্যাঁকাটি—আমার কিন্তু পছন্দই হয়েছিল, দিদি!

মুখ টিপে ভাস্বতী বললে, দুঃখ ক'রো না ভাই হরিদাস, জন্মজন্মান্তর মেনে চলো, ঠাকুর ঠিকই মুখ তুলে চাইবেন।

ভাস্বতীর রান্না হয়ে এসেছিল। শেষ তরকারিটি চাপিয়ে সে বললে, বেড়াল ঢোকে না যেন, দেখো ভাই—ডাক্তারকে আরেকবার চা দিয়ে আসি।

কেৎলীতে চা ভিজছিল এতক্ষণ, ক্ষিপহস্তে পেয়ালায় চা ঢেলে দুধ চিনি মিলিয়ে চামচ দিয়ে নেড়ে ভাস্বতী হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো। অতনু গিয়ে ঢুকেছে নিজের ঘরে। পেয়ালাটা সযত্নে নিয়ে ভাস্বতী এসে দেখলো, অন্ধকারে জানলার ধারটিতে অতনু ভূতের মতো বসে রয়েছে। পেয়ালাটা এক জায়গায় রেখে সে বললে, ধারে, আলোটা জ্বালতে নেই? অচেনা জায়গা, অন্ধকারে যদি হুমড়ি খেয়ে মরতুম? কোন্ মতলব নিয়ে বসে আছ শুনি?

মুখ ফিরিয়ে অতনু বললে, দাঁড়াও, আলো জেবলো না, আগে একে একে জবাবগুলো দিয়ে দিই। আলোটা জ্বালিনি, কেননা অন্ধকারে একাগ্রতা খুঁজে পাই। এ জায়গা তোমার অচেনা—এটা আমার প্রতি পরিহাস! অন্ধকারে হুমড়ি খেয়ে তুমি হয়ত পড়তে, কিন্তু মরতে না!—আর পড়ে মরলেও আমি ডাক্তারি করতে ছুটতুম না! এবার রইলো মতলবের কথাটা। চায়ের পেয়ালা নিয়ে তুমি অন্ধকারে ঢুকবে জানলে ওই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে একুশ বছরের তরুণের মতন একটা কিছু মতলব আঁটতুম বৈ কি!

হাসিমুখে ভাস্বতী সুইচ টিপে আলোটা জ্বাললো, কিন্তু আলো হতেই হাসি মুখখানা লুকিয়ে গম্ভীর হয়ে বললে, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কিন্তু আর দেবো না বলে দিচ্ছি! তিরিশ পেরোলে পুরুষ মানুষ কী অসভ্যই হয়!

অতনু এসে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিল। পরে বললে, মেয়েদের কথাটা কই বললে না? তিরিশে পা দেবার আগে তারা সব অসভ্যতাগুলো একে একে সেরে নেয়, একথা কি মিথ্যে? —কই, তোমার চা কই, চীনু?

আমার?—ভাস্বতী বললে, মেয়েদের অত চা খেতে নেই!

কেন?—অতনু চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রাখলো।

তোমার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কি আমাকে মানায়?

অতনু বললে, কিন্তু এই সামান্য জিনিসে তোমার এত কুণ্ঠা কেন? আমার কাছে নিজেকে ছোট বলে জানাও কেন?

ভাস্বতী কোনো জবাব দিল না, কেবল বিছানার দিকে এগিয়ে গিয়ে বেড্-কভারটা সযত্নে গুছিয়ে দিল। কিন্তু অতনুর মুখখানা দেখতে দেখতেই কঠিন হয়ে এলো। শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সে বললে, তোমাকে বুঝতে আমি পারিনি কোনোদিন, কিন্তু নিজেকেও আমি বোঝাতে পারিনি কখনো!

জানলার দিকে সরে গিয়ে অতনু চাসুদ্ধ পেয়ালা আর প্লেটখানা ঝনাৎ

করে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিল। ভাস্বতী চমকে উঠলো। বললে ও কি, কি করলে? অত দামী জিনিসটে—আমার ওপর রাগ করে নিজের নাক কাট্‌লে? অমন সুন্দর পেয়ালা-প্লেট্‌! আজ তোমার হয়েছে কি?

চেয়ারের ওপর অতনু বসলো মুখ ফিরিয়ে। বললে, তুমি একটু আঘাত পাও, এই আমি চাই।

ভাস্বতী হাসিমুখে বললে, তোমার আমার কারো দোষ নেই, ওইটেই আমার কপাল! নইলে যার বাড়ীতে রাঁধতে এলুম, সে আমাকে আঘাত করবে কেন, ডাক্তার?

ভাস্বতীর মুখখানা বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। অতনু বললে, রাঁধুনি ছাড়া তুমি কি আর কিছু নও?

ভাস্বতী কিয়ৎক্ষণ থামলো। তারপর বললে, একালের হাওয়ায় নিশ্বেস নিয়ে দেখো; গরীব মেয়েদের ওছাড়া আর কোনো পরিচয় নেই! নিজেদের শক্তি অনেকেরই আছে স্বীকার করি, কিন্তু পায়ের তলার মাটি শক্ত না হলে গায়ের জোরের দাম কতটুকু, অতনু? যেদিন দেশভরা ঐশ্বর্য ছিল, ঘরভরা ছিল লক্ষ্মীশ্রী—সেদিন আমরাও ছিলুম গৃহিণী আর গৃহলক্ষ্মী। কিন্তু একালে আমাদের বোঝা কেউ আর বইতে চাইছে না, বাপ হয়ে মেয়েকে পথে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে—এক মুঠো অন্নের ওপরেও আমাদের অধিকার থাকছে না,—সুতরাং ভয়ে ভয়ে জায়গা নিয়েছি রান্নাঘরে, ভয়ে ভয়ে এঁটো বাসন মাজতে বসেছি কুয়োতলায়। যদি লোকের দয়া পাই!

অতনু চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরে চলে গেল। বিষণ্ণ হাসি মুখে নিয়ে ভাস্বতী একবার তাকালো তার দিকে,—তারপর সেও গেল রান্নাঘরের দিকে।

রান্না-বান্না সারতে লাগলো আরো প্রায় ঘণ্টাখানেক। ওদিকে হরিদাস ব্যস্ত ছিল, এতক্ষণকার বিতর্কের কথাটা তার কানে ওঠেনি। রান্নাবান্না সেরে মিষ্টমুখে ভাস্বতী সযত্নে বারান্দার ধারে তাকে আসন পেতে বসালো। হরিদাসের আজ আনন্দের সীমা ছিল না। এটা তার ভোজনের আনন্দ নয় ভাস্বতী জানে,—এটা তার বহুকালের ইচ্ছার পরিপূরণ। আসনের সামনে একে একে ভোজ্যবস্তুগুলি সাজিয়ে দিয়ে ভাস্বতী বসলো সামনে। বৃদ্ধ হরিদাস অলক্ষ্যে চোখের জল মুছে খেতে বসলো। ভাস্বতী এক সময়ে বললে, হরিদাস, তোমাদের দেশে এখন কে আছে ভাই?

হরিদাস বললে, দেশ আছে দিদি, কিন্তু দেশে মানুষজন নেই।

তুমি কতকাল সেখানে যাওনি, ভাই?

তা প্রায় চল্লিশ বছর হতে চললো বৈ কি।

আচ্ছা হরিদাস, তোমাদের দেশে গেলে বেশ শান্তি পাওয়া যায়?

হরিদাস খেতে খেতে বললে, শান্তি পাওয়া যায়, তবে কিনা ডাল-ভাত পাওয়া যায় না, দিদি।

ভাস্বতী চুপ করে রইলো। এক সময় আবার বললে, শান্তি কি কোথাও নেই হরিদাস? এমন কি কোথাও নেই, যেখানে গেলে আর কিছু মনে থাকে না? যেখান থেকে ফিরে আসতে আর মন চাইবে না?

ভাস্বতীর কথার পিছনে কোনো ইতিহাস আছে কিনা, একথা ভালো করে না জেনে জবাব দিতে হরিদাসের ভরসা হোলো না। চুপ করেই সে খেয়ে চললো।

ভাস্বতী একবার উঠে গেল রান্নাঘরে। মাছের রান্নাটা আনলো, আনলো চারটি ভাত—একে একে হরিদাসের পাতে দিল। তার পর গিয়ে নিয়ে এলো দই আর মিষ্টান্ন। পরম পরিতুষ্টির সঙ্গে বৃদ্ধ হরিদাস সেগুলির সদ্ব্যবহার করে চললো।

আর কিছু নেবে, হরিদাস?

না দিদি, আর নয়। আমি উঠে এবার তোমাদের জায়গা করে দেবো।

আচ্ছা, আচ্ছা—ব্যস্ত হয়ো না ভাই। তুমি বসে বসে খাও, আমি আসছি।—বলে ভাস্বতী হাত দুখানা ধুয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

বাড়ীখানা জনশূন্য মনে হচ্ছে। দু'তিনখানি ঘর এখনও রয়েছে—যা কোনদিন অতনুর ব্যবহারে লাগে না। অনেকদিন আগে অতনু একবার মৃগেন্দ্রকে বলতে গিয়েছিল, মেসোমশাই, আমার বাড়ীর ভাড়া দিচ্ছি মাসে অত টাকা, অথচ অতগুলো ঘর আমার কোনো কাজে লাগে না। আপনারা স্বচ্ছন্দে গিয়ে থাকতে পারেন।

কেন থাকবো?—মৃগেন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন।

আপনাদের অসুবিধে হচ্ছে এখানে, তাই বলছিলুম।

পৃথিবীতে কোথাও আমাদের সুবিধে নেই অতনু! পুরনো জমিদারের

বংশরক্ত আজো আমার শিরায় রয়েছে, সেইজন্যেই তোমার অনুগ্রহ নিতে রাজি নই।

অতনু আর কোনো অনুরোধ করেনি। মৃগেন্দ্রর এই প্রত্যাখ্যানে এক ভাস্বতী ছাড়া আর সকলেই অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েছিল। এমন কি যমুনা বলেছিল, দিদি থাকতে বাবা কোনদিন ভালো ব্যবস্থা করবে না। দিদি যে মন্তর দেয় বাবার কানে! তরুবালা বলেছিলেন, বেশ, আদুরে মেয়েকে নিয়েই উনি থাকুন, আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে একদিন পালাবো—যেদিকে আমার দুচোখ যায়!

ঘরগুলো পেরিয়ে এসে বাইরের দিককার বারান্দাটা পাওয়া যায়। সেখানে একখানা তক্তার উপরে অতনু চুপ করে বসে ছিল। ভাস্বতী পিছন থেকে এসে দাঁড়ালো লঘু পদক্ষেপে। মুখ ফিরিয়ে অতনু বললে, এখনো তুমি যাওনি?

এবার যাবো। আটটা বেজে গেছে।

একা যেতে ভয় পাচ্ছ নাকি?

ভাস্বতী বললে, ভয় পাবার বয়স আমার নেই। কিন্তু একা তুমি ত আমাকে ছেড়ে দাওনি কোনোদিন?

অতনু চুপ করে রইলো। ভাস্বতী পুনরায় বললে, আমি কি হরিদাসকে একবারটি সঙ্গে নিয়ে যাবো?

অতনু এবার একটু হাসলো। বললে, আমার হুকুম নেবার কি কোনো দরকার আছে?

আছে বৈ কি, তুমি ওর মনিব! তুমি না বললে আমি ওকে নিয়ে যাবো কেমন করে?

অন্ধকারে কেউ কারো মুখের চেহারা দেখতে পাচ্ছিল না। অতনু নতমুখে একেবারে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে চুপ করে গেল। ভাস্বতী তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললে, রান্না সব হয়ে গেছে, তোমাকে খেতে দিয়ে যাবো?

মুখ ফিরিয়ে অতনু বললে, তুমি এখানে খেয়ে যাবে না?

সে কথা ওঠে না। আজ এখানে এসে নিজের হাতে রান্না করে তোমাদের খাইয়ে যাবার কথাই ছিল। তুমি খাবে এখন?

ভাস্বতীর কথায় প্রাণের কোনো উত্তাপ নেই, কোনো জড়তাও নেই। এত

স্পষ্ট এবং এতই নির্লিপ্ত যে, মন আহত বোধ করে। ক্ষুব্ধকণ্ঠে অতনু বললে, তোমার এসব কথার পর আমার খেতে রুচি হবে তুমি মনে করো?

অন্ধকারেই ভাস্বতী স্নিগ্ধ হাসি হাসলো। বললে, আজ তুমি যেন কোমর বেঁধে বসে আছ আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে বলে! তুমি কেবলই ধরে নিচ্ছ আমি তোমার ওপর অন্যায় করে যাচ্ছি, অতনু। বেশ ত, অন্যায় যদি হয়ে থাকে, আমাকে ক্ষমা করো!

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে এবার অতনু বললে, এ জন্মে আমি গিয়েছিলুম যুদ্ধে, কিন্তু তোমার গত জন্মে তুমিও নিশ্চয় যুদ্ধ করেছিলে! তোমার বন্দুকের গুলী অনেকের বুকে বিঁধেছিল, এই আমার বিশ্বাস। তোমার কথার আঘাত কোথায় গিয়ে বাজে, বোধ হয় তুমি নিজেও জানো না। কেমন করে সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে আসে, তাও তোমার জানা নেই! আমার ধারণা, একটু একটু করে সব বাঁধন কেটে তুমি যেন অনেক দূরে সরে যাচ্ছ!

ভাস্বতীর দিক থেকে কোনো জবাব এলো না। সন্দেহক্রমে অতনু পিছন ফিরে একবার তাকালো। দেখলো, ভাস্বতী সেখান থেকে সরে গেছে।

অতনু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে এলো ভিতরে। কিন্তু ভিতর মহলে এসে দেখলো, ভাস্বতী সেখানেও নেই। হরিদাস নিজের মনে বারান্দা ধুচ্ছিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে অতনু একবার দাঁড়ালো। সমস্ত কাজ সেরে সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করে ঘরদোর গুছিয়ে রেখে ভাস্বতী চলে গেছে, একথা বুঝে নিতে অতনুর বাকি রইলো না।

অনেকটা পথ ভাস্বতী একা চলে এসে একবার পিছন ফিরলো। তার মনে মনে সন্দেহ ছিল, হয়ত-বা অতনু ছেলেমানুষের মতো তাকে অনুসরণ করে আসবে।—কিন্তু রাত্রের দিকে যতদূর চোখ যায়, ততদূর পর্যন্ত ভাস্বতী লক্ষ্য করে দেখলো কেউ কোথাও নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে সে আবার অগ্রসর হলো।

রাত্রের দিকে একা সে কোথাও বেরোয় না। কিন্তু কখনও যদি কাছাকাছি কোথাও তাকে যেতে হয়েছে, তবে একবারটি কোথাও না কোথাও থমকে দাঁড়িয়েছে। রাত্রির ছায়া পথের চেহারাটাকে রহস্যময় করে তোলে, এটা দেখে নিয়েছে সে পথে দাঁড়িয়ে। কেমন একটা নিঃসঙ্গতা সে খুঁজে পায় পথে।

পথে সে একা, যেমন ঘরেও একা। ঘর তাকে আকর্ষণ করে না, কিন্তু পথ তাকে টানে। দূরে দূরে আলো, কোথাও কোথাও পথচারী, কখনো একখানা গাড়ী গেল পেরিয়ে, কোথাও বা সরুপথ এ'কে এ'কে অন্ধকারের দিকে গেল মিশে—সবটা মিলিয়ে ভাস্বতীর আশ্চর্য মনে হয়। একা হাঁটতে তার গা ছমছমিয়ে ওঠে না, উদ্বেগ থাকে না মনে, সঙ্গ নেয় না কেউ—কিন্তু কিছু একটা চলে যেন তার পাশে পাশে। ছায়া নয়, মায়া নয়,—অন্য কিছু। তারই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে আরেকজন, সে তাকে পথ দেখায়, পথ চেনায়। তাকে বুঝা যায় না, উপলব্ধি করা যায়। এরই টানে হয়তো সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তো অতি শিশুকালে নিজের অজ্ঞাতে। তখন সে নগ্ন শিশুকন্যা, নিরাভরণা, নিঃশঙ্কা। চোখে তার নীলাভা, মনে তার মোহমুক্তি! এরই টানে সে চলে যেতো চিলেকোঠায়, গল্প জমিয়ে তুলতো পিপীলিকা আর কীটপতঙ্গের আসরে,—চলতি সংসারটা থেকে অনেক দূরে থাকতো তা'র খেলাঘর।

আজও অনেকটা তাই। ছোঁয়াচ লাগে না তা'র, তা'র দুঃখবোধ কম। তা'র চারদিকে ক্ষুধা, বীভৎস দৈন্য আর দারিদ্র্যের সমারোহ, পদে পদে অপমানিত চিত্তবৃত্তি—কিন্তু তাকে স্পর্শ করে না। আগে যে-পল্লীতে সে ছিল, সেখানে দেখে এলো মৃত্যুর পর মৃত্যু—তারই হাতের শেষ সেবা নিয়ে তারা মরেছে, কিন্তু তার মনে কোনো ধাক্কা লাগেনি, এতটুকু সে টলেনি। কেউ কেঁদেছে তার হাত ধরে—সে শুধু চেয়ে থেকেছে। বিধবার একমাত্র ছেলে মরেছে তিন দিনের জ্বরে, সেই বিধবার বুক তার চোখের সামনে ডুকরে-ডুকরে উঠেছে, কিন্তু সে চঞ্চল হয়নি। সুখসম্পদের গল্প বলো তার কাছে, ডাকো তাকে আনন্দের আসরে, বিয়েবাড়ীর বাসরে, দুর্গাপূজার দালানে, দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায়—তার মন কেমন যেন নির্লিপ্ত, কোথায় যেন সে সর্বহারা, অতি সন্তর্পণে সে কথা কয়, কেউ কোথাও আঘাত পেলে সে শিউরে ওঠে। বড় বড় তার আশ্চর্য দুটো চোখ যেন নিজের প্রাণের অতল তলে ডুব দিয়ে থাকে।

পথের পরিমাণ কম নয়। ভাস্বতী নিজের মনে ধীরে ধীরে চললো। চললো অনেকদূর—যতদূর পর্যন্ত তার ইচ্ছাটা চলে যায়, যতদূর পর্যন্ত চলে যেতে চায় তার মন। কিন্তু এক সময় আবার তাকে থামতে হোলো। পথ সে ভুল করেনি, কিন্তু পথই তাকে ভুলিয়ে এনেছে—পথের আনন্দে পা দুখানা

তার চলে এসেছে এতদূরে। বস্তির বাঁকটা সে আনমনে ছেড়ে এসেছে পিছনে।

রাত এমন কিছু নয়। কিন্তু নগরতলীর পাড়াপল্লী এরই মধ্যে নিঃঝুম হয়ে গেছে। ওদের উদ্বৃত্ত উদ্যম আর কিছু নেই, সারাদিনের অন্নসংগ্রামে ওরা ক্লান্ত। অস্তিত্বরক্ষার কাজে ওদের সমস্ত শক্তি ক্ষয় হয়, ওরা ফুরিয়ে ফতুর হয়ে যায়,—এক সময় অবসন্ন দেহে ফিরে এসে ওরা আপন আপন গুহা-গহ্বরে আশ্রয় নেয়। তারপর সব নিশ্চুপ, ওদের উপরে যেন নেমে আসে মৃত্যুর ছায়া। সমস্ত পল্লী ডুবে যায় অন্ধকারে, চেতনাটা লোপ পেয়ে যায়।

ভাস্বতী পথ চিনে চিনে ফিরে আসে। দূরের পথের আলো যতদূর পর্যন্ত আসে, সেটাকেও পেরিয়ে এলে তবে ডানহাতি বস্তির গোলকধাঁধা! সন্তর্পণে সে এসে ঢুকলো ভিতরে। বিপদের সঙ্কেত আছে এখানে ওখানে, সুতরাং মৃদুগতি চলবে না। কীর্তনীয়াদের খুপরিটা ছাড়িয়ে বংশীমুদির ঘর পেরিয়ে আর দুপা গেলেই বড় নর্দমাটা,—সেটা কোনোমতে ডিঙোতে পারলে তবেই সম্মানটা থাকে নিরাপদ। ঝিয়েদের ঘর পাশে রেখে ভাস্বতী এগোলো।

অন্ধকারে চাপা-চাপা কথাবার্তা এখানে প্রাত্যহিক। দেখা যায় ছায়ারা নড়ে, বিড়ির আগুন ঘুরে বেড়ায়—তার সঙ্গে ছোট ছোট টুকরো কথা, ছোট ছোট চূর্ণ হাসির ঝলক। আর কিছু জানার থাকে না, আর কিছু জানাবারও থাকে না,—কেবল নিরীহ নিষ্পাপ বুকের মধ্যে কেমন একপ্রকার ধকধক করে শব্দ হয়, কেমন যেন কাঁপুনিতে সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসে! শুধু যে সংশয়, শুধু যে অবিশ্বাস তা নয়,—শুধু যে অধঃপতিত মানবতা আপন নির্লজ্জ বর্বরতা নিয়ে লোকযাত্রার এই নীচের তলাটায় ক্ষুধার্ত কৃমির মতো কিলবিল করে তা নয়; ভয় করে,—মানুষের অন্তঃস্থিত দেবতা বুঝি এখানে অপমানিত হয়; বুঝি এইখানে মুখ থুবড়ে পড়ে বাকী জীবনের সমস্ত মহৎ স্বপ্নটাকে নষ্ট করে, বুঝিবা মহত্তর বেদনাবোধের কোনো মূল্যে না দিয়ে এখানকার কদর্য পঙ্ককুণ্ডের মধ্যে সবাই তলিয়ে যায়।

সামনে দিয়ে পেরিয়ে যাওয়াটা ভালো লাগলো না, ভাস্বতী ডানদিকের নালাপথের পাশে ঢুকলো। এদিক দিয়ে ঘুরলে নিরিবিলি তাদের ঘরের পিছন দিকটা পাবে—যেদিকে সেই পগার। কিন্তু তথনই সে একবার চমকে

উঠলো পরিচিত চাপা কণ্ঠস্বর শুনে। থমকে সে দাঁড়ালো পলকের জন্য। কীর্তনীয়াদের ছোট্ট জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরে এসেছে একফালি আলো। সেই ফাঁকে মুখ রেখে সে দেখলো, ভিতরে ঘাগরাপরা শীলু রয়েছে দাঁড়িয়ে এবং তাকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে একটি কণ্ঠীপরা লোক বিলোল হাসি মুখে নিয়ে। লোকটি পয়সা গুণছে শীলুর হাতে। ওইটুকু, ওর বেশী কিছু নয়, ওর পরে আর কিছু নেই,—শীলুর সমস্ত চেহারাটা যেন ঝঞ্ঝালাঞ্ছিত, অসম্বৃত—কিন্তু তখনই পয়সা হাতে নিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে শীলু ওদিককার দরজা দিয়ে ছুটে গেল বেরিয়ে। নধর সুন্দর মেয়েটা!

ভাস্বতীর পা কিন্তু নড়তে চাইছে না, ওখানকার কাঁচামাটিতে তার পা দুখানা যেন পুঁতে গেছে। সামনে পিছনে অন্ধকার. ঝিঁঝিঁ ডাকছে আশে-পাশে কোথাও, কোথায় যেন বিড়াল বসে কাঁদছে, বহুদূরে যেন কোথা থেকে আসছে রেডিয়োর গানের সুর—ভাস্বতীর কিন্তু পা উঠছে না। এ দৃশ্যটা অতনুর চোখে পড়লে সে হয়ত বলতো, দম আটকে আসছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। কিন্তু তবু নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছে এ যুগে। এ যুগের অন্নে বিষ আছে, অতনু হয়ত বলবে। বলবে, হাওয়ায় আছে বীজাণু, জীবনের শেষ পরিণতি হোলো ধিক্কারে, শেষ জিজ্ঞাসা রয়ে গেল অসম্মানে। অতনু সুখে মানুষ, সে উপরতলাকার লোক—যেখানে আলো আসে, আসে হাওয়া! নীচের তলাটা অন্ধকার, অতনু আজও দেখেনি। অতনুরা আসে এদিকে বেড়াতে, হয়ত বা দুঃখ জানাতে, নয়ত সহানুভূতি! এখানে এলে ওদের দম আটকায়, আতঙ্ক উপস্থিত হয়—কেন না, ওদের চোখে এটা বিভীষিকা। এটা ওদের কাছে অপরিচিত, এতে ওরা অনভ্যস্ত, ওদের সংস্কার এতে আহত হয়,—তাই ওরা ভয় পায়। অন্নের প্রাচুর্য থাকলে পারস্পরিক আত্মীয়তাবোধ মধুর মনে হয় বৈ কি।

ভাস্বতীর পা উঠছে না; পাতালের তল থেকে নিপীড়িতা ধরিত্রীর আত্মা যেন থরথর করছিল। সে যেন নেমে চলেছে অনেক নীচে, অগাধ নীচে—যেখানে থেকে মা বসুমতী সীতাকে কোলে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, যেখানে নেমে গিয়ে দাতাকর্ণের রথের চাকা বসে গিয়েছিল,—যেখান থেকে আর উঠে আসা যায় না!

কুকুরের তাড়ায় বোধ হয় একটা শিয়াল ছুটে পালালো ওপাশ দিয়ে।

ভাস্বতী এবার সজাগ হয়ে পা বাড়ালো। আস্তে আস্তে ওখান থেকে বেরিয়ে পগারের পাশ দিয়ে ঘুরে কুয়াতলার ধার ঘেঁষে দাওয়ায় উঠে এলো। কেরোসিনের ডিবেটা এখনও জ্বালা রয়েছে একপাশে। পাশের ঘরে তরুবালার চাপা গলা শোনা যাচ্ছে, শীলু যেন কি বলছে চুপি চুপি।

হঠাৎ যমুনার সাড়া পাওয়া গেল, অন্ধকারে সে যেন কোথায় বসে ছিল। বক্রকণ্ঠে বললে, অত পা টিপে টিপে ঢুকছো কেন, দিদি?

ভাস্বতী মুখ ফিরালো। সম্ভবত যমুনার পাশেই বসেছিল বরুণা। বরুণা হেসে উঠলো। বললে, মনে পাপ থাকলে নিজের পায়ের শব্দেও ভয় করে। অন্ধকারে বুঝি ছোঁক-ছোঁক করবার সুবিধে হয়!

ঠোঁট বেঁকিয়ে যমুনা বললে, সে কথা সত্যি, এ পাড়ায় এসে সুবিধে হয়েছে খুব!

ঘটির জলে পা ধুয়ে আঁচল দিয়ে মুছে ভাস্বতী বললে, ছি যমুনা,—এসব কথা কোথায় শিখলি রে?

শিখলুম এই বস্তির আনাচ-কানাচ থেকে—যেখানে তুমি গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো! শুনবে আরো কথা?—যমুনা তার বিষাক্ত ফণা তুলে পুনরায় দংশন করলো,—ওসব উপদেশ ছড়াও গে তোমার অতনুমোহনের কাছে, যেখান থেকে আঁচল ভরে পয়সা আনো, পেট ভরে খেয়ে আসো! এ বাড়ীর আমানি-ভাত কি আর তোমার ভালো লাগে? কেনই বা লাগবে! বলে—পর লাগে না পরে!

শান্তকণ্ঠে ভাস্বতী বললে, ঝগড়া করবি বলে বুঝি বসে ছিলি?

রাম বলো! ঝগড়া! ঝিয়েদের সঙ্গে ভাব করবার মতলব আঁটছিলুম। আমাদের ত আর লজ্জা-শরম নেই! তুমি সবই শিখিয়েছ, এটাও ত' আর বাকী রাখলে না!

বংশীমুদির ঘর থেকে হঠাৎ কনকের উল্লসিত হাসির আওয়াজ কানে আসতেই সবাই থেমে গেল। ভদ্রঘরের মেয়েদের মধ্যে এই প্রকার কদর্য বিতর্কের উপর ওটা যেন একটা বিদ্রূপের মতোই কানে বাজলো। ভাস্বতী একটি কথাও আর বললে না, শুধু মুখ ফিরিয়ে একবার দেখলো কতকগুলো এঁটো বাসন জমা করা রয়েছে এক পাশে—সেইগুলো একে একে গুছিয়ে নিয়ে সে আবার গিয়ে কুয়োতলায় নামলো।

দড়ি-বালতি নামিয়ে জল তুলে সে যখন বাসন মাজতে বসে গেল, তখন মুখ ফিরিয়ে বরুণা বললে, আচ্ছা বড়দি—?

ভাস্বতী জবাব দিল, কি বল?

তুমি ত বেশ কানে তুলো আর পিঠে কুলো দিয়ে থাকতে পারো? লোকে তোমাকে দেখলেই বলবে, চুপো ডান্!

বলুক না কেন!

বরুণা জ্বলে উঠলো,—সেই রান্না-বান্না সেরে বড়দার ওখানে গিয়েছ, আর অর্ধেক রাত্রে বাড়ী এলে! লোকের কি চোখ-কান নেই?

হাসিমুখে ভাস্বতী বললে, থাকলে খুশীই হই, বরুণা।

এমন বেহায়া তুমি ত' আগে ছিলে না?—যমুনা কামড়ালো।

পুনরায় ভাস্বতী বললে, বুড়ো হলেই মেয়েমানুষ বেহায়া হয়!

এটা কিন্তু গেরস্থ ঘর! ওসব এখানে চলে না!

ভাস্বতী শুধু হেসে উঠলো। বরুণা বললে, মাঝরাত্তির পর্যন্ত টানা-পোড়েন না করে গলায় একগাছা মালা ঝুলিয়ে দিলেই ত' লোকের মুখ বন্ধ হয়! বড়দাও তেমনি, ভেড়া বনেই রয়ে গেল!

যমুনা বললে, মনে মনে যে দুজনেরই জিলিপির প্যাঁচ!

ভাস্বতী বাসন মাজা শেষ করলো। বরুণা এবার বললে, সারা দিনে ত' কাজকর্ম কিছু নেই তোমার! আমি যেমন মাথার ঘাম পায়ে ফেলছি,—তুমিও ত' কিছু কাজ করে দু-পয়সা ঘরে আনতে পারো।

হাত দুখানা ধুয়ে ভাস্বতী বললে, আঁচল ভরে যখন এত টাকা-পয়সা চেয়ে আনি, তখন আবার কাজ করতে যাবো কেন রে?

যতই ঠাট্টা করো, সবাই বোঝে। সকলকে ভাসিয়ে নিজের আখের গুছিয়ে রাখছো বাইরে-বাইরে, কে না জানে! শেষ পর্যন্ত তোমার অতনুমোহনের চোখও খুলবে, বলে রাখলুম।

ভাস্বতী আবার হেসে উঠলো।

ঘরের ভিতর থেকে এবার তরুবালা বললেন, তোদের কথা-কাটাকাটির জ্বালায় একটু চোখ বোজবার উপায় নেই। দোর তাড়া দিয়ে এবার শুয়ে পড়গে সব। যমুনা, তুই গায়ে জ্বর নিয়ে এখনও বাইরে বসে আছিস?

জ্বর! ভাস্বতী একবার তাকালো যমুনার দিকে। মাথাটা তা'র রুক্ষ বটে অনেকদিন থেকে, খিটখিটে মেজাজটাও তা'কে পেয়ে বসেছে। আগে সে এতটা তিক্ত ছিল না। মুখখানাও রোগা-রোগা! কিন্তু ভাস্বতী আর কিছু বললে না। কোণের ঘরে গিয়ে আজকের মতো তা'র ছুটি।

আশ্চর্য, মৃগেন্দ্র জেগে ছিলেন। বললেন, চীনু, এতক্ষণ কোথা ছিলে, মা?

ভাস্বতী বললে, অতনুর ওখানে রান্না করে হরিদাসকে খাওয়ালুম, বাবা। ওখানেই আটটা বেজে গেল!

অতনু এসে পেঁছে দিলে?

না বাবা, একটা কি যেন তর্ক উঠলো,—তারপর আমি একলাই বেরিয়ে পড়েছিলুম। অন্যমনস্ক আসছি বলে খানিকটা বেশী হাঁটতে হোলো। রাত্তিরে বেরোলে রাস্তাঘাট সব গুলিয়ে যায়, বাবা!

চীনু?

কেন, বাবা?

বোনেদের মুখে এত অপমান শুনেও তোমার মন তেতে ওঠে না? ওরা সবাই আমার শাসনের বাইরে চলে গেছে। কিছু বলতে গেলে আমাকেও চোখ রাঙায়!

ভাস্বতী অন্ধকারে পলকের জন্য থামলো। তারপর বললে, ওদের আমি কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি। আমি যে সকলের বড়, বাবা!

মৃগেন্দ্র আর কোনো কথা বললেন না। ভাস্বতী তার ছেঁড়া কাঁথা-মাদুর নিয়ে ঘরের এককোণে সরে গেল। আর কিছু না ব'লে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লো।

চায়ের দোকানে কাজ করতে করতে অন্তুর মন বসেছিল অনেকটা। আট বছরের ছেলের পক্ষে এই স্বাধীনতাটা অবারিত। খেলাধুলো আছে ওরই মধ্যে। পানের দোকানের একটা বাচ্ছা ছেলের সঙ্গে অন্তুর ভাব হয়েছে খুব। খাওয়া-দাওয়া ভালোই পায়। দুপুরবেলায় খানিকটা সময় ছুটি। তখন দোকানের ভিতরটা ধুয়ে-মুছে বাসন মেজে কোমরে গামছা বেঁধে ওইটুকু ছেলে বন্ধুর সঙ্গে যায় গঙ্গায়—কিছুদিনের চেষ্টায় সাঁতার শিখেছে মন্দ নয়। ভাত

খেয়ে উঠে পান খায়, বন্ধুর সঙ্গে আড়ালে গিয়ে আবার বিড়িও ধরায়। অন্তুর চেহারাটা বেশ ফর্সা, কিন্তু ওইটুকু বয়সেই তার সৌকুমার্য গিয়েছে কমে।

আজকাল অন্তু আর বাড়ীর নাম করে না। কেন না, বাড়ীর বাইরে কলকাতার যে জগৎটা—সেটা থেকে ক্ষণে ক্ষণে যে বিস্ময়-বৈচিত্র্যের জন্ম হচ্ছে, তার আকর্ষণ আর ঔৎসুক্য ওই নাবালকটির পক্ষে কম নয়। অল্পক্ষণের জন্য ছুটি পেলেও সে হঠাৎ ফুটপাথের ধারে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে যায়—ক্ষণে ক্ষণে তার শিশু চোখ একটির থেকে আরেকটি আবিষ্কার করে চলে। বাড়ীর জন্য এখন আর তার মন কেমন করে না,—এই মস্ত জগৎটাতেই তার বাড়ীটা যেন ছড়িয়ে মিলিয়ে রয়েছে। সবই অবশ্য সে ভুলেছে, কিন্তু বোনটার কথা তার মাথা থেকে কিছুতেই আর যেতে চায় না। ওই বয়সের কোনো মেয়েকে পথে দেখলেই শীলুকে তার মনে পড়ে যায়। আর মনে পড়ে যাওয়া মানেই হঠাৎ তার সমস্ত কাজেই অরুচি। তখন সে দোকান থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে কোনো এক বাড়ীর রোয়াকের ধারে বসে থাকে, নিজের মনে পা দোলায়। আর যদি বা দোকানে থাকে, তবে সেদিন দু-একটা পেয়ালা তার হাত থেকে পড়ে ভাঙ্গবেই। এমন ঘটনা ঘটেছে অনেকবার। আট বছরের ছেলেটাকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না, আজকাল এক জোড়া পেয়ালার দাম কত!

বোঝানো তাকে যাবে না, কেন না, মূল্যবোধের সঙ্গে তার এই চাকরির যোগ কম। ছেলেমানুষের উৎসাহ থাকে শুধু কাজের মধ্যে, কিন্তু কাজের বিনিময়ে যে টাকাটা পাওয়া যায়, সেটার দিকে তার ভ্রুক্ষেপ সামান্যই। ফলে মাসিক বেতনের দশটি টাকা তার অভিভাবক হিসেবে দীপেনের হাতেই পড়ে,—এমন কি, খদ্দেরের কাছ থেকে দু-চার আনা বকশিসও যা অন্তুর হাতে আসে, সেটার উপরেও তার দখল থাকে না।

দোকানদার একদিন নালিশ জানালো উত্তেজিত হয়ে,—দেখুন বড়বাবু, এ মাসে সাতখানা চামচে হারালো আপনার ওই ভাগ্নে, আজকাল চায়ের চামচে হলো টাকায় চারখানা। আপনিই বলুন দিকি, এমন করলে কদ্দিন চাকরি করতে পারবে!

নালিশ জমেছিল অনেক। ভোরবেলা অন্তু ঘুম থেকে উঠতে দেরি করে—ততক্ষণে খদ্দের এসে যায়। খদ্দের বসে থেকে এক সময় উঠে যায়, চা আসে না। দুপুরবেলা সেই যে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে সেই বিকাল পাঁচটায়।

রাঁধতে বললে এক খাব্‌লা নুন ফেলে দিয়ে আসে হাঁড়িতে। নোংরা পেয়ালায় চা ঢালে, খদ্দের যায় ক্ষেপে। আর ওই পানওলার ছেলেটার সঙ্গে বসে একবার আড্ডা জমালে কাজের দিকে আর একটুও হুঁস থাকে না। দশ টাকা মাইনে দিয়ে এমন উৎপাত আর কতদিন সইবো, বড়বাবু, বলুন দিকি আপনি?

দীপেন ঠাস করে মারলো অন্তুর গালে এক চড়,—আর এমন কাজ করবি? কখনো অবাধ্য হবি?

চড়ের দাগটা রক্তের মতো ফুটে উঠলো অন্তুর ফর্সা গালে। চোখ দিয়ে তার জল বেরিয়ে এলো। বললে, না।

দোকানদারের দিকে তাকিয়ে দীপেন বললে, আচ্ছা দাঁড়ান, আমি ওকে জন্মের মতন ঢিট্ করে দিচ্ছি। আর কিছু না, শুধু কাজের পর কাজ ওর ঘাড়ে চাপানো। একটু হাঁপ ফেলবার সময় যেন না পায়। দাঁড়ান, আমি তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। দুপুরবেলা আমার ওখানে কাজ করবে, আর সকাল-সন্ধ্যা এই দোকানে—ব্যস্। বেকার হয়ে কোনো সময়ে থাকতে দেওয়া চলবে না। বেকার থাকলেই শয়তানি করবে।

চায়ের দোকানে অন্য বন্ধুবান্ধব ছিল। একজন হেসে বললে, মামার ভাগ্নে ত বটে! ছেলেটা কিন্তু বেশ চোখা, দেখেছিস?

দীপেন হেসে বললে, মামার ভাগ্নে ত বটে!

সবাই হেসে উঠলো, সেই অবসরে অন্তু চোখের জল মুছে নোংরা কাপ-প্লেটগুলো তুলে নিয়ে গেল। পরনে তার ছেঁড়া ময়লা হাফ-প্যাণ্ট—অসংখ্য রকমের দাগ-লাগা; গায়ে আধময়লা গেঞ্জি, মাস চারেক আগে দীপেন ওটা কিনে দিয়েছিল ছয় আনায় ফেরিওয়ালার কাছ থেকে। চুল-কাটার পয়সা হোটেলওয়ালা দিতে চায় না,—ফলে ফর্সা রংয়ের উপর বেগুনী কোঁকড়া চুলের রাশি মাথায় জমেছে এক ঝুড়ি। ওই চুলে বাসা বাঁধেনি, এমন পোকাই নেই। ওর মা মরেছে প্রায় বছর দুই হতে চললো, আর বাপ একালের কঠোর জীবন-সংগ্রামের বেগতিক অবস্থা দেখে কোন্ এক আশ্রমে গিয়ে মাথা মুড়িয়েছে। তিনকুলে ওদের আর কেউ নেই।

তরুবালা একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, ছেলেটা চায়ের দোকানে যে কাজ নিলে, তার [illegible] টাকাটা কোথায় রে দীপু?

টাকা!—দীপেন অবাক হয়ে গেল। বললে, দেশের কতকগুলো হ্যাঁচড়া কারবারী আছে—তুমি চেনো তাদের? মাইনে লেখা থাকে কাগজপত্রে, পায় কতটুকু? দেশী কোম্পানীর মালিকরা—যত নামই তাদের থাকুক, ভেতর একেবারে ঢুঁ ঢুঁ। শুনতে পাচ্ছ না, ইংরেজ চলে যাবার পর থেকে সব আপিসের তোড়জোড় আল্‌গা। লম্বা-চওড়া কথা আছে সকলের মুখে,—আসলে পকেট ভরাতে পারলেই খুশী,—কাজের লোক একটি খুঁজে পাও? ওই জন্যেই ত আমি দেশী কোম্পানীর আপিসে চাকরি নিইনে।

তরুবালা বলেছিলেন, দশটা টাকা মাইনে দিতে পারে না, কেমন তোদের চায়ের দোকান! কপালে আগুন আর কি!

ওই ত মজা—দীপেন চেঁচিয়ে হেসে উঠেছিল, সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। বড় বড় কাপ্তেন, কিন্তু চায়ের দোকানের ধার শুধতে পারে না। দু-পয়সার চা, এখন দুআনা এক পেয়ালা। মোটা মোটা সব বিল বাকী। হবে না কেন বলো? চোরাবাজারের টাকা থাকে কি? সব গেল ঘোড়দৌড়ের মাঠে, আর মদের দোকানে। বাছাধনরা এখন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমার মনে নেই মা, সেই গেল বছরে—আমার কাছে এসেছিল সেই হিন্দুস্থান ইণ্ডাষ্ট্রিজ্? পায়ে ধরে সাধাসাধি! মাইনে দেবে আড়াইশো, পঁচাত্তর টাকা টি-এ, আর বাহান্ন টাকা ডি-এ। আর আমি কি উত্তর দিয়েছিলুম, একবার দাও না সবাইকে শুনিয়ে? টাকা ত' হাতের ময়লা! তাই বলে ব্ল্যাক-মার্কেটকে আস্কারা দেবো? ওরাই ত দেশের যত নষ্টের গোড়া।

মৃগেন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, যা বেরিয়ে যা এখান থেকে।

দীপেনের মুখখানা হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে এসেছিল। বলেছিল, আপনি ঘরে ছিলেন এতক্ষণ, আমি কি জানতুম?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে দীপেন বেরিয়ে গিয়েছিল।

সেদিনকার সেই কথাটা মনে করে দীপেন অন্তুকে সাবধান করে দিল—কত মাইনে পাস, কত বকশিস পাস, খবরদার কোথাও বলবিনে। বলবি, সব বড়মামা জানে। মনে থাকবে?

দুর্জনকে কে না ভয় করে! অন্তু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

দোকান বন্ধ হ'তে চলেছে। সকালের দিককার খদ্দের আর কেউ আসবে

না। টেবিলের ওপর বাঙলা সংবাদপত্রখানা এতক্ষণে অনেকের হাত ফিরে প্রায় বাসি হয়ে এসেছিল। বন্ধু-বান্ধব একে একে এবেলাকার মতো বিদায় নিচ্ছে। বিকালের দিকে আবার সবাই এসে এখানেই জড়ো হবে। এখানে বসেই সন্ধ্যারাত্রির কর্মসূচী জানবে সবাই। আড্ডাটা ওদের নিয়মবাঁধা।

দীপেন দোকানের বাইরে এসে দাঁড়ালো। অন্তু চটপট নিজের কাজ সেরে নিতে লাগলো।

একটি ছোকরা তখনও যায়নি। দীপেনের কাছাকাছি এসে সে দাঁড়ালো। বললে, আমাকে দেখলেই বুঝি গা-ঢাকা দিতে চাস? কাপড়-জামাটা ছেড়ে দে,—বাড়ীতে বকাবকি করছে!

উত্তেজিত হয়ে দীপেন বললে, তোদের বুকের ছাতি বড্ড ছোট, তা জানিস, জগা? তোর ধুতি-পাঞ্জাবী ধার ক'রে না হয় থিয়েটারই দেখেছি, তাই ব'লে কত পয়সার সাবান খরচ করেছি, শুনবি তা'র হিসেব? আমার জামা-কাপড় কাচতে দিয়েছি ডাইং-ক্লিনিংয়ে—পয়সার জন্যে আনতে পাচ্ছিনে, আর এই সময় ধুতি-পাঞ্জাবী ফিরে চাস,—বুকের ছাতি নেই তোর! তোরাই আবার মেড়োদের গাল্ দিস্! লাখো লাখো টাকা তা'রা চোখ বুজে খরচ করছে এখানে ওখানে,—তাদের দেখে ভালো জিনিসটে শিখতে পারিসনে? তোদের মতন লোকের জন্যেই বাঙগালীদের নিন্দে হয়!

শ্রীমান্ জগা একেবারে হতবুদ্ধি। কিন্তু ধাক্কাটা সামলে নিয়ে সে বললে, ও, বাঙগালীদের নিন্দে! আর তুই যে সেদিন ট্রামের পয়সা ফাঁকি দিতে গিয়ে ধরা পড়েছিলি?

বটে! ফাঁকি দেওয়াটাই দেখলি! আর পয়সাটা দিয়ে যখন টিকিট না নিয়ে নেমে আসি,—সেই খয়রাতটা দেখতে পাসনে কেন?—দীপেন বলতে লাগলো, একেই বলে ঘরের শত্তুর বিভীষণ! যেখানে বাঙগালী, সেখানেই ঝগড়া! এ জাতের কোনো আশা নেই! কোনোকালে তোদের মধ্যে মিল হবে না! ভালো ধুতি-পাঞ্জাবী প'রে ঘুরছি, অমনি তোর চোখ টাটিয়েছে। পরের ভালো যদি সইতেই পারবি, তবে বাঙগালী হয়ে জন্মেছিস কেন! ঠিক কথা! আমারই ভুল, আমারই মিথ্যে আশা!

অন্তু নেমে এসেছিল, দীপেন তা'কে নিয়ে এবার অগ্রসর হোলো। পিছন থেকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো শ্রীমান্ জগা! ধুতি-পাঞ্জাবীতে কোনো

নাম-ধাম লেখা থাকে না, সুতরাং ভালোয়-ভালোয় আগে ফেরত দিক্, তারপর ওকে বুঝে নেওয়া যাবে। ওর চেয়ে মেয়েছেলেরা ভালো। পাড়ার মধ্যে একজন আরেকজনের গয়না গায়ে চাড়িয়ে বিয়ে বাড়ীতে গিয়ে নবাবী ফলায় বটে, কিন্তু যথাসময়ে গয়নাগুলো মালিকের হাতে ফেরত দেয়!

শ্রীমান্ জগা ক্ষুব্ধ মনে নিজের পথে চলতে লাগলো।

শেঠের বাগানের ছোট গলিটিতে ঢুকতে গেলে মোড়ের মাথায় আগে সেই গেঞ্জির কারখানাটা পড়ে। তারই পাশ দিয়ে দীপেন ঢুকলো গলির মধ্যে। পিছনে পিছনে অন্তু। গলিটা এসে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে কয়েকঘর ছোট ছোট গেরস্থ বসেছে এই অল্পদিন আগে। সবটা মিলিয়ে নাম হয়েছে ময়রা বস্তি।

পিছন ফিরে দীপেন একবার প্রশ্ন করলো, এখানে দুপুরবেলা কাজ ক'রে আবার হোটেলে ফিরে যেতে পারবি ত?

অন্তু ঘাড় নেড়ে জানালো, পারবো।

সামনের মেটে বারান্দায় একদল ছেলেমেয়ে খেতে ব'সে গেছে, আর ওধারে জটলা করছে কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ। দীপেন গিয়ে উঠলো সেখানে—বুঝতে পারা যায় এখানে সে পরিচিত। একজন মোটা-সোটা কৃষ্ণকায়া নথপরা স্ত্রীলোক বললে, ফুলি, বেরিয়ে আয়—জামাইকে বসতে দে'।

থাক্—ব'লে দীপেন নিজেই বাঁশের খুঁটির পাশে উবু হয়ে বসলো। মেয়েরা ওকে দেখে মুখ টিপে হাসাহাসি ক'রে স'রে গেল।

চারদিকের হট্টগোলের মাঝখান থেকে একটি লোক কাছে এসে বললে, বাবাজি, নানা লোকে এবার কিন্তু নানা কথা বলছে। ফুলিকে নিয়ে যাচ্ছ কবে? ও কিন্তু আর এখানে থাকতে চাইছে না। তুমি কি আজও বাড়ীতে কিছু বলোনি?

দীপেন একটু বিরক্ত হয়ে বললে, রোজই আপনাদের ওই এক কথা! বললুম, কাজটা পেলেই আমি আপনার মেয়েকে নিয়ে যাবো, তা আর আপনাদের তর সইছে না। আমাদের ওখানে জায়গা কম—দেখছেন আজকাল বাড়ীঘর পাওয়া কী কঠিন—আমাকে আলাদা ভাড়া ক'রে থাকতে হবে! ওখানে নিয়ে গিয়ে ফেললে আপনার মেয়েরই কষ্ট হবে,—সেটা শ্বশুরবাড়ীর নিন্দে!

হঠাৎ একটি মেয়ে এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বললে, ছ'মাস ধ'রে তুমি ত' এক কথাই বলছ!

দীপেনেরও আজ মেজাজটা ভালো ছিল না। বললে, ভদ্রলোকে এক কথাই ব'লে থাকে। ছ'মাস কেন, চিরজীবন ধ'রেই বলে!

ফুলির বাবা সেখান থেকে উঠে অন্যদিকে চ'লে গেলেন।

ফুলি বললে, বিয়ে করবার সময়ে এসব কথা মনে ছিল না? তখন ত' বাবার কাছে খুব ভ্যালাইপানা করেছিলে। তোমার সব মিথ্যে, আগাগোড়া মিথ্যে! আমাকে কেবল এতদিন ধ'রে ধাপ্পা দিয়ে এসেছ!

হঠাৎ দীপেন অন্তুর দিকে তাকালো। বললে, এ তোর মামী রে! দু'পুর বেলা এখানে থাকবি, ফাইফরমাস খাটবি—তারপর এখানেই খেয়েদেয়ে কাজে চ'লে যাবি।

ছেলেটার সুশ্রী চেহারা দেখে সবাই ওকে ডেকে ঘরে নিয়ে গেল। ফুলি এবার এসে বসলো কাছাকাছি। তারপর বললে, তুমি যে সেদিন বললে, তোমার মা, বোনেরা, তোমার ভাই—সবাই এসে একদিন আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে! কই, তা'রা আসছে না কেন? এখনো বুঝি তাদের কাছে বলোনি?

দীপেন বললে, এবার তা'রা আসবে সবাই।

কবে আসবে? এক বছর ত' হ'তে চললো! এখানে আর বেশীদিন থাকলে আমার মান থাকবে? তুমি যে বলেছিলে, তোমাদের বাড়ীর মোটরে চড়িয়ে আমাকে একদিন বেড়িয়ে আনবে?

ফুলি বাঁকা চোখে স্বামীর দিকে তাকালো। দীপেন বললে, দাঁড়াও, আগে আমি কাজটা নিই, তারপর সব হবে। বাবার অবস্থা এখন ভালো যাচ্ছে না, তিনি নানা গোলমালে আছেন।

ফুলি বললে, কিসের গোলমাল?

বুঝতেই পাচ্ছ, খাজনাপত্র আদায় নেই! প্রজারা আজকাল জমিদারদের মানতে চায় না। তালুকের কাজকর্ম বন্ধ। তুমি সে সব কি বুঝবে?

নাও, ঘরে উঠে এসো। খেয়ে দেয়ে যাবে ত?

দীপেন ভিতরে এসে দাঁড়ালো। বললে, আমি কি শুধু এখানে খেতেই আসি? রোজ রোজ ঝগড়া আর ভালো লাগে না! বিয়ে ক'রেই ত' যত ঝামেলা বাড়লো!

ফুলি বললে, তুমি নাকি তোমার বাড়ীর ভুল ঠিকানা দিয়েছিলে? বাবা বলছিল, সে ঠিকানায় মৃগেন্দ্র চক্রবর্তী ব'লে কেউ থাকে না!

মুখখানা বিকৃত ক'রে গলা নামিয়ে দীপেন বললে, তোমার বাবার বুদ্ধি এর চেয়ে আর কত হবে? ভুল ঠিকানা! যেতে বলেছিল কে সেখানে? বিয়ে করেছি লুকিয়ে, কে না জানে! ঠিক সময়ে গিয়ে সব কথা প্রকাশ করবো, এই ত' ঠিক করেছিলুম! আমাকে না ব'লে যদি তোমরা যাও, তবে দেউড়ির দারোয়ান দেবে গলাধাক্কা,—তখন মান থাকবে কোথায়?

ফুলির চোখে মুখে সুখের স্বপ্ন দপ দপ করে ওঠে। হাসিমুখে সে বলে, বাবার ময়রার দোকান যত বড়ই হোক, তোমাদের মতন ত আর নয়! তোমরা হলে জমিদার, বড়লোক। আচ্ছা, আমার শাশুড়ী আর ননদরা দেখতে খুব সুন্দর, না? কিন্তু আমি এই কেলে-কিস্কিন্ধে চেহারা নিয়ে তাঁদের কাছে কেমন করে গিয়ে দাঁড়াবো?

সে ভাবনা আমার, তোমার নয়। দাও, কি আছে আনো—খেয়ে দেয়ে এখনই আমাকে মুর সাহেবের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে হবে। অমনি ব্যাঙ্কের কাজকর্মও সেরে আসবো।

ফুলি বলে, তুমি যে রাত্তিরে এসে এখানে মধ্যে মাঝে থাকো, তোমার বাড়ীতে কেউ সন্দেহ করে না?

দীপেন এবার একটু হাসলো। বললে, আমরা সাতপুরুষের বনেদী জমিদার! জমিদারের ছেলে রাত্তিরে বাইরে গিয়ে না-থাকলে তাদের বদনাম হয়, তা জানো? যাও, শিগ্‌গির ভাত নিয়ে এসো।

ফুলি পরম যত্নে তাকে থালা সাজিয়ে এনে খেতে দিল। পরম পরিতোষ সহকারে আহারাদি সেরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবার সময় দীপেন হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, পকেটে আমার সবই ব্যাঙ্কের চেক্,—গোটা দুই নগদ টাকা চেয়ে এনে দাও ত?

ফুলি টাকা এনে দিল। পান মুখে দিয়ে পা বাড়াবার আগে দীপেন বললে, বড্ড কাজ, যদি তাড়াতাড়ি সারতে পারি, তবে রাত্রে আসবো।—এই বলে সে হন হন করে বেরিয়ে গেল। স্বামী-গৌরবে গর্বিতা ফুলি শুধু সহাস্যে চেয়ে রইলো।

ছয়

কিছুদিন আগে একবার এসেছিল অতনু। সম্ভবত এটা সে আরেক বার দেখে গেল, গত তিরিশ বছরের মধ্যে ভাস্বতীরা ধীরে ধীরে কোথা থেকে কোথায় চলে এলো! অতি শিশুকাল তার নিজের—যখন প্রথম সে এসেছিল এই পরিবারে। স্বপ্নের মতো মনে পড়ে সুশীলাকে—তার মেজ মাসিমা—মনে পড়ে তাঁর হাতের পরিচ্ছন্ন গৃহসজ্জা—সদ্যস্নান করে তিনি রান্নার আয়োজন করছেন। মনে পড়ছে পুজো-পার্বণের দিন ছোট্ট শুচিশুদ্ধ সংসারটির উপরে আনন্দের উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে, আর গরদের একখানি শাড়ী পরে তরুবালা পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত,—রাশীকৃত তাঁর ঝলমলে চুল পিঠের দিকে এলানো। একটি রঙগীন ফ্রক পরে ভাস্বতী ঘুরছে তাঁর আশেপাশে। সেদিনের সংসার শুধু সুন্দর নয়, তরুণ শিক্ষকের সমস্ত জীবনধারাটাই ছিল অতি পবিত্র, অতি আনন্দময়। সুশীলার মৃত্যুর পর অতনুকে যেদিন সরানো হয়, সেদিন অতনুর কী কান্না!

বস্তির এই নোংরা আবহাওয়ার মধ্যে অতনু আসুক, এটি ভাস্বতীর ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অতনুকে দেখেই ভাস্বতী হেসে ফেলেছিল। সেই হাসি আর সেই সৌজন্য ভাস্বতীকেই মানায়। সমস্ত দারিদ্র্য আর অধঃপতিত জীবনকে সেই হাসি পলকের মধ্যে সুন্দর করে তোলে, স্বভাবের সেই মাধুর্য সমস্ত অপমানিত মানবতাকে পুনরায় মহৎ আনন্দ-উপলব্ধির পথে টেনে আনে। হয়ত অতনু এই মনে করে এসেছিল, ভাস্বতীর ক্ষুণ্ণ আত্মাভিমানকে শান্ত করতে হবে, কিন্তু নিজেই লজ্জা পেয়ে এক সময় সে বিদায় নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় মেসোমশায়ের খোঁজ করলো সে, কিন্তু ভাস্বতীর মুখে শুনলো, এই বুড়ো বয়সে মৃগেন্দ্রকে আবার একটি কুড়ি টাকার গৃহ-শিক্ষকতা নিতে হয়েছে। তিনি সেখানে পড়াতে গেছেন। অতনু খোঁজ নিয়েছিল দ্বিজেনের। কিন্তু দ্বিজেন কোনোদিন বাড়ী আসে, কোনোদিন আসে না। যেদিন আসে, সেদিন চেঁচামেচি করে, দুপুরে খেয়ে ঘুমোয়, আবার বিকালে বেরিয়ে যায়। তারও নাকি অনেক কাজ। সে যে মাঝে মাঝে অতনুর কাছে এবাড়ীর নাম করে টাকা নিয়ে আসে, একথা অতনু কোনোদিন প্রকাশ করেনি।

ওই দ্বিজেনকে নিয়েই সেদিন কথা উঠেছিল। তরুবালা চেঁচিয়ে উঠে বললেন, সন্দেহটা তাহলে আমার ছেলের ওপরেই বলো?

এ ঘর থেকে মৃগেন্দ্র বললেন, সন্দেহ নয়, বিশ্বাস!

তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি থাকো গে! মায়ের আঁচল থেকে ছোট ছেলেও পয়সা নেয়,—তোমার জামার পকেটে কোথায় টাকা আছে, দ্বিজু জানবে কেমন করে? তোমার পয়সাকড়ির খবর যারা রাখে, তাদের ধরো না কেন? তারা যে ঘরের খায়, আর বনের পানে চায়!

অর্থাৎ ভাস্বতী! মায়ের কথায় ভাস্বতী হেসেই খুন। মৃগেন্দ্র বললেন, তোমার একথার মানে কি, ছোট বৌ?

মানে!—তরুবালা আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, মানে—জলের মতন পরিষ্কার! চিরকাল আমি মুখ বুঁজে থেকেছি, এবারে আর রেখে ঢেকে কথা বলবো না।

মৃগেন্দ্র মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলেন। এ মাসের এখনও পনেরো দিন বাকী,—ও মাসের তেসরা-চৌঠা ছাড়া একটি পয়সাও আর হাতে আসবে না। তাঁর যথাসর্বস্ব থাকে হয় পকেটে, না হয় বালিশের তলায়। শীলুকে তাঁর সন্দেহ হয়না, যমুনা প্রায় সব সময়েই আজকাল বিছানায় পড়ে থাকে, দীপেন এঘরে ওঠে না, বরুণা বাইরে বাইরে ঘোরে, অন্তু বাড়ী আসেনা,—তবে?

মৃগেন্দ্র বললেন, দ্বিজু কখন্ ঢুকেছিল ঘরে, মা?

ভাস্বতী বললে, আমি দেখিনি বাবা।

তরুবালা সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, ঘরে বসে সে খেয়ে গেল, আর তুমি ঘরে উঠতে দ্যাখোনি? এসব মিছে কথা কবে থেকে তুই বাপের কানে তুলছিস বল্‌তো, ভাস্বতী?

ভাস্বতী অবাক হয়ে একবার দাঁড়ালো। তরুবালার রুক্ষ চুল, কালিপড়া চোখ, ধিক্কারে আর বিকারে সমস্ত মুখখানার উপরে কেমন একটা বিভীষিকা,—তিনি যেন ভিন্ন মানুষ।

ভাস্বতী শান্তকণ্ঠে বললে, মা—?

না না, মা বলে ডেকোনা আমাকে। পৃথিবীসুদ্ধ সবাই জানে, আমি তোমার মা নই! তোমার মিষ্টি কথার পেছনে ডাইনিপনা লুকিয়ে থাকে, এ আমি অনেকদিন থেকেই দেখে আসছি। আমার ছেলেমেয়েরা চিরকাল তোর দুচোখের বিষ। তুই শুধু বাপের ঘাঁটি আগলে থাকিস, ও খুঁটিটা খুব শক্ত

কিনা—আর আমরা সবাই ঘরের শত্তুর! ওঁর কান তুই ভাঙিয়েছিস, মন ভাঙিয়েছিস,—সেই জন্যে ছেলেমেয়েরা কাছে এলে উনি বিরক্ত হন, আমাকে পর্যন্ত আর উনি বরদাস্ত করেন না! রাস্তার জঞ্জাল ঘরে উঠেছিলি, কিন্তু শেষকালে কি তোর এই মতলব ছিল?

ওধারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে দুজন মেয়েছেলে! কনক জানলায় দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছে। ধীরু মিস্তিরী এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। দাশু বোরেগীর ঘরে মধ্যে মাঝে টং টং করে খোলের আওয়াজ উঠছিল—তরুবালার চীৎকারে তাও থেমে গিয়েছিল। আরো অনেকে আশেপাশে ফিসফাস করছে। ওদের চোখে ভাস্বতী বরাবরই কৌতুকের পাত্রী, কেন না, শত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও সে কথা কয়না, ওকে সবাই জানে আধমরা। ভেতরে পাপ আছে বলেই ওপরটা চিনির মোড়ক দিয়ে ঢাকা।

কান্নার মেয়ে ভাস্বতী নয়। কি জানি কেন কান্নার বদলে তার মুখে ফোটে কেমন যেন বিষণ্ণ হাসি। তাকে ভুল বোঝা অত্যন্তই সহজ। ভাস্বতী এক সময় বললে, তোমাকে শুধু একটা কথা আমি বলতে চাই, মা। বাবার কাছে আমি কখনও মিছে কথা বলিনে!

ভাস্বতী ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বাবা তার স্বপক্ষে একটি কথাও বললেন না, এজন্য কোনো অভিমান নেই তার। বাইরে এসে দাঁড়াতেই জানলা দিয়ে কনক বললে, আমাদের অত হাতটান নেই বাপু। যাদের খাই পরি, তাদের ঘরে সিঁধ কাটিনে।

কনকের কথা শুনে ওধার থেকে একটি স্ত্রীলোক মন্তব্য করলো, বিশ বচ্ছর লোকের বাড়ী বাসন মেজে আসছি, সোনার জিনিস পড়ে থাকলেও মুখ ফিরিয়ে দেখিনে। আচ্ছা, না হয় অন্যায় করে তপিলই ভেঙেছে, ধরা পড়ে এবার ফিরিয়ে দিলেই হয়। থানায় খবর দিলে এখনই সেপাই এসে হাত বাঁধবে, তখন আর মা বলতেও নেই, বাপ বলতেও নেই। গুঁতোর চোটে তখন স্বীকার পাবে।

ভাস্বতী কোনো কথা বললে না, কেবল মাথা হেঁট করে সে কুয়াতলার দিকে চলে গেল। ধীরু মিস্তিরীর ঘরের মেয়েছেলেটা বললে, মান খুইয়ে পরের ঘরে থাকাই বা কেন,—চেহারা আছে, গতর আছে, বয়েস আছে, অন্য উপায় দেখলেই হয়।

কনক বললে, তা কেন গো, মানুষ আছে যে! সেই যে সেদিনকে হোমরা-চোমরা লোকটা এসেছিল—সেই। দেখতে সোনার চাঁদ! তার গলায় মালা দিয়ে চ'লে গেলেই হয়।

অন্য স্ত্রীলোকটি জবাব দিল, তোর যত বেমক্কা কথা, কনকি! জাতজন্ম না জানলে ভদ্দন্নোকের ছেলে বে' করবে কেন, লা?

কোথা থেকে কোথায় যেন কাষ্ঠহাসির স্রোত বয়ে গেল।

তরুবালা হাঁপাচ্ছিলেন। একখানা ময়লা শাড়ীর নীচে তাঁর চেহারাটা দিনে দিনে যে কঙ্কালে পরিণত হয়েছে, অনেকদিন পরে যেন মৃগেন্দ্র আবিষ্কার করলেন। কোটরের মধ্যে দুটো চোখ, গাল দুটো গেছে তুবড়ে—উপবাসে আর দারিদ্র্য-চিন্তায় সেই মুখে দেখা যাচ্ছে জরাজীর্ণ বার্ধক্য। কথা কইলে মনে হয় আর্তকণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসছে মুখগহ্বর থেকে। হাঁপাতে হাঁপাতে তরুবালা বললেন, থালা সাজিয়ে ভাত দিয়ে আসছি আজ পঁচিশ বছরেরও বেশি, কিন্তু ওর মতলবটা কোনোদিন আমরা বুঝতে পেরেছি বলো দিকি? তুমি যদি এর প্রতিকার না করো, আমি নিজে বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবো।

কি প্রতিকার চাও?—মৃগেন্দ্র প্রশ্ন করলেন।

তুমি জানো। পথ থেকে যে কুড়িয়ে এনেছে, সেই জানে এর প্রতিকার! একটা মানুষের খরচ কত, তোমার জানা নেই? ছ'টাকা সাত টাকার কম একখানা শাড়ী হয় না, পুরনো শাড়ী কিনতে গেলেও তিন টাকার কমে নেই। ধরো যদি কেউ একবেলাই খায়, তারও ত খরচ মাসে আট দশ টাকা! তারপর তেল-সাবান, গায়ের জামা, এটা-ওটা,—আমি এত পাবো কোথায়, বলো দিকি? পেটের ছেলেমেয়েরা পথের ভিখিরী হতে বসলো, মেয়ে দুটোর বে'থা হোলো না,—আমি কি পরগাছা খাইয়েই জীবন কাটাবো?

যুক্তিহীনতা কোথাও নেই। মৃগেন্দ্র চুপ করে রইলেন।

তরুবালা বললেন, আমি ত' আজকাল তোমার দু' চোখের বিষ। আমার একটি কথাও তোমার সহ্য হয়না। মনে করে দেখো, তোমার বড় মেয়ে সেবার পিসির মুখের ওপর ঝনাৎ করে পঞ্চাশ টাকা ফেলে দিলে! কোত্থেকে পেলে শুনি? ঘরকন্নার খরচপত্তর তখন তুমিই না বিশ্বাস ক'রে ওর হাতে দিতে? অতনু কা'র সঙ্গে এসে শলা-পরামর্শ করতো? তোমার মাইনের টাকার ওপর কা'দের বেশী দখল ছিল? পথের লোক কা'রা? আমরা যখন বেনেপাড়ায়

ছিলুম, তোমার আদুরে মেয়ে পাড়ায় পাড়ায় ওষুধ বিলোতো, লোকের জামা-কাপড় কিনে দিত পথ্যি-যোগাতো, ইস্তক মড়া পোড়াবার খরচও বইতো,—সে সব টাকা পেতো কোত্থেকে শুনি?

মৃগেন্দ্র বললেন, কেন, অতনু টাকা দিত না?

অতনু!—তরুবালা বিদ্রূপের হাসি হাসলেন বললেন, মাছ ধরতে না পারলে কেউ শুধু-শুধু বঁড়শীর মুখে খাবার দেয়? তোমার এক কথা! আজকাল তবে অতনু দেয় না কেন? বলি, এখানে এসে ভাস্বতীর দান-খয়রাত বন্ধ হোলো কি জন্যে? তোমার যে পেন্সন হয়ে গেছে! তোমার টাকা যে কম! এবার কি বুঝতে পারো, তোমার তপিল ভাঙ্গে কেমন ক'রে? আমার যে মরণ হয়েছিল, তাই তোমার ঘরকন্নায় ঢুকে আমিও কালসাপকে দুধকলা দিয়েছিলুম!

মৃগেন্দ্র বললেন, তুমি কি চাও ভাস্বতী চ'লে যাক্?

তরুবালা বললেন, আমি বলতে যাবো কেন? তোমার ব্যবস্থা তুমিই করবে! আগে ভাতের সঙ্গে নুন জুটতো, এখন নুনই আছে ভাত নেই! উপরি লোককে যে খাওয়াবো, ভাত পাবো কোথায়?

মৃগেন্দ্র মনে মনে কেঁপে উঠলেন। পরে ধরা গলায় বললেন, যে-মেয়েটা চিরকাল আমাদের দুজনকে মা-বাপ ব'লে জেনে এলো, যার কেউ কোথাও নেই,—আজ এক মুঠো ভাত দিতে পাচ্ছিনে ব'লে তা'কে আবার পথে ভাসিয়ে দেবো?

তরুবালা বললেন, ঘরে যার একটি দিনের জন্যেও মন বসলো না, পথের দিকে যার মন প'ড়ে রইলো—ঘরে তা'কে রাখবে কেমন ক'রে?

বাইরে দীপেনের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। রান্নাঘরের দিকে গিয়ে সে হাঁক-ডাক সুরু করেছে।

মৃগেন্দ্র শান্তভাবে বললেন, অতনু ওকে বিয়ে করতে পারতো, কিন্তু তুমি ত' জানো, এ বিয়ে আমিই হ'তে দিইনি! যার পরিচয় কিছু জানিনে, তাকে কুটুম্বের ছেলের হাতে তু'লে দিতে আমি ভরসা পাবো কোত্থেকে?

তরুবালা বললেন, তা'র শোধও নিলে তোমার মেয়ে!

মৃগেন্দ্র মুখ তুললেন। বললেন, শোধ? মানে?

এ জীবনে হাত উপড়ু ক'রে অতনু একটি কানাকড়িও এবাড়ীতে দিলে না! আজও ভাস্বতীর কথায় সে ওঠে-বসে!

তোমার কথা সত্যি নয় ছোট বৌ, মান খোয়াবার ভয়ে আমিই কোনো সাহায্য অতনুর হাত থেকে নিইনি!

ভাস্বতীর জন্যে একটা মাসোহারাও কি সে দিতে পারতো না?

মৃগেন্দ্র বললেন, কোন্ সুবাদে দেবে?

কোন্ সুবাদে তুমি পথের মেয়ে কুড়িয়ে ঘরে তুলেছিলে?

তুমি কি বলতে চাও মানের চেয়ে প্রাণটাই বড়?

একশোবার বলি—তরুবালা বললেন, যার ভাত নেই ঘরে, তার আবার মান কিসের? টাকা না থাকলে মানও বাঁচে না, আর টাকা যদি থাকে, তবে অনেক অপমানকেই ঢেকে দেওয়া যায়। আগে বাঁচি, তারপর বুঝবো মান-অপমানের কথা! ওই ত' এসেছে তোমার বড় ছেলে, ভাত না পেলে এখনই মুখখিস্তি করবে! থালা ভরে কি ছাই খেতে দেবো? পুরুষ মানুষের অনেক উপায় আছে, মেয়েমানুষের নেই! পেটের দায়ে মেয়েমানুষ যদি মান খোয়ায়, দোষ দেবে তুমি? না খেয়ে মরলে মান বাঁচবে কতটুকু?

তরুবালা উঠে বাইরে চ'লে গেলেন। তাঁর চোখ দুটো যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল কোনো একটা আত্মগ্লানিতে। তিনি নিজের মনে যেন একটা জোর পেতে চান্, কোনো একটা যুক্তি খুঁজে বা'র করতে চান। শেষের কথাগুলি তিনি যেন নিজেকেই শোনাচ্ছিলেন।

কুয়াতলায় স্নানে নেমেছিল দীপেন। সেখান থেকে চেঁচিয়ে বললে, শিগ্গির ভাত বাড়ো, এক্ষুণি বেরোতে হবে।

ফিরে দাঁড়িয়ে তরুবালা বললেন, কোন্ চুলোয় যাওয়া হবে শুনি? ভাত আসে কোত্থেকে?

দীপেন বললে, কেন, ভাতের খরচ আজকাল ত' কম! তোমার ছোট মেয়ে বেরিয়ে যায় সকালে, মেজ মেয়ের অসুখ, তোমার নিজের পেটে জল বার্লি তলায় না—এখন আর ভাতের ভাবনা কি?—এই ব'লে এদিক ওদিক তাকিয়ে পুনরায় বললে, দেবী দ্রৌপদী গেলেন কোথায়? তাঁর দর্শন আজ মিলছে না যে?

তরুবালা কিছু না ব'লে চলে গেলেন। কিন্তু তারপরই ঘর থেকে বেরিয়ে

এলো ভাস্বতী। তাকে দেখামাত্র দীপেন আনন্দে হৈ চৈ করে উঠলো। বললে, রাশভারি লোক বটে তুমি বাপু। পৃথিবীর সবাই আধপেটা খেয়ে চিঁ চিঁ করছে, আর তোমার চেহারার খোল্‌তাই হচ্ছে দিন দিন। লোকে ভাতের বদলে জল খাচ্ছে, আর তুমি ডুবে-ডুবে জল খাচ্ছ—কেমন? ব্যাপার কি, আজ বুঝি দ্রৌপদীর ধর্মঘট? হাঁড়িতে শাকান্নও লেগে নেই?

ভব্যতালেশহীন এই অমানুষটার প্রশ্নের উত্তরে কোনো জবাব আজ ভাস্বতীর মুখে এলোনা। শুধু বললে, আমি আজ রাঁধিনি, মা রান্না করেছেন।

তা ত' জানি। মায়ের ঘাড়েই ত' সব। তুমি যে শুধু পরের খাবে তাই নয়, পরের পরিশ্রমেও খাবে! বাসন মাজার ঠিক আগে আজকাল কোমর ব্যথা করে না?

কনকের ঘরের দিক থেকে একটা চাপা হাসির গড়ানো শব্দ শোনা গেল। ভাস্বতী গম্ভীর মুখে সেখান থেকে স'রে গেলো।

দীপেন সোরগোল তুলে বোধ হয় আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বস্তির গলিতে একটা গোলমাল শোনা গেল। রান্নাঘরের ভিতরে সম্ভবত তরুবালা কুমড়ো-সিদ্ধর সঙ্গে ভাত বাড়ছিলেন, সেই সময় দূর থেকে অন্তু ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হোলো। চেঁচিয়ে বললে, বড়মামা, ও বড়মামা,—মামী এসেছে দ্যাখো!

মামী! চোপ রও, শুয়োর! দীপেন হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো। হাতের কাছে সেই মুহূর্তে তরবারি থাকলে সে ওই বালকের মুণ্ডটা তখনই কেটে নিতে পারতো!

বস্তির চারদিকের লোক ভিড় করে এসেছে, আর তাদেরই মাঝখান দিয়ে মাথায় চওড়া সিঁদুর পরে রাঙ্গা চেলী জড়িয়ে ফুলি এসে দাঁড়ালো হাসিমুখে। পিছনে পিছনে আসছে আরেকটি লোক আহ্লাদে আটখানা হয়ে। চেঁচিয়ে বলছে, কই বেহাই আর বেয়ান কই? আমরা নতুন কুটুম্ব। পেট ভ'রে সন্দেশ না খেয়ে এখান থেকে আর এক পাও নড়ছিনে। মেয়েটা বললে, বাবা, আজ শুভদিন, আজই আমি যাবো শ্বশুরবাড়ী, তুমি ব্যবস্থা করো! ওই ভাগ্নেই ত' পথ চিনিয়ে আনলো!

অন্তু পালিয়েছে কোন্ সুড়ঙ্গপথে, কিংবা হয়ত সে দোকানেই ফিরে

গেছে। লোকটা খুব হেসে আবার বললে, মেয়ে বলে কিনা, বাবা, তুমি চিনতে পারবেনা আমার শ্বশুর-বাড়ী! আমি পুঁটে ময়রার ছেলে সুঁটে ময়রা,—কলকেতার হাড়হদ্দ আমি জানিনে? এই যে দীনেন, তোমার বুঝি এখনও খাওয়া-দাওয়া হয়নি, বাবাজি?

আমার নাম দীনেন নয়, দীপেন।

দীপেন! সে কি বাবাজি?

দীপেন বললে, হ্যাঁ, দীপেন! ময়রাদের ঘরে বিয়ে করতে গেলে লোকে জাত ভাঁড়ায়, আমি শুধু নামটা ভাঁড়িয়েছিলুম!

মৃগেন্দ্র ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পাশে তরুবালা। অসুস্থ যমুনা গায়ে জর নিয়ে বেরিয়ে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছে। অদূরে ভাস্বতী দাঁড়িয়ে একেবারে হতবুদ্ধি। কনক, ধীরু মিস্তিরী, দীনু বোরেগী, ক্ষান্তর ঘরের ঝিয়ের দল, কেউ আর বাকী নেই। ফুলি এবার বিব্রত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। ওদিকে নর্দমার ধারের গলিতে দাঁড়িয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে যত রাজ্যের মেয়েছেলে!

হঠাৎ দীপেন বলে উঠলো, ব্যস, ঠিক আছে! নতুন বউ এসেছে শ্বশুর-বাড়ী, তাকে ঘরে তুলতে হবে বৈ কি।

মৃগেন্দ্র গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, না, বউ নয়, একে আমি বিয়ে বলবো না। এসব ধাপ্পাবাজি আমার ঘরে চলবে না!

সুঁটে ময়রা চেঁচিয়ে হেসে উঠলো। বললে, সে কি বেয়াই, এত বড় জমিদার আপনারা, এত বড় রাজবাড়ী, দেউড়িতে দারোয়ান, হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া—আপনাদের এখানে একটি গরীবের মেয়ের জায়গা হবে না? বিলক্ষণ!

এটা বিয়ে নয়! এটা জোচ্চুরি, জালিয়াতি!—মৃগেন্দ্র চীৎকার করে উঠলেন।

হা হা হা হা—সুঁটে ময়রা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। বললে, কলকেতার হাড়হদ্দ জানি বেয়াই, তাই জন্যে বিয়েটাকে রেজেষ্টারী করিয়ে নিয়েছি, নইলে জাল-জোচ্চুরিতে হয়ত আমিই প'ড়ে যেতুম। কিন্তু আর উপায় নেই দাদা, বউটিকে ঘরে নিতে হবে!

মৃগেন্দ্র ঠকঠক ক'রে কাঁপছিলেন। বললেন, রেজেষ্টারী! দুখানা

কাগজ! দুটো মিথ্যে সাক্ষী? ওরই জোরে আজ এই আস্তাকুঁড়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে এসেছ? ময়রার মেয়ে ঘরে এনে বামুনের ঘর নষ্ট করবো? এখান থেকে চলে যাও বলছি নইলে এখুনি গলাধাক্কা দেবো!—চোখ দিয়ে তাঁর আগুন ঠিক্‌রে আসছিল।

তরুবালা বললেন, আমার ছেলেকে বুঝি কায়দায় ফেলে দড়ি দিয়ে বেঁধেছ? বিয়ে না ছাই! আধ পয়সার সিঁদুর মাখিয়ে জোর করে ঘর দখল করতে এসেছ? ওই সিঁদুর পাঁক দিয়ে মুছিয়ে দেবো!

মৃগেন্দ্র বললেন, দূর হয়ে যাও—নইলে, এখুনি আমি পুলিশ ডাকবো!

দীপেন এতক্ষণ পরে মাথা তুললো। বললে, পুলিশ ডাকবে কেন, বাবা? আমি বিয়ে করেছি, চুরি ত' করিনি!

চোপ রও!

পুনরায় দীপেন বললে, আমি চুপ করলেই কি বিয়েটা উল্টে যাবে? না হয় ময়রার মেয়ে, না হয় দেখতে কালপেঁচি—কিন্তু মেয়ে ত! জাত নিয়ে কী হবে,—ময়রা মানুষ নয়?

তুই ফের কথা বললে এখনই জুতিয়ে মুখ ভেঙেগ দেবো!—মৃগেন্দ্র রক্ত-চক্ষে চীৎকার করলেন।

দীপেন বললে, মুখ না হয় আমার ভাঙগবে, বিয়েটা কি ভাঙগবে? বিয়ে করেছি আমি, আর ত' কেউ নয়। আমিই দায়িত্ব নেবো! বেশ, ভালো, এখানে জায়গা না পাই, অন্য বস্তি আছে। আমি বামুনের ছেলে, সেটা ত' অ্যাক্‌সিডেণ্ট্‌! ওই যে এ-বাড়ীর আদুরে মেয়ে দাঁড়িয়ে, ও কোন্‌ জাত? ও যে ধোপা-নাপতের মেয়ে নয়—তার প্রমাণ কি? আপনার ঠাকুরদাদা যে নিশ্চিন্ত মদন চক্কোত্তি ছিল, তা'রো কি কোনো নির্ভুল প্রমাণ আছে? এই যে বস্তির এত লোকজন,—এরা কি কখনও জাত নিয়ে বড়াই করে? এই যে দীনু বোরেগী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করছে, ওর জাত হারিয়েছে বলেই ত' বোষ্টম! ওই যে শ্রীমতী কনকলতা বর্ধমান থেকে এক মুদিকে ধ'রে পালিয়ে এসেছে, মুদি ব'লে ত' তার দাম কমেনি! ওই যে ওঘরে একদল ঝি,—ওদের অনেকের বাপ হয়ত বামুন-কায়েত, ওরা কি তাদের জাতের খোঁজ রাখতে গেছে? ময়রার হাতের খাবার যদি মিষ্টি লাগে, ময়রানিকে মিষ্টি লাগবেনা কেন?

যমুনা বারান্দার ওপর থেকে নেমে এলো। তারপর ফুলির হাত ধরে বললে, এসো ভাই, আমার সঙ্গে ঘরে এসো!

সুটে ময়রা হো হো ক'রে হাসতে লাগলো। দেখতে দেখতে পিছন থেকে নববধূর বাক্স প্যাঁটরা বিছানা ও ঘরবসতি জিনিসপত্র একে একে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান ভিতরে এনে বারান্দার ওপর তুলে রাখতে লাগলো।

তরুবালা মৃগেন্দ্রকে টেনে ভিতরে নিয়ে গেলেন। ভাস্বতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখনও কাঁপছিল, কিন্তু তাকেই উদ্দেশ ক'রে সুটে ময়রা বললে, জিনিসপত্তর সব বুঝিয়ে দিয়ে গেলুম। ফুলির হাতে কয়েকটা নমস্কারী টাকাও রইলো। যদি আপনাদের হুকুম হয়, তাহলে আজকের মতন আসি। পেট ভ'রে সন্দেশ এ-যাত্রায় আর খাওয়া হোলো না! তবে ফুলির শ্বশুরবাড়ীর যে-চেহারা দেখে গেলুম, মনে হচ্ছে মধ্যে মাঝে সন্দেশ আমাকেই পাঠাতে হবে।

তরুবালা ফস ক'রে বেরিয়ে এলেন। বললেন, এ বিয়ে আমরা মানবোও না, তোমার মেয়ের ভারও আমরা নিতে পারবো না! একথা তুমি ভালো ক'রে জেনে যাও।

সুটে ময়রা বেশ শক্ত লোক মনে হচ্ছে। তরুবালার কথার উত্তরে সে বললে, বেয়ান, আজকালকার দিনে মা-বাপের ভরসায় কেউ বিয়ে করে না! বিয়ে যারা করেছে, তাদের ভার তারাই বইবে! আপনি আমি কে বলুন?

তরুবালা বললেন, ময়রার দোকানে খেতে গিয়ে ভাব হয়েছিল, এইত? রাস্তা থেকে ছেলে ডেকে ঘরে নিয়ে যেতো তোমার মেয়ে,—অমন মেয়ের গলা টিপে মারতে পারো নি?

সুটে ময়রা আবার হাসলো। বললে, বেয়ান, আপনাদের দুজনের মাথা ঠাণ্ডা হোক, আরেকদিন এসে গল্প করবো। কি বাবাজি, ঘটনার কথাগুলো একে একে সব এখনই বলে যাবো নাকি?

দীপেন রাগে গুম হয়ে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালো। সুটে ময়রা আর কিছু না ব'লে এদিক ওদিক তাকিয়ে যাবার উদ্যোগ করলো। একসময় পুনরায় বললে, শুনুন, থানা-পুলিশ করলে বিশেষ কিছু সুবিধে হবে না। আপনাদের আশীর্বাদে দশবিশটে মামলা আমিও লড়েছি। আর এ নিয়ে যদি মামলা বাধে, তবে আপনাদের এই জমিদারি বেচলেও মামলার খরচ উঠবে না!

তার চেয়ে এক কাজ করুন। কিছু টাকা আমার কাছে ধার নিন, দীপেন এ পাড়ায় এক ময়রার দোকান দিক, তাতে ব্যবসাও হবে, সকলের পেটও চলবে!

সুটে ময়রা হাসিমুখে সেদিনের মতো বিদায় নিল। সমগ্র পরিবারটি অপমানের কালি মুখে মেখে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

ওবছরটা ঘুরে গিয়ে নতুন বছরেরও তিন মাস পেরিয়ে গেছে। গত বসন্তের কচি পাতাও পুরনো হয়ে এলো। এখন ভরা বর্ষা।

কিন্তু বৃষ্টির দিনে কলকাতার কোথায় কোথায় মাথা বাঁচিয়ে দাঁড়ানো যায়, এটি বরুণার মুখস্থ হয়ে গেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যার দিকে সুশান্তকে নিয়ে কোথায় গিয়ে বসতে হবে এবং বৃষ্টি পড়বামাত্র কাছাকাছি কোথায় গিয়ে ঠাঁই নেওয়া যাবে, তাও নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

সেদিন বরুণা বেঁকে বসলো। কলকাতায় তিন-চার মাস বর্ষা থাকে, আর প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি পড়লেই ওই বাগানবাড়ীর দারোয়ানের ঘরে ঢুকে অতক্ষণ দাঁড়াতে হবে—এ কেমন কথা? হলোই বা হিন্দুস্থানী, ওরা কি বোঝে না, আমরা দু'জনে কেন একলা আসি, কেনই বা একলা থাকি? এই যে আলোটা বাঁচিয়ে অন্ধকার বাগানের বেঞ্চিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেকার ব'সে থাকা,—ওরা কি বোঝে না? ওরা যে খৈনি টিপতে টিপতে মুখ টিপে হাসে, —ও হাসির মানে কি এতই দুর্বোধ্য? অনেক বোকা আছে আমাদের দেশে, যারা অবাঙালীকে বোকা মনে করে। আজ যদি বৃষ্টি আসে, তবে এখানেই গাছতলায় ব'সে ভিজবো, কিন্তু কিছুতেই ওদের ঘরে গিয়ে ঢুকবো না। দুর্গতির আর বাকি কি!

বাঁকা চোখে অন্ধকারে তাকিয়ে সুশান্ত বললে, ক'দিন ধ'রেই তুমি রেগে আছ মনে হচ্ছে, না বরুণা?

বরুণা কথার জবাব দিল না। অন্ধকারে গাছের উপরে বোধ হয় একটা কাক ডানা-ঝাড়া দিল, দু'এক ফোঁটা জল লাগলো তাদের মুখে চোখে। ভিজা বেঞ্চের উপরে ব'সে বরুণা মুখ তু'লে চেয়ে দেখলো, শ্রাবণের আকাশ কিছুটা স্বচ্ছ। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে বসে রইলো।

মেয়েদের অস্বস্তিটা আত্মগত; ভেতরে তাদের ঝড়—কিন্তু বাইরেটা চুপ। ওদিকে পাশে ব'সে সুশান্ত উসখুস করছিল। বাগানটা পেরোলে পূবদিকে

নিরিবিলি বড় রাস্তা। মাঝে মাঝে সেখান দিয়ে মোটর পেরিয়ে যাচ্ছে। শ্রাবণের সন্ধ্যার পরে সাধারণ বায়ুসেবীরা এদিকে আসে কম; ছাতি মাথায় দিয়ে কোনো কোনো অম্লরোগী নিতান্ত হজমের দায়ে এক আধবার ঘুরে যায় মাত্র। নইলে জল-ছপছপে ভিজা বাগানটি প্রায় জনহীন।

বরুণা? কথা বলছ না যে?

বরুণা মুখ ফিরিয়ে বললে, মিষ্টি ক'রে ডাকলে ত' আর আমার দুঃখু ঘুচবে না?

সুশান্ত বললে, তোমার দুঃখু কি আমারও দুঃখু নয়?

বরুণার গলার মধ্যে আজ কেমন যেন জ্বালা ধরেছিল। তৎক্ষণাৎ বললে, না। ছ'মাস আগেও একথা বিশ্বাস করতুম, এখন আর করিনে! গোড়া থেকেই আমার ভুল হয়েছিল!

সুশান্ত ঢোক গিলে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিল। তারপর বললে, কিসের ভুল বলো ত?

বরুণা চুপ ক'রে রইলো অনেকক্ষণ, তারপর একসময়ে বললে, তুমিই ত' বলেছিলে একমাসের চেষ্টায় আমি ভালো কাজ পেয়ে যাবো! এক মাস দূরের কথা, এক বছর হতে আর ক'দিন বাকি? তোমার ওপর নির্ভর করেই ত' মাকে আমি কথা দিয়েছিলুম! তুমি যদি নিজেও একটা মোটর চালাবার কাজ নিতে পারতে, তা'হলেও একটা উপায় হতো!

আমি কি তার চেষ্টা করছিনে, বরুণা? তুমি ত' দেখছ আমার মামা কী নিন্দে আমার নামে রটিয়ে রেখেছে! কোথাও আমি আমল পাচ্ছিনে! পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইলুম, তবু ওই শয়তানের বাচ্চা আমার ওপর খুশী হোলো না! ওকে যদি আমি শিক্ষা দিতে না পারি, তবে বাপের নাম বদ্‌লে রেখে দেবো!

থাক্, বীরত্ব দেখিয়ে আর কাজ নেই!—বরুণা বললে, ওকে শিক্ষা দেবার আগে তোমারই শিক্ষা পাওয়া দরকার। বিনা লাইসেন্সে তুমি গাড়ী বার করে নিয়ে যেতে, তুমি যে পুলিশের হাতে শিক্ষা পাওনি, এই খুব।

সুশান্ত অভিমান প্রকাশ করে বললে, পেলে ভালোই হোতো। তাহলে আজ এমন করে তোমার কাছে গালমন্দ খেতে হোতো না!

বরুণার দিক থেকে কোনো জবাব এলো না।

ভিজা বেঞ্চের দাগ লাগছে বোধহয় শাড়ীখানায়—কাল আবার ওই শাড়ীতে

সাবান ঘষতে হবে। দু'আনার সাবানের জন্য সে হাত পাতবে ওই কনকের মানুষটার কাছে। ওর দোকানে গত মাসের দরুণ এখনও বাকী প্রায় দেড়টাকা। শীলু তা'র মাথার তেল চুরি ক'রে মেখে প্রায় শেষ করেছে। দাদার ওই ময়রা-বৌয়ের কাছে কিছু চাইতে গেলে এমনভাবে তাকায় যে, মানসম্ভ্রম থাকে না। মায়ের কাছে আবার দু'টাকা ধার হয়েছে,—ওটাকা নাকি শীলু জমিয়েছিল! কানের গয়না দিয়েছিল সুশান্ত, কিন্তু কলকাতার পথঘাটের ভয় দেখিয়ে সে নিজেই আবার ফিরিয়ে নিয়েছে। নিঃসন্দেহ সে গয়নাটা বিক্রী করে টাকা উড়িয়েছে। পায়ের একজোড়া চটি কেনা হয়েছিল এক টাকা চার আনায়,—জুতো-সেলাইয়ের দোকানের পুরনো জিনিস! কোনোমতে আজও চলছে বটে। ধুলোর সময় পায়ে এক পা ধুলো, আর বৃষ্টি পড়লেই পিছন দিকটা কাদার ছিটেয় ভরা!

হঠাৎ বরুণা ব'লে উঠলো, ওসব কথা এখন আর আমার ভালো লাগে না!

সুশান্ত বললে, এই বড়লোক বেটাদের আমি একদিন জব্দ করবো! তুমি দেখে নিয়ো বরুণা, মোটর আমি কিনবোই একদিন, আর সেইদিন ওই মামা-বেটাকে গাড়ীর তলায় চাপা দেবো!

কল্পনাটা দুঃসাহসিক বটে। কিন্তু এসব কথায় আগে কৌতুক পাওয়া যেতো, এখন আসে বিরক্তি। বরুণা বললে, হয়েছে, থামো। তার আগে হাঁটতে হাঁটতে নিজে গাড়ীচাপা পড়বে কিনা তাই ভাবো। তোমার দৌড় ত' ওইটুকু। ক্ষমতার বড়াই শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

সুশান্ত একটু থামলো। তারপর বললে, তুমি আমাকে আজো চিনতে পারোনি, বরুণা!

পলকের জন্য বরুণা মুখ ফিরালো। তারপর অন্যদিকে আবার ফিরে বললে, চিনবো না কেন! চিনতে চিনতেই ত' এক বছর কাটলো।

সুশান্ত বললে, আমি কি তোমার জন্যে চেষ্টা করছিনে? তোমার সঙ্গে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিনে?

তুমি কি আমার ভালোর জন্যে ঘুরছো?—বরুণা ফিরে বসলো, তুমি ঘুরছো তোমার নিজের মতলবে!

নিজের মতলব মানে!

সে তুমিই জানো! আমি ওদিকে বাড়ীতে মুখ দেখাতে পাচ্ছিনে,—রাত্তিরে গিয়ে ঢুকি, সকালে পালিয়ে আসি। মাকে আমি কি বলে বোঝাই রোজ রোজ? বাবার কাছে মুখ দেখাই কেমন করে? তুমি মিথ্যে কথা শিখিয়ে দাও, আর আমাকে সেগুলো বলতে হয় দিনের পর দিন! চাকরি করি সবাই জানে, অথচ মাইনের টাকা দেখে না কেউ! মাঝে মাঝে যদি কিছু টাকা মায়ের হাতে দিতে পারতুম, তাহলেও মান থাকতো।—বলতে বলতে বরুণার গলা ধ'রে এলো।

আজকের সন্ধ্যাটা একেবারেই মাটি। সুশান্ত চুপ ক'রে রইলো। কিন্তু অনুশোচনা আর বিক্ষোভটা আজ প্রকাশ না করলেই বরুণার চলবে না। গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে সে পুনরায় বললে, তোমার কোনো ক্ষমতা নেই, একি আগে আমি জানতুম? তোমার নিজের চালচুলো নেই, মামাও দিয়েছে তাড়িয়ে, পেটে এক কলম বিদ্যে নেই,—অথচ তোমাকেই আমি বিশ্বাস করেছিলুম! তার ফল কি হলো?

সুশান্ত বললে, কি হোলো বলো?

বরুণা আজ থামতে চাইলো না। বললে, তার ফল হোলো রোজ সকালে পোড়ার মুখে পাউডার ঘ'ষে ঘর থেকে বেরিয়ে আসা, ছেঁড়াকাপড় ঘুরিয়ে প'রে পথে পথে ঘোরা, চা খেয়ে বেড়ানো দোকানে দোকানে, অবেলায় কোনো পথের আড়ালে দাঁড়িয়ে দু'খানা কচুরি গেলা, আর নয়ত জন্তুর মতন কার্জন পার্কের বেঞ্চিতে গিয়ে ব'সে হাঁপানো। এ ছাড়া এক বছরে আর কি উন্নতি হয়েছে, বলতে পারো?

কিন্তু আমার মামা যদি ভালো হোতো?

রাখো তোমার মামা!—বরুণা বললে, একশোবার মামার কথা আমাকে শুনিয়ো না! লঙ্কায় সোনা আছে, আমার কি? তুমি তা'র মোটরের কল-কব্জা খু'লে বেচতে গিয়ে ধরা পড়েছিলে, এই ত' তোমার কীর্তি! তুমি আবার লোকসমাজে মুখ দেখাও?

ফস্ ক'রে সুশান্ত এবার জ্বলে উঠলো, আজকাল চুরি করলেই চোর হয় না, তা জানো? আমার নেই, আমার অভাব, আমি খেতে পাচ্ছিনে, আমার দাবি মিটছে না,—তখন যদি মা ব'লে কিছু বের করে আনি, তাকে চুরি বলবে? না খেয়ে মরতে বসেছি, ভিক্ষে জুটছে না, —তখন যদি কিছু ছিনিয়ে আনি

কোথাও থেকে, তাকে কি ডাকাতি বলবে? মামা কত বড় চোর, জানো তুমি? কত লোককে ঠকিয়ে টাকা করেছে, কত বড় চোরাবাজারের চাঁই,—তুমি জানো?

বরুণা বললে, চুপ করো, তোমার চোখমুখ দেখলে ভয় করে! মামাকে দেখিনি,—কিন্তু তোমার চোখমুখ দেখেই মামাকে চিনছি! মামাকে দেখলে তোমাকে হয়ত আরো বেশী ক'রে চিনতে পারতুম।

তুমি যতই ঠাট্টা করো, আমার মত বদলাবে না। আমি দেখে নেবো সবাইকে।—সুশান্ত বলতে লাগলো, আমি কি প্রাণের মায়া করি? একটুও না! পেটেই না হয় বিদ্যে নেই, তা ব'লে আমি কি লেখাপড়া শিখতে পারতুম না? ভালো কাজ করতে পারতুম না? শুধু তোমার জন্যেই আমি মাথা হেঁট ক'রে আছি,—তোমার একটা উপায় হলেই—ব্যস, আমি তখন আর কারো পরোয়া করবো না!

কোন্ দেশ জয় করতে ছুটবে?

ততদিনে যদি আবার যুদ্ধ বাধে, তবে যুদ্ধেই চলো যাবো? আর কোনো-দিন তোমাকে বিরক্ত করতে আসবো না!

বরুণা এবার এই অর্বাচীনের দিকে তাকিয়ে না হেসে থাকতে পারলো না। কিন্তু এতক্ষণ পরে তার মুখে হাসি দেখামাত্রই সুশান্ত হঠাৎ যেন আস্কারা পেয়ে গেল। কাছ ঘেঁষে এসে বললে, বরুণা, রোজ রোজ শুধু আমাদের কচকচি চলছে কেন?

বরুণা বললে, এর হেস্তনেস্ত করলেই হয়। আমিও আর এজন্য আসতে চাইনে!

আসবে না? তাহলে তোমার সঙ্গে কি আর দেখাও হবে না?

দেখা হয়ে লাভ কি?

কিন্তু তোমাকে না দেখলে আমার যে সব মিথ্যে মনে হবে?

বরুণা কতক্ষণ চুপ ক'রে থাকলো। তারুণ্যের এই আবেদন যেখানে গিয়ে পৌঁছয়, সেখানে বরুণা সচেতন বৈ কি। সমস্ত কাঠিন্য আর বাঁধন পেরিয়ে সেই আবেদন যেন মর্মলোকে এসে কাঁপন ধরায়। সমস্ত নৈরাশ্য আর হতাশা সত্ত্বেও পরিশ্রান্ত শরীর সেই কাঁপনে যেন শিথিল হয়ে আসে।

বরুণা? জবাব দিচ্ছ না যে?

বরুণা ধীরে ধীরে বললে, যা ভেবেছিলুম, তার কোনোটাই হোলো না।

এমনি ক'রে চলবে আর কদ্দিন? লোকে দেখছে না? তাদের চোখ-কান নেই? রোজ রোজ আসা, আর শুক্‌নো মুখে ফিরে যাওয়া—এ কি ভালো লাগে? এরপর দুজনে আর দেখাশোনা না হওয়াই ভালো। এর পর ছাড়তে গেলে দু'জনেরই ত' কষ্ট হবে! আমার কপালে যাই থাক্‌, তুমি নিজের পথে নিজে চ'লে যাও। আমরা গরীব, গরীবের ঘরের মেয়ে হয়ে অত সুখের কথা আমার ভাবা উচিত হয়নি!—বরুণার গলা বুজে এলো।

সুশান্ত বললে, আমার জন্যে তোমার একটুও মন খারাপ হবে না?

হবে কি না, সে ত' আর তুমি দেখতে যাবে না! যাদের দুঃখকষ্ট করে পেট চালাতে হবে, তাদের মনের কথা কেই বা জানতে চায়!

বরুণা এবার উঠে দাঁড়ালো। বাজে বিতর্ক সে আর বাড়াতে চায় না। কিন্তু একসময় সে নিজেই আবার বললে, তোমার শিক্ষা আমার ওপর দিয়েই যেন শেষ হয়! আর কাউকে যেন তুমি এরকম লোভ দেখিয়ো না! তোমার সব কথা আমি রেখেছি, যা বলেছ তাই মেনে নিয়েছি। তোমার কথাতে বিশ্বাস করেছিলুম বলেই তুমি সেবার আমাকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলে!

সুশান্ত বললে, সে ত' গেল বছরের কথা, বরুণা! আমি বুঝি তোমাকে শুধু ধাপ্পাই দিয়ে এসেছি! শুধু কি আমার দোষ? তোমার নিজের মনে আনন্দ ছিল না?

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বরুণা বললে, ছিল। তোমাকে বুঝতে পারিনি বলেই বোকার মতন ভেঙে পড়েছিলুম, মাতামাতি করেছিলুম। যাক্‌, এবারে সব শেষ হোক্‌। অনেক ক্ষতি আমার হয়েছে, কিন্তু তোমার হাত থেকে মুক্তি পেলুম!

আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে বাঁ হাতে ছেঁড়া ও শূন্য ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে বরুণা অগ্রসর হোলো। সুশান্ত পায়ে পায়ে তার পিছু পিছু চললো।

ওরা দুজনে এসে পড়লো বড় রাস্তার ওপর। এ রাস্তায় বাস চলে, কিন্তু এক একখানা আসে অনেক দেরিতে। বরুণাকে কতদূর যেতে হবে জানা আছে, কিন্তু সুশান্তর গন্তব্যস্থলের কথাটা প্রত্যেক দিনের মতো আজও চাপা থাকে। প্রথম-প্রথম বরুণা জানতে চেয়েছিল, কিন্তু সুশান্তর জবাবটা কোনোকালেই তেমন স্পষ্ট নয়। সুতরাং ওটা নিয়ে বরুণা আর মাথা ঘামায়নি।

চৌমাথার মোড়ে এসে একবার দুজনেই থামলো; দুজনকেই এবার ভিন্ন পথে যেতে হবে। কিন্তু মেঘ ডেকেছিল আগে, এবার টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি

নেমে এলো। সুশান্ত বললে, চলেই ত' যাবে, কিন্তু বৃষ্টিতে কাপড়খানা ভিজিয়ে যাবে কেন? এসো না, এই হোটেলে একখানা কেক্ খেয়ে যাই।

বরুণার চোখ দুটো রাঙগা, মুখখানা শ্রাবণের আকাশের মতোই থমথমে। ফিরে দাঁড়িয়ে সে সুশান্তর কথার কোনো জবাব দিল না, শুধু বৃষ্টি বাঁচিয়ে নিঃশব্দে হোটেলের উপরে উঠে এলো।

কথা কিছু নেই, শুধু চুপ ক'রে ধীরে ধীরে খেয়ে যাওয়া। আজকের পরে আর দেখা না হোক, কিন্তু ক্ষুধার তৃপ্তি হোক। আত্মসম্ভ্রমবোধের কথা এখানে ওঠে না, রুচিজ্ঞানের কথাটাও এখানে বেমানান—কেন না, সারাদিনের ক্ষুধার প্রশ্নটাই এখানে অনেক বড়। মান-অসম্মান কদাচার চিত্তবিক্ষোভ আত্ম-গ্লানি—ওদের একপাশে ক্ষণকালের জন্য সরিয়ে রেখে ক্ষুধাকে শান্ত ক'রে নিতে হয় বৈ কি।

সুশান্ত একসময় জল চাইলো। বরুণা বাধা দিয়ে বললে, জল পরে খাবো, আরেকখানা কেক্ দিতে বলো।

খুশী হয়ে সুশান্ত আবার কেক্ আনতে বললো। কেক্ এলো। সুশান্ত চেয়ে দেখলো, নতমুখে সেখানার ওপর কামড় দিতে গিয়ে বরুণার চোখের জল গড়িয়ে কেকখানার ওপর শুষে যাচ্ছে! সুশান্ত মুখ ফেরালো এবং মুখের ভাবকে গোপন করার জন্য তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বিড়ি ও দেশলাই বার করে ধরালো।

হোটেল থেকে ওরা নেমে এলো, বৃষ্টি তখনও পড়ছে অল্প অল্প। ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ পিছন থেকে ডাক এলো, এই সুশান্ত—?

সুশান্ত মুখ ফিরিয়ে দেখলো, তা'র বন্ধু পল্টু সেন। পিছনে আরো দুটি লোক,—একখানা ট্যাক্সি এসে থেমেছে ওদের সঙ্গে। সুশান্ত বললে, এখানে কোথায়?

হোটেল থেকে খাবার কিনতে এসেছি রে, এই গাড়ীতেই যাবো। মেয়েটা কে রে সঙ্গে?—পল্টু সাগ্রহে জানতে চাইলো। সঙ্গী দুজন দোকানে গিয়ে উঠলো।

সুশান্ত বললে, চিনলিনে? এ যে দ্বিজুর ছোট বোন! আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল, এবার ফির্ছি।

পল্টু একবার আপাদমস্তক বরুণার দিকে তাকালো। মলিন রুক্ষ চেহারা,

দারিদ্র্যের দাগ সর্বাঙ্গে, নিরাভরণা, সজ্জাটা অতি জীর্ণ। হঠাৎ সে খুশী মুখে বললে, দ্বিজুর বোন? নমস্কার! এই হতভাগা বুঝি আপনাকে খুব ঘুরিয়েছে?

বরুণা বললে, না, তেমন কিছু না। এবার ফিরবো।

সুশান্তর দিকে ফিরে পল্টু বললে, টাকা ধার করলে শোধ করতে হয়, এটা জানিসনে? দু' হপ্তা আগে না তোর সঙ্গে কথা ছিল, আমার ওখানে গিয়ে টাকা ফেরত দিয়ে আসবি? এই নিয়ে ক'বার ফাঁকি দিলি? এখন যাবি কোন্ দিকে?

সুশান্তর মুখখানা কিছু অপমানে মলিন হয়ে এসেছিল। বললে, আমি ত' যাবো আমার ডেরায়। উনি যাবেন ওদিকে।

পল্টু বললে, ও, তা বেশ ত,—আসুন না মিস্ চক্রবর্তী এই গাড়ীতে, আপনাকে পেঁছে দিই? বৃষ্টি এখনও পড়ছে, নাই বা হেঁটে গেলেন? আসুন—

বরুণা বললে, না, না—আপনাদের কত অসুবিধে হবে!

অনিচ্ছুক সুশান্ত একটু আপত্তি জানিয়ে বললে, উনি যাবেন উল্টো রাস্তায়। সে অনেক দূর, এখান থেকে প্রায় মাইল তিনেক।

তুই থাম্—পল্টু তাকে ধমক দিল—বৃষ্টির দিনে মেয়েছেলেকে তুই ভাসাতে পারিস, আমি পারিনে। চলুন মিস্ চক্রবর্তী, বাড়ীতে আপনাকে পেঁছে দিয়ে আসি।

বরুণার মৃদু আপত্তিটা মৌখিক। সারাদিনের ক্লান্তি তার সর্ব দেহে মনে। কোনোমতে বাড়ী পেঁছে পা ছড়িয়ে চোখ বুজতে পারলে সে বাঁচে। তা ছাড়া আরো কথা আছে। সেটা লোভের কথা। তারা থাকে বস্তিতে, সেখানকার লোকেরা তাদেরকে অতটা সম্ভ্রান্ত বলে মনে করে না। কিন্তু আজ একখানা মোটর গিয়ে সেখানে যদি দাঁড়ায়, আর সেই মোটর থেকে যদি বরুণা নেমে পড়ে হাসিমুখে, তাহলে শুধু যে বস্তিবাসিন্দাদের কাছেই সম্মান বাড়ে তাই নয়, মা ও বাবার মনেও বিশ্বাসের উদ্রেক হয়, ভাইবোনেরাও সচকিত হয়ে ওঠে।

আসুন।—

বরুণা দ্বিরুক্তি না ক'রে মোটরে গিয়ে উঠলো। যে দুটি লোক দোকানে

খাবার কিনতে ঢুকেছিল, তারাও এসে উঠে পড়লো। পল্টু সেন উঠে বসলো বরুণার পাশে। বরুণা যখন সেই হতভাগা দ্বিজুর বোন, তখন পল্টু আর সুশান্ত একই কথা, দু'জনের একই অধিকার! গাড়ী ছাড়বার আগে মুখ বাড়িয়ে পল্টু বললে, টাকার কথাটা যেন ভুলিসনে!

তীব্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে সুশান্ত বললে, পরের গাড়ী নিয়ে নবাবী করতে বেরিয়েছিস, দশটা টাকার কথা ভুলতে পারিসনে?

গাড়ী ছেড়ে দিল। অনেক দূর পর্যন্ত সুশান্ত সেইদিকে তাকিয়ে রইলো। ব্যাপারটা যেন তা'র ভালো লাগলো না, কেমন একটা অস্বস্তি আর বিরক্তি তা'কে পেয়ে বসলো। পল্টুকে সে জানে, এবং ভালো ক'রেই জানে। একই সঙ্গে একদিন তা'রা মামার কারখানায় কাজ শিখেছিল। সে যদি বা কিছু চক্ষুলজ্জা মেনে চলে, পল্টু একেবারেই বেপরোয়া। পল্টুই দ্বিজুকে প্রথম নেশা করতে শেখায়, এবং ওর আড্ডাতে গিয়েই সুশান্ত প্রথম জুয়া খেলতে নামে।

সুশান্ত অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে একসময় চলতে লাগলো। তা'র সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়লো বরুণার উপর। মেয়েমানুষকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই!

কিন্তু গাড়ীর মধ্যে বরুণা এক পাশে আড়ষ্ট হয়ে বসে ছিল। মাইল আড়াই পথ মোটরের পক্ষে খুবই সামান্য। হয়ত বা মিনিট দশেকের বেশি নয়। ওইটুকু পথের মধ্যেই পল্টুর অজস্র প্রশ্ন ও মীমাংসা চলছিল। সুশান্তর সঙ্গে তা'র আলাপের ইতিহাসটা সে জানতে চায়; জানতে চায় পরিণতিটা। বরুণার চোখ দিয়ে সুশান্তকে সে দেখতে চায়, তা'র মন দিয়েই সুশান্তকে বিচার করিয়ে নিতে চায়। বন্ধুপ্রীতির অপূর্ব নিদর্শন সন্দেহ নেই। একজন আরেকজনকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না; বন্ধুত্ব-সম্পর্কের পবিত্রতা রক্ষা করার দায় উভয়ের কারো নেই। পুরুষ-জগতের বোঝাপড়াটা বড়ই বিচিত্র!

বস্তির ঠিক সামনে ছুতোরের কারখানাটার কাছে এসে মোটর দাঁড়ালো। নমস্কার বিনিময় ক'রে এক সময় মিষ্টমুখে বরুণা গাড়ী থেকে নেমে এলো। রাত হ'লেও কাছাকাছি লোক ছিল দু'চারজন; দু'একজন ঝি দাঁড়িয়ে ছিল আশেপাশে—তারাও মুখ চাওয়া-চায়ি ক'রে স'রে দাঁড়ালো। বরুণাকে নামিয়ে

মোটর স্টার্ট দিয়েই পল্টু পুনরায় থামালো। তারপর মুখ বাড়িয়ে সে বললে, মিস্ চক্রবর্তী, এই নিন্—আপনার ভ্যানিটি ব্যাগ ফেলে যাচ্ছেন। আচ্ছা, নমস্কার—আশা করি আবার দেখা হবে!

ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে হাসিমুখে বরুণা সম্মতি ও নমস্কার দুই জানালো। গাড়ী চ'লে গেল। গৌরবগর্বিত মুখে এদিক ওদিক তাকিয়ে অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে বরুণা তাদের ঘরের দিকে পা বাড়ালো। কিন্তু হঠাৎ অন্ধকারেই তা'র সন্দেহ হোলো। মনে হচ্ছে, শূন্য ভ্যানিটি ব্যাগটি নিতান্ত শূন্য নয়! সন্দেহক্রমে ব্যাগটি খুলে হাতখানা ঢুকিয়ে সে ভিতরে অনুভব করলো, সুগন্ধী রুমালে বাঁধা একটি মোড়ক। বরুণার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ ক'রে উঠলো। আড়ষ্ট পায়ে চলতে চলতে রুমালের গিঁট খুলে সে সেই স্বল্পালোকেই দেখে নিল, পাঁচটাকার কয়েকখানি নোট পাট ক'রে বাঁধা রয়েছে। বরুণার হাত কাঁপলো, পাও কাঁপলো—কিন্তু পলকের মধ্যে রুমাল-সুদ্ধ টাকা ভ্যানিটি ব্যাগে আবার বন্ধ ক'রে ঘরের দিকে অগ্রসর হোলো।

রাত কম হয়নি, ক্ষুধার্ত ক্লান্ত বস্তির চোখে তখন তন্দ্রা জড়িয়ে এসেছে।

রান্নাঘরের চালার নীচের থেকে শীলু হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলো, দিদিমা, শিগ্গির এসো দিদিমা,—মেজমাসি কি করেছে দ্যাখো।

রুগ্ন শরীরে তরুবালা উঠে বসলেন। দীপেনের বউ ফুলি আর বরুণা ছুটে বেরিয়ে এলো,—কি হয়েছে রে?

মেজমাসিকে শিগ্গির দেখে যাও!

যমুনার বিছানার পাশে শুয়ে ভাস্বতীর চোখে তন্দ্রা এসেছিল। ধড়মড় ক'রে উঠে সে দেখলো, বিছানাটা শূন্য, যমুনা নেই। সুতরাং ভাস্বতীও ছুটে বেরিয়ে এলো। রান্নাঘরের চালায় এসে দেখলো, যমুনা এক পাশে কাত হয়ে পড়েছে, এবং মুখ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে রক্ত গড়িয়ে মেঝের উপরে নেমে এসেছে।

ভাস্বতী তাড়াতাড়ি গিয়ে যমুনাকে তুলে ধরলো। তরুবালা পাশে এসে দাঁড়িয়ে হতবুদ্ধির মতো বললেন, বিছানা ছেড়ে এখানে এসেছিস কেন মরতে?

শীল্ বললে, কেউ কোথাও নেই, মেজমাসি ল্বকিয়ে-ল্বকিয়ে হাঁড়িকুড়ি উল্টে কি যেন খাচ্ছিল, দিদিমা। আমাকে দেখেই পালাতে গিয়ে ঘ্বরে পড়লো, আর অমনি বমি আরম্ভ।

বর্ণা আর শীল্র সাহায্যে যখন ধরাধরি ক'রে যম্বনাকে তোলা হচ্ছে, তখন পিছন দিকে ম্গেন্দ্র এসে দাঁড়ালেন। সমগ্র ব্যাপারটা দেখে তিনি র্দ্ধ-শ্বাসে বললেন, এ আমি জানতুম—

তর্বালা বললেন, শ্ব্ধ্ব ত' বমি নয়, এ যে ভলকে ভলকে রক্ত! বমির সঙ্গে এত রক্ত কেন?

ম্গেন্দ্র বললেন, ওটা সাধারণ বমি নয়, ওইভাবেই রক্ত উঠে আসে।

ভাস্বতী কম্পিতকণ্ঠে বললে, কিছ্ব ব্ঝতে পাচ্ছিনে,—এত রক্ত কেন বাবা?

নাই বা শ্বনলে!—ম্গেন্দ্র কাঁপতে কাঁপতে বললেন, রক্তের ইতিহাস আছে বৈ কি। খেতে না পেলে, যত্ন না পেলে—মনের মধ্যে চাপা বিদ্বেষ জমিয়ে তুললে যে-রক্তটা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে, এ সেই রক্ত! কেউ বাদ যাবে না, কা'রো নিস্তার নেই!

তর্বালা সেইখানে বিবর্ণম্বখে ব'সে পড়লেন। যম্বনাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শ্বইয়ে দেওয়া হোলো। ফ্বলিকে অনেক ব্বঝিয়ে একখানা প্বরনো কাপড় তা'র কাছ থেকে নিয়ে যম্বনার পরনের কাপড় ওরা বদ্‌লে দিল। অর্ধচেতন যম্বনা তখন চোখ ব্বজে রয়েছে। গায়ে তা'র অল্প অল্প জ্বর, অনেকদিনের জ্বর আর কাসি,—আগে দিনের বেলায় দ্ব'টি ভাত খেতো,—আজকাল তাও বন্ধ। বিছানায় তাকে শ্বইয়ে কপালে হাত ব্বলিয়ে মাথায় বাতাস ক'রে ভাস্বতী বললে, অমন হয় ভাই, কিচ্ছ্ব ভয় নেই। আমি এখ্বনি অতন্বকে আনাচ্ছি—

ম্গেন্দ্রকে ব'লে ভাস্বতী তখনই বর্ণাকে পাঠালো অতন্বকে খবর দিতে। ইতিমধ্যে ফ্বলি একবার এসে দাঁড়ালো, এবং ঘরে না ঢ্বকে একবার উঁকি মেরে আবার চ'লে গেল। তা'র বাবা স্বঁটে ময়রা হোলো শাঁসালো লোক, তা'র মেয়ে হয়ে অস্বখ-বিস্বখের ঘরে সে ঢ্বকবেই বা কেন? স্বামীর একটা কাজকর্ম জ্বটলেই এ আঁস্তাকুড় ছেড়ে সে পালাবে!

কিছ্বক্ষণ পরে একট্ব স্বস্থ হয়ে যম্বনা ধীরে ধীরে চোখ মেলে একবার

তাকালো। দিনকয়েক হোলো গলার আওয়াজটা তা'র একটু কেমন ভাঙগা-ভাঙগা মনে হচ্ছিল। সেই ভাঙগা গলাতেই সে বললে, কিছু খেতে দিলে ত' আর উঠে আমাকে রান্নাঘরে যেতে হোতো না!

শীলু বললে, তাই বুঝি তুমি হাঁড়ি খাচ্ছিলে, মেজমাসি?

যমুনা বললে, মুখে এক লাথি মারবো তোর!

ভাস্বতী বললে, ছি শীলু, মাসিমাকে কি অমন ক'রে কথা বলে?

যমুনা পুনরায় চোখ পাকিয়ে বললে, তোমরা বুঝি যুক্তি ক'রে আমাকে না খাইয়ে মারবে ঠিক করেছ?

ভয়ার্ত মনে ভাস্বতী তা'র দিকে চেয়ে স্নেহের হাসি হেসে বললে, একটু শান্ত হয়ে থাক ভাই, এখনই অতনু আসবে। আমার বিশ্বাস, আজ থেকে তুই যা খেতে চাইবি, সবই খেতে দেবে।

চোখে মুখে যমুনার কালির ছাপ প'ড়ে গেছে। কিন্তু সেই মুখে অসীম বিরক্তি নিয়ে সে চোখ বুজে রইলো। বাইরে তরুবালা ব'সে চোখের জল ফেলছিলেন। মৃগেন্দ্র নিজের জায়গায় গিয়ে বিছানা নিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে রয়েছেন। দুটো জাগ্রত চক্ষে তাকিয়ে তিনি যেন অবশিষ্ট ভবিষ্যৎটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অতনু এসে পেঁছিল। বরুণা এলো তা'র পিছু পিছু। অতনু ঘরে ঢুকে বসলো বিছানার পাশে। তারপর যমুনার দিকে কিয়ৎক্ষণ চেয়ে রইলো। অনেকদিন পরে সে এখানে এসেছে শুনে মৃগেন্দ্র আর তরুবালা এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু নতুন ক'রে বলবার কিছু নেই, নতুন কোনো আলোচনাও অবান্তর। অতনু রোগের বিবরণ পেয়েছিল বরুণার কাছে, সুতরাং বেশী কিছু জানবার আগ্রহও তা'র কম। ভাস্বতী কেবল মৃদুস্বরে বললে, রুগীকে না খাইয়ে আর রাখা যাবে না, ওকে খাওয়ানো দরকার।

বেশ ত',—অতনু বললে, যা সহ্য করতে পারবে, তাই খাবে!

সবাই চুপ ক'রে গেল, কেননা, উৎকৃষ্ট খাদ্যবস্তু যোগাবার কঠিন সমস্যাটা কি, সবাই জানে। অতনু জানে সবচেয়ে বেশী।

পিছন থেকে মৃগেন্দ্র বললেন, কেমন দেখছো, অতনু?

অতনু বললে, ভয় পাবেন না, মেসোমশাই।

মৃগেন্দ্র চুপ ক'রে সেখান থেকে স'রে গেলেন। রুগ্ন তরুবালার মুখে আজকাল কোনো কথা সরে না, তিনিও এক পাশে স'রে গিয়ে বসলেন। অতনু যমুনাকে পরীক্ষা করতে ব'সে গেল। রোগীর মুখের দিকে সে কেবল তাকায়, কথা বলে কম। কেবল উপসর্গগুলো জানতে চেষ্টা করে।

সমস্ত পরিবারটি দুর্দশায় আধমরা, সুতরাং অত বড় একটা বিপদের মধ্যেও তাদের উত্তেজনা কম। প্রবল প্রাণশক্তির থেকেই আসে চেতনার উদ্দীপনা—ভয় উল্লাস আক্রোশ ঘৃণা—সমস্তই। এখানে সবটাই শান্ত, জীবনীশক্তির অভাবে সমস্তটাই যেন মুখ থুবড়ে নির্জীব হয়ে পড়া! সেই কারণেই অতনুর কোনো বক্তব্য নেই। এক সময় সে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালো। বরুণা সামনে থেকে স'রে গেছে। ভাস্বতীর দিকে ফিরে সে বললে, চলো আমার সঙ্গে।

বাইরে বসে ছিলেন তরুবালা। অতনু বললে, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা আমি করছি, হঠাৎ ভয়ের কিছু নেই—মেসোমশাইকে বলবেন।

তরুবালা চুপ ক'রে শুনলেন, কোনো জবাব দিলেন না। ভাইবোনেরা মিলে এ বাড়ীতে অতনুর আনাগোনা যে আর পছন্দ করছে না, একথা অতনুর কানে হয়ত উঠেছে। অতনু এ বাড়ীতে আর লাভজনক নয়।

ভাস্বতী প্রস্তুত হ'য়ে বেরিয়ে এলো অতনুর সঙ্গে। ভাস্বতীর হাতেই শুশ্রূষার ভার, ভাস্বতীর হাতেই রোগিণীর সমস্ত দায়িত্বভার। মা ছোঁবেন না, ভাইবোনেরা কাছে যাবে না, শীলু পালাবে, ফুলি মুখ ফিরে তাকাবে না,—সুতরাং একা ভাস্বতী সমস্ত বোঝাটাই তুলে নেবে বৈ কি। কুণ্ঠা তা'র কিছুমাত্র নেই, কোনো জিজ্ঞাসা নেই,—ওটাতেই তা'র স্বাভাবিক অধিকার। কোলে পিঠে ক'রে যাদেরকে সে বড় ক'রে তুলেছে, তাদের কল্যাণটাই ত' বড়; তাদের রুগ্নতা, ক্লিন্নতা, মালিন্য—সমস্তই যদি তা'কে নিজের হাতে মুছিয়ে ঘুচিয়ে দিতে হয়, তবে সেইটেই তা'র একমাত্র আনন্দ!

গাড়ী নিয়ে এসেছিল অতনু। গলি পেরিয়ে তা'র সঙ্গে ভাস্বতী ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলো। গাড়ী ছেড়ে দিল।

প্রায় ঘণ্টা দুই ওরা ঘুরলো ওষুধের দোকানে আর বাজারে। রোগীর ঔষধ-পথ্য ছাড়া কাপড় চোপড় ভাস্বতী কিছু কিনলো। খরচটা অতনুর—বলাই বাহুল্য। ভাস্বতীর আজ কিছুমাত্র কুণ্ঠা নেই। অজস্র জিনিসপত্র

সে সংগ্রহ করলো—সমস্তগুলিই যমুনা-সম্পর্কিত। কোনোদিন তা'র এত ফরমাস ছিল না, এত বেশী দাবি আগে কখনও সে করেনি। এক সময়ে মনিব্যাগটি হাতে নিয়েছিল ভাস্বতী, কিন্তু তা'র ব্যয়বাহুল্য দেখে অতনু আজ একটু বিস্মিত হোলো। ভাস্বতীকে এমন অকুণ্ঠ অমিতব্যয়ী আগে দেখা যায়নি।

হাসিমুখে এক সময় অতনু বললে, ঠাকুর-দেবতায় তোমার ত' অগাধ বিশ্বাস, তবে আজ এমন ভয় পাচ্ছ কেন? এত জিনিসপত্র কি হবে যমুনার?

ভাস্বতী বললে, বাধা দিয়ো না, যমুনা তা'র শেষ পাওনা নিয়ে যাক্।

তুমি কি ধ'রেই নিয়েছ যমুনা বাঁচবে না? আমি ডাক্তার, আমি বলছি—

মিথ্যে আশ্বাস দিয়ো না, ডাক্তার! তোমার চোখ দিয়েই দেখেছি, যমুনার কোনো আশা নেই। মিথ্যে সাহস দিয়ো না তুমি!

অতনু বললে, তুমি না বলতে, মৃত্যুকে তুমি ভয় করো না? জীবন-মৃত্যু নাকি তাঁরই খেলা?

ভাস্বতী বললে, তবু মোহবন্ধনে যারা বাঁধা—তা'রা যে হারায়, তা'রা যে বুক চাপড়ে কাঁদে! তাদের সান্ত্বনা দিতে হয় ব'লেই এসব কিনে নিয়ে যাচ্ছি।

অতনু বললে, কিন্তু এত দুঃখ আর উৎপীড়নের মধ্যে থেকেও তোমার চোখে ত' কোনোদিন জল দেখলুম না? তুমি কি কাঁদতেও জানো না?

ভাস্বতী বিষণ্ণ স্নিগ্ধ হাসি হাসলো। কথার কোনো জবাব দিল না। অতনু পুনরায় বললে, হয়ত কিছু চাও না ব'লেই তোমার দুঃখ নেই। হয়ত লোভকে তুমি জয় করেছ, হয়তো ঈশ্বর নামক কোনো 'অ-পদার্থ' তোমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে,—সেইজন্যেই এ জীবনে তোমার ধরা-ছোঁওয়া পেলুম না!

ভাস্বতী শুধু বললে, চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে। অন্য সময়ে কথা হবে।—

সাত

রাজবাড়ীতে হাতী বাঁধা থাকতো। কাকাতুয়ারা থাকতো সোনার শেকলে বাঁধা। ময়ূর আর ময়ূরীরা নেচে যেতো রাজবাড়ীর অঙ্গনে। রঘু ডাকাতের দল আসতো মাঠ ছাড়িয়ে, জঙ্গল পেরিয়ে সেই যেখানে তান্ত্রিকদের অষ্টভূজা কালীর মন্দির ছিল। মন্দিরে মাথা নুইয়ে তা'রা ব'লে যেতো, হে মা, যেন অধর্ম না করি, দুর্বলেরা যেন আমাদের হাতে আঘাত না পায়। কেষ্টরাম চক্কোত্তির রাজত্বে পাপ যেন না ঢোকে! ওই কেষ্টরামের ছেলেই ত' হোলো মদন চক্কোত্তি!

পিসিমা কত গল্প করে গেছেন! সেই পুণ্যবংশে যে-মেয়ের জন্ম, তার কি কখনও অমঙ্গল হয় ভাই? যমুনার গা মুছিয়ে কপালে হাত বুলিয়ে পাখার বাতাস ক'রে ভাস্বতী তা'কে সান্ত্বনা দেয়। মেয়ে হোলো শক্তি, আদি-শক্তির অংশ—তারাই মহাকালী—যদি নিজের শক্তিকে তারা প্রকাশ করে! মহাকালী থেকে প্রতি পলকে কোটি কোটি প্রাণ নিঃস্রাবিত হচ্ছে, আবার পলকে পলকে কোটি কোটি প্রাণ সেই সর্বগ্রাসিনী সংহারিণীর গ্রাসের মধ্যে প্রবেশ করছে। জন্মমৃত্যু তাঁরই খেলা, ভাই! উপরে ব'সে রয়েছেন মহাকাল, চোখ বুজে এযুগে তিনি সর্বনাশা মৃত্যুর মালা নিয়ে জপে বসেছেন,—তাঁর সেই বীজমন্ত্র যিনি শুনতে পান্, তিনিই ত জ্ঞানী।

ফল ও মিষ্টান্নের থালাটি নিয়ে ভাস্বতী যমুনার কাছে এগিয়ে দেয়।

যমুনা বলে, আর কদ্দিন লাগবে আমার সারতে, বলই না বাপু? আমি কিন্তু আর শুয়ে থাকতে পারিনে! তোমার মুখ দিয়ে ত' কই আসল কথাটা বেরোয় না, দিদি? মন ত' নয়, জিলিপির প্যাঁচ!

স্নেহের হাসি হেসে ভাস্বতী বলে, আচ্ছা আমি অতনুর কাছে জেনে আসবো। সে যদি বলে, সামনের মাস থেকেই আমি তোকে নিয়ে সাহেব বাগানের মাঠে রোজ বেড়িয়ে আনবো।

মুখখানা বিকৃত ক'রে যমুনা বললে, বিছানাপত্তর আর আমার ভালো লাগে না। অসুখ ত' সারছে, তবে শরীর শুকিয়ে প্যাকাটি হচ্ছে কেন দিন দিন?

জ্বর বন্ধ হচ্ছে না কেন? কাল আবার অত রক্তবমি হোলো কেন? তোমার ডাক্তার এসব দেখতে পায় না? চোখের মাথা খেয়েছে নাকি?

ফল মিষ্টি আর দুধ খেয়ে যমুনা আবার শুয়ে পড়ে। ভাস্বতী খুব হাসে। ওই নম্র শান্ত হাসি দেখলেই যমুনার পিত্ত জ্বলে ওঠে। বলে, তোমাকে চিনতে পারে কা'র বাবার সাধ্যি, এই আমি বললুম। তুমি যে কোন্ মতলবে আমার সেবা করছ আর নোংরা ঘাঁটছো, এখনও বুঝতে পারিনি। দাঁড়াও, অগে আমি বিছানা ছেড়ে উঠি, তারপর সব একে একে দেখে নেবো!

সকৌতুকে ভাস্বতী বলে, কি করবি?

যা করবার তাই করবো। তারপর এ বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবো।

কোথা যাবি রে?

যাবো যেদিকে দুচোখ যায়! নতুন নতুন দেশে যাবো, নতুন নতুন মানুষ দেখবো। যে দেশে ভালো হাওয়া, আকাশ যেখানে অনেক বড়—সেখানে গিয়ে বুক ভ'রে নিশ্বেস নিয়ে বাঁচবো!

জীবনের প্রতি নিবিড় মমতা ফুটে ওঠে যমুনার মুখে চোখে। সেটি কিছুক্ষণ লক্ষ্য ক'রে ভাস্বতী বলে, আর আমি যদি তোর জন্যে অন্য ব্যবস্থা করি?

রুক্ষ ভ্রূভঙ্গী ক'রে নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গে যমুনা বলে, তুমি করবে আমার ব্যবস্থা? তোমার কি সাধ্যি? বলে, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে! ব্যবস্থাটা কি শুনি?

ভাস্বতী বললে, অত যদি রাগ করিস, তা হ'লে কেন বলবো? মনে রাগ থাকলে কি ভালো কথা কানে ঢোকে?

যমুনা চুপ ক'রে গেল। রান্নাঘর থেকে তীব্রকণ্ঠে বরুণার ডাক এলো ভাস্বতীর প্রতি। বাইরে দ্বিজেন এসে কী যেন একটা হাঙ্গামা বাধিয়েছে। ফুলি উঠেছে মুখর হয়ে। ভাস্বতী উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু যমুনা বাধা দিল। বললে, কী এমন ভালো কথা? বলেই যাওনা কেন? বড্ড ঠ্যাকার তোমার বড়দি।

যমুনার থুঁতনি নেড়ে দিয়ে উঠে যাবার সময় ভাস্বতী ব'লে গেল, আসছি, এসে বলবো।

মিনিট পাঁচেক পরেই আবার সে ফিরে এলো। যমুনার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। 'মেজার গ্লাসে' ওষুধ ঢেলে এগিয়ে আসতেই যমুনা বললে, খাবো না, কাছে আনলেই ফেলে দেবো!

হাসিমুখে ভাস্বতী বললে, ওমা, সে কি কথা?

কি বলবে, বলেছিলে, আগে বলো?

আচ্ছা বলছি, ওষুধ খেয়ে নে?—ভাস্বতী তার কাছে বসলো।

শান্ত হয়ে যমুনা ওষুধ গিললো। পরে বললে, এবার বলো?

ভাস্বতী তার মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে বললে, তুই ভালো হ'লে আমি তোর বিয়ে দেবো, যমুনা।

বিয়ে! কে আমাকে বিয়ে করবে? আমাকে বুঝি ছেলে-ভোলাচ্ছ?

দেখিস আমি পাত্র এনে দোবো? রূপে গুণে অবস্থায় সে পাত্রের জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না!

রাগ ক'রে যমুনা বললে, তুমি ত' বেশ ধাপ্পা দিতে পারো দিদি? এখন বিছানায় প'ড়ে আছি কিনা, তাই আমাকে জব্দ করা হচ্ছে! যখন ভালো ছিলাম, তখন বলোনি কেন?

ভাস্বতী বললে, তখন ত' কেবল ঝগড়াই করতিস, বিয়ের কথা কি ভাবতিস, পোড়ারমুখি?

যমুনা চুপ করে গেল। ভাস্বতীর আঁচল খ'সে পড়েছিল বালিশের পাশে, যমুনা সেই আঁচলের খুঁটটা ধীরে ধীরে নিজের মুঠির মধ্যে চেপে ধরলো। অনেকক্ষণ পরে এক সময় সে কথা বললে, কবে আমি ভালো হবো, বলো ত?

ভাস্বতী বললে, যেদিন ভালো হ'বি, বিয়ে ক'রে চ'লে যাবি এখান থেকে, নতুন ঘরকন্না পাতবি নতুন দেশে গিয়ে,—তখন কি আর আজকের অসুখের কথা তোর মনে থাকবে?

যমুনা আবার অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর সহসা সে মুখ তুলে বললে, আমাকে তুমি সারিয়ে তুলতে পারবে ত?

নিশ্চয়! সারতে আর দেরিই বা কি! শিগ্‌গির উঠবি, ভাই।

সেরে উঠলে কতদিনের মধ্যে তুমি বিয়ে দেবে? আমি কিন্তু এখানে আর কিছুতেই থাকবো না, তা ব'লে রাখছি!

ভাস্বতী বললে, কেন থাকবি? স্বামী ছেড়ে কেউ থাকে? সে তোকে

নিয়ে যাবে অনেক দূর দেশে, একেবারে নতুন জগতে,—এখানকার কথা তোর আর মনেই থাকবে না!

যমুনার কালিপড়া চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উপর দিকে নিবন্ধ হোলো। কী ঔজ্জ্বল্য তা'র মুখে চোখে, বাসনার কী আভা! অভাগিনী যেন তা'র অন্তিম শয্যা থেকে উঠে ছুটতে লাগলো যেদিকে মন চায়, যেদিকে প্রাণ যায়! এই ময়লা বিছানা, এই ক্লেদাক্ত বাতাস, কদর্য ঘর, নোংরা বস্তি, জঘন্য গলি-ঘুঁজি—সমস্ত পেরিয়ে সে যেন ছুটলো যেদিকে অসীম অগাধ মুক্তি, অফুরন্ত আনন্দ, স্বাস্থ্য ও যৌবনের উদ্দাম সমারোহ!

দিদি?

কেন রে?

আমার এ চেহারায় কেন লোকে আমাকে বিয়ে করবে?

ভাস্বতী বললে, আজ অসুখ হয়েছে তাই, নইলে এ চেহারা লোকে পাবে কোথায়, যমুনা? আনুক ত' দেখি তোর মতন আরেকটা মেয়ে? আগুন-তাতে সোনার রং ময়লা হয়,—পালিশ করলেই আবার চকচকে, তা জানিস?

কিছুক্ষণ পরে যমুনা বললে, আমি যখন তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতুম, তুমি বুঝি খুব রাগ করতে, বড়দি?

কপালে তা'র হাত বুলিয়ে ভাস্বতী বললে, আমার কাঁকালে চ'ড়ে তুই বড় হয়েছিস। তোর কথায় আমি রাগ করবো কেন রে?

যমুনার মন আনন্দে দুলে উঠেছে, কিন্তু যথাসম্ভব আত্মসংবরণ ক'রে সে বললে, আচ্ছা, এদিকে আমার যে বিয়ে দেবে তুমি, খরচ পাবে কোথায়? বেশী টাকা না পেলে ভালো পাত্ররা রাজি হবে কেন?

ভাস্বতী হাসিমুখে বললে, তোর বিয়ে দেবো আমি, সে-ভাবনা তুই আমার ওপর ছেড়ে দে!

বড়দিদি যেন আশ্চর্য! যমুনা সম্ভবতঃ এই প্রথম ভাস্বতীকে তা'র মনপ্রাণ দিয়ে আবিষ্কার করলো। একটা অধীর উল্লাস তা'র হৃৎপিণ্ডের রক্তের মতোই মুখের মধ্যে যেন গলগলিয়ে উঠে আসতে চাইলো। পুনরায় সে বললে, কিন্তু তোমাকে সামনে দেখলে আমাকে যে কেউ পছন্দ করবে না, বড়দি?

ভাস্বতী বললে, ছি, ওকথা বলতে নেই যমুনা। আমি যে তোর বড়! বেশ, আমাকে যদি তোর বর পছন্দ করে, আমি তোদের দুজনের ঘর গুছিয়ে

দিয়ে আসবো সেই দূর দেশে গিয়ে? তোরা দুটিতে থাকবি একলা, সেই আমার আনন্দ! এখান থেকে আশীর্বাদ জানাবো।

সহসা বাইরে দীপেনের চীৎকার শোনা গেল,—এসব ধাপ্পাবাজি, বদমায়েসি! বলি, চালাকি পেয়েছ? ন্যাকামি? আমি সব জানতে পেরেছি—

ভাস্বতীর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠলো। ফুলি এ বাড়ীতে আসার পর থেকে দীপেনের আচরণ অত্যন্ত সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা'র চিৎকারে পাছে যমুনার কোনো উত্তেজনা বাড়ে, এজন্য সে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে এলো। দীপেন তা'র দিকে তাকিয়ে পুনরায় চীৎকার করলো, হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি! তোমার ধাপ্পাবাজি বাড়ছে দিন দিন, তা জানো?

ভাস্বতী হাসিমুখে বললে, জানলুম! কি বলতে চাস?

সমস্ত ঘরকন্নাটাকে উপোস করিয়ে রেখে তুমি কোন্ সাহসে নিজে নবাবী করো? যমুনার নাম ক'রে তুমি নিজে ডুবে-ডুবে জল খাচ্ছ না?

ভাস্বতী বললে, লোকে ডুবলেই জল খায়, আর জল খেয়েই মরে! আর তা ছাড়া, জল খেলে তেষ্টা যায়, ক্ষিধে যায় না। বল্ আর কি বলতে চাস?

দীপেন চেঁচালো,—অসুখের নাম ক'রে তুমি যা খুশি তাই খরচ করছ কা'র টাকা? কা'র টাকায় তোমার বড়মানুষী! বোনের স্যাবা ক'রে সাধু সাজছো, তোমার জোচ্চুরি আর জালিয়াতি ধরবার মানুষ এখানে নেই মনে করেছ?

তোকে মানুষ মনে করবো কিনা আমাকে আগে ব'লে দে?

ওদিকে দ্বিজেন দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। তার মুখে একগাল হাসি। দীপেন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, বাপের বেটি যদি হও, বলো ত' এ টাকা আমাদের ফাঁকি দিয়ে কতকাল ধ'রে তুমি জমিয়েছ? আমাদের ভাত খেয়ে আমাদেরই ঘরে ব'সে রক্ত শুষছো?

ভাস্বতী বললে, কোন্ কথাটা শুনলে তোর গলার আওয়াজটা থামবে বল্ দেখি? ঘরে রুগ্নী রয়েছে মনে থাকে না?

মুখ বিকৃত ক'রে দীপেন বললে, না, আমার মনে থাকে না! মনে থাকে শুধু তোমার! বলে, মা'র পোড়ে না পোড়ে মাসির! বাবাকে কতবার বলেছি, দ্যাখো বাবা দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো! বাবার কি আর মাথার ঠিক আছে? টাকাকড়ি যা আছে সকলের সামনে হাজির করো,—নইলে আজ

আমি এর হেস্তনেস্ত করবো ব'লে দিচ্ছি। আমি মা-বাপকে পরোয়া করিনে,— তোমাকেও আর খাতির ক'রে চলবো না, ব'লে দিলুম!

ভাস্বতী বললে, তোর খাতির দেখতে পাড়ার লোক জড়ো হয়েছে!

হঠাৎ ফুলি বললে ওপাশ থেকে, ঠাট্টা করলে ত' আর আসল কথা চাপা পড়ে না। টাকাকড়ি সব বে'র ক'রে দিলেই ত' হয়!

ভাস্বতী আবার হাসলো। তারপর বললে, চুরি করা আমার অভ্যাস নয়, বৌ। তবু তোমার স্বামী যদি আমাকে গায়ের জোরে চোর বলে, তবে এই কথাই স্বীকার করবো, বাবার বেহাই শ্রীযুক্ত সুঁটে ময়রার দোকানে সে-টাকা গচ্ছিত আছে।

চীৎকার ক'রে উঠলো দীপেন, কী এত বড় আস্পদ্দা! আমার শ্বশুরের নামে অপবাদ, আমার বউয়ের বাপ তুললি তুই কোন্ অধিকারে? আজ কিন্তু ছুরি-কাটারি হয়ে যাবে, ব'লে দিচ্ছি!

ভাস্বতী যমুনার ঘরে এসে আবার বসলো। তা'র সহাস্য মুখে কোনো উত্তেজনার চিহ্ন দেখা গেল না। ওদিকে বাইরে দীপেন চীৎকার করছিল, পথের কুকুর ঘরে উঠেছিলি, তোর জাতের কি কোনো পরিচয় আছে? তুই চুরি করেছিলি কি তোর বাপের টাকা?

দ্বিজেন এবার গরম হয়ে উঠলো, এই দাদা, খবরদার—

দীপেন বললে, তোর কি? আমি ওকে গাল দিচ্ছি, তুই তেড়ে এলি কেন?

দ্বিজেন বললে, তোর গালাগাল অনেক সয়েছি! যদি মুরোদ থাকে, বউ নিয়ে এক্ষুনি চলে যা না এখান থেকে?

এটা কি তোর বাড়ী? আমার টাকায় সবাই এখানে খাচ্ছে না?

তোর টাকায় খাচ্ছে? তুই বুঝি মনোহর চক্কোত্তির জমিদারী পেয়েছিস? ফের যদি বাজে বক্‌বি, তবে তোর ওই ময়রানির আঁচল নিয়ে তোর গলায় ফাঁসি লাগিয়ে দেবো!

দীপেন আবার চেঁচালো, মুখ সামলে কথা বলিস, দ্বিজু!

দ্বিজেন দৃঢ়স্বরে বললে, যা যা, আমি খুব সামলেছি, এবার তোর বউকে সামলে রাখিস বলে রাখলুম। বেশী চেঁচালে ওকে ধরে বোরেগীদের আড্ডায় বেচে দিয়ে আসবো!

ওপাশের জানলায় কনক হেসে লুটিয়ে পড়ছিল। ফুলি কিন্তু দ্বিজেনের দিকে তাকিয়ে ভয়ে-ভয়ে অন্যত্র সরে গিয়ে লুকিয়েছে। তার স্বামী সুশ্রী বটে, দ্বিজেন কিন্তু স্বাস্থ্যবান। ভয়টা ওইখানে।

বরুণা সেজেগুজে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ওদের দিকে চেয়ে সে একবার থমকে দাঁড়ালো। গ্রীবা দুলিয়ে বললে, আহা, কী ঝগড়ার ছিরি! তোদের জন্যে ভদ্র সমাজে মুখ দেখাতেও লজ্জা করে!

দ্বিজেনও ছাড়বার পাত্র নয়। বরুণার মুখের উপরেই সে ফস করে বললে, তোর ভদ্রসমাজ ত' আগে ছিল সুশান্ত দাস, আজকাল বুঝি পল্টু সেন?

পাউডার-ঘষা মুখখানা বেঁকিয়ে বরুণা যাবার সময় বলে গেল, পল্টুবাবু আমার নতুন কাজ যোগাড় করে দিচ্ছেন, তা জানো? সে টাকা সকলের পেটেই যাবে, মনে রেখো।

কত বড় কাজ করবি, তা আমি জানি। আমাকে ঘাঁটাসনে। যা, পালা।

বরুণা গজগজ করতে করতে চলে যাবার পর দীপেন দম নিয়ে বললে, বাবা আসুক, আজ এস্‌পার ওস্‌পার করবো। একটা বাইরের মেয়েছেলের জন্যে ভায়ে-ভায়ে ঝগড়া লাগবে, এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করবো না।

দ্বিজেন বললে, বড়বোনকে বাইরের মেয়েছেলে বলিস কোন্‌ হিসেবে?

ও কি আমাদের সত্যি বোন?—দীপেন জবাব চাইলো কঠিন কণ্ঠে।

তোর বউটা কি সত্যি বউ? কোত্থেকে ধরে এনেছিস পেত্নীটাকে? আবার ওটাকেই না তুই খাওয়াস অন্তুর রোজগারের টাকা দিয়ে!

দীপেন বললে, অন্তুর টাকা? আর আমার শ্বশুরের মাসোহারাটা?

দ্বিজেন তামাসা করে বললে, কচু, না কচুরি, না শুধু চুরি? কোন্‌টা?

দ্বিজু, সাবধান কিন্তু। বউয়ের কাছে আমার মান খোওয়া গেলে কিন্তু তোকে আস্ত রাখবো না বলে দিচ্ছি!

দ্বিজু একগাল হাসলো। বললে, তোর ত' মেয়ে-মহলেই যত বড়াই! পুরুষ মানুষকে আবার ভয় দেখাস কোন্‌ সাহসে? আমিও বলে রাখছি, তোর ওই ময়রানির কানের মাক্‌ড়ি যদি ভোজবাজি হয়ে যায়—আমি কিন্তু দায়ী হবো না!

দীপেন আগুন হয়ে বললে, বটে, আমি আজই তবে থানায় ডায়রি লিখিয়ে আসছি। হাতে দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে!

তরুবালা কাঁপড়ে কাঁপতে এসে দাঁড়ালেন। ওপাশের জানলা থেকে কনক গলা বাড়িয়ে বললে, বেশ দেখলুম, খুব দেখলুম। এরা সব ভদ্দলোক; এরা হোলো বনেদী জমিদার! আরো কত দেখবো!

এধার থেকে চোখ পাকিয়ে দ্বিজেন বললে, এই ছুঁড়ি, তুই ফোড়ন দিতে আসিস কেন রে যখন তখন?

কনক বললে, ওমা, ভদ্দরনোকের ছেলের কথার ছিরি দ্যাখো!

চোপ রও! বেশী কথা কইলে ওই ময়রানিকে ধরে লেলিয়ে দেবো তোর বংশী মুদির পেছনে, কপাল চাপড়ে তখন মরবি!—দ্বিজেন দু'পা এগিয়ে গেল।

কনক বললে, ও, মারবে নাকি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আসুক আজ ঘরে, দাঙ্গা বাধলে তোমরা দায়ী থেকো!

মুখের ওপর জানলা বন্ধ করে কনক সেখান থেকে সরে গেল।

তরুবালা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা দেখলেন। তাঁর অসুখ। কী অসুখ বলা কঠিন। কিন্তু দিন দিন তিনি অকর্মণ্য হচ্ছেন, প্রত্যেকটি দিন যেন তাঁকে একটা পরিণামের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। অসুখ ঢুকেছে তাঁর মাথায় বুকে কোমরে পায়ে,—অসুখ তাঁর সর্বাঙ্গে।

দীপেন বললে, মা, দেখলে ত? দেখলে কেমন করে বংশের মুখে চুণকালি দেয়? জুয়া খেলে দিনে, নেশা করে রাতে—ওছেলে তোমার নষ্ট হয়ে গেছে! ও কেমন করে থাকবে এ বাড়ীতে? মেয়েছেলের মান রাখতে শেখেনি! আবার জাত তুলে কথা কয়!

তরুবালা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বললেন, তোদের দাঁত-কিচিমিচি থামবে কবে?

দ্বিজেন বললে, আজকেই থেমে যেতো মা, দাদা যদি ওর ওই ময়রানির হাত ধরে চলে যেতো। বাবা বাড়ী ফিরলেই ওদের তাড়িয়ে দাও।

দীপেন বললে, ওই শোনো মা, শোনো ওর আস্পদ্দার কথা! তোমার জন্যেই ওকে আমি শাসন করতে পারিনি! তুমি রাজি হ'লে ওকে আমি ঘুঘুর ফাঁদ দেখাতুম! বার বার ময়রানি বলা বার করতুম!

দ্বিজেন খুব হাসতে লাগলো।

গলিপথে সহসা পায়ের শব্দ হোলো, তরুবালা মুখ তুলে দেখলেন, অতনু আসছে মস মস করে। পিছন ফিরে অতনুকে দেখেই ওরা যে যার চুপ করে

গেল। প্রায় রোজই এই সময়ে অতনু একবার করে আসে। এ বাড়ী থেকে যাকে সরানো হয়েছিল, তাকেই আবার অভ্যর্থনা করে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। অতনু সামনে দিয়ে ঘুরে সোজা যমুনার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

অতনুকে দেখে দীপেন কিন্তু আজ কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করলো না। তরুবালাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলো, ওর সঙ্গে কি আমি কথা বলতে এসেছিলুম? আমি এসেছিলুম তোমাদের ওই পথো মেয়েকে সায়েস্তা করতে!

দ্বিজেন বললে, তুই সায়েস্তা করবি! তুই কে?

বাবা যদি না থাকে আমি এ বাড়ীর সকলের বড়, তা জানিস? সবাইকে ঠকিয়ে সকলের মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে একজন গুছিয়ে নেবে—এ আমি কেন সইবো?—দীপেন আবার চেঁচিয়ে উঠলো নিজেরই উত্তেজনায়,—ও বলুক, নিজের জন্মের দিব্যি করে সকলের সামনে এসে বলুক, আমাদের কত টাকা ওর তপিলে জমা হয়েছে! আমার বউকে আমি খেতে দিতে পাচ্ছিনে কার জন্যে? কার জন্যে সবাই মরতে বসেছে না খেয়ে? আমাদের এ অবস্থা হয়েছে কার জন্যে—তুমিই বলো ত' মা? এর হেস্তনেস্ত না করলে আমাদের অবস্থা কি কোনোদিন ভালো হবে, তুমি মনে করো? আমি আর খাতির রাখতে পারবো না, বলে দিচ্ছি।

ওঘর থেকে ফুলি বললে, সবাই ত' সামনেই আছে, এর ব্যবস্থা করলেই হয়? এমন ঘরে বাবা আমায় রেখে গেল যে, রাতে শোবার জায়গা নেই! আমাকে ঠকিয়েছে সবাই।

তরুবালা বললেন, তুমি থামো বাছা।

কেন থামবো আমি? ময়রার মেয়ে বলে আমি মানুষ নই? আমার সখ-আহ্লাদ নেই? বাবা এসে সেবার টাকা দিয়ে গিয়েছিল, তাই ত' সবাই পেট পুরে খেলে! ছোটজাতের পয়সায় ভাত খেয়ে তবে ত' জাতধর্ম বাঁচলো! শীলু পয়সা পায় কোত্থেকে,—আমি কিছু খবর রাখিনে? ছোট বোনটা যায় কোথায়, আমি কি জানিনে কিছু? বেশী ঘাঁটিয়ো না আমাকে, আরো অনেক কথা শুনবে!—ফুলি যেন আজ সুবিধা পেয়ে হাটে হাঁড়ি ভাঙবার চেষ্টা করলো।

দীপেন বললে, কেমন? পরের মেয়ের মুখের কথা এবার শুনলে ত' মা?

কার মুখে তুমি হাত-চাপা দিতে চাও? কে না বলবে? তোমাদের ওই সোয়াগী মেয়ে ঘরে থাকতে আমাদের কপালে আরো অনেক দুঃখ আছে, এই তোমাকে বলে রাখলুম। ওর জন্যে ঘরে এই অশান্তি, ওরই জন্যে বাবার কাছে আমরা কেউ কোনোদিন আদর পেলুম না! ও যদি এতকালের সমস্ত চোরাই টাকা বের করে আমার হাতে দেয়, তাহ'লে আজই আমি সকলের অবস্থা ফিরিয়ে দিতে পারি। আসুক না অতনুদা সকলের সামনে, আমি কি সত্যি কথা বলতে কখনো ভয় পাই!

যমুনাকে আগাগোড়া পরীক্ষা ক'রে অতনু ভাস্বতীর মুখের দিকে তাকালো। বললে, তুমি টাকা চুরি করো নাকি?

ভাস্বতী হাসিমুখে তাকালো। যমুনা বললে, তুমি একটুও বিশ্বাস করো না বড়দা, ওসব দাদার নোংরা কথা!

হঠাৎ অতনু যমুনার দিকে তাকালো। এ সে যমুনা নয়। যমুনার সেই বিষাক্ত ফণা নেই, সেই কুটিলতা নেই—এ যমুনা একেবারে নতুন। মনে হলো ভাস্বতী একে স্নেহের দ্বারা অভিভূত করেছে, সেবার দ্বারা জয় করেছে। যমুনার মুখে কেমন যেন পাণ্ডুর প্রসন্নতা দেখা যাচ্ছে।

অতনু ভাস্বতীর দিকে পুনরায় তাকিয়ে বললে, টাকা যদি না নিয়ে থাকো, তাহ'লে দীপেন এমন চড়াসুরে নালিশ জানায় কেন?

ভাস্বতী হেসে বললে, অভাব থেকেই আসছে সন্দেহটা, আর সন্দেহ থেকেই আসছে অশ্রদ্ধা! ছেলেমানুষের রাগ, ওর কি কোনো মাত্রাবোধ আছে? আসল কথা, ও কিছু টাকা চায়! সম্প্রতি বিয়ে করেছে, তা ছাড়া ওর ছেলেপুলে হবে শিগ্‌গির,—অথচ কোনো রোজগার নেই! একটা সাধারণ আক্রোশ জন্মায় বৈ কি।

যমুনার হাতখানা ধরে অতনু বললে, মন খারাপ করবিনে, বেশ হাসিখুশী থাকবি, কেমন? বেশ ত' উন্নতি হচ্ছে!

কথাটা মিথ্যে! ভাস্বতী অলক্ষ্যে একবার অতনুর দিকে তাকালো। মিথ্যা সান্ত্বনা দেবার সময় ডাক্তারের মুখে-চোখে কোনোপ্রকার রেখাপাত হয় না। ভাস্বতীর চোখ দুটো যমুনার দিকে ধীরে ধীরে সরে এলো। অতনু সেদিনের মতো উঠে দাঁড়ালো।

বাইরে এসে অতনু সহাস্যে বললে, এতদিনের একটা দাগী চোর, তাকে তোরা একবার হাতেনাতে ধরতে পারলিনে?

দীপেন বললে, কেমন করে ধরবো? একদিকে বাবার আস্কারা, আর একদিকে তোমার চোখরাঙানি—আমরা কি আর মাথা তুলতে পারলুম কোনোদিন?

সবসুদ্ধ কত টাকা হাতসাফাই করেছে এতদিনে?

তার হিসেব কি আর আমাদের এখানে থাকে, থাকে অন্য জায়গায়!

কথাটার মধ্যে অতনুর প্রতি একটা কদর্য কটাক্ষ ছিল, তবুও অতনু হাসি-মুখে বললে, চোর বলেই মুখ বুজে থাকে, কি বলিস? বেঁধে মারে, সয় ভালো! নারে?

ভাস্বতীও হাসিমুখে উঠে এলো। বললে, তুমি আর উস্কিয়ে দিয়ো না, নিজের বাড়ী চলে যাও! দীপু টাকা বোঝে, তামাসা বোঝে না!

ওধার থেকে দ্বিজেন বললে, বড়দা, তুমি ত' সকলের বড়। দাওনা দাদার কান ম'লে দুটো থাপ্পড়!

অতনু বললে, আমি তোদের বড়দা নই, আমি ডাক্তার!

ডাক্তার! সে ত' আরো ভালো কথা! ওর মুখের মতন ওষুধ দিয়ে দাও না? সাপের বিষেরও ওষুধ হয়েছে আজকাল!

দ্বিজেনের কথায় অতনু আর ভাস্বতী দুজনেই হাসলো। অতনু বললে, আমি তোর দলে আছি দীপু। এক ঘরে থেকে দিনরাত দুহাতে একজন চুরি করবে, একি কখনো সহ্য করা যায়? নিশ্চয়ই এর হেস্তনেস্ত হওয়া উচিত।

তরুবালা সামনে এসে বললেন, অতনু, তামাসা ব'লে তুমি যা মনে করো, সেটা তামাসা নাও হ'তে পারে? ওঁর কান কালা নয়, ওঁর কানেও এসব কথা উঠেছে।

অতনু বললে, মাসিমা, আপনার শরীর ভালো নয়, আপনি বিশ্রাম নিন্। আচ্ছা, মেসোমশাইও কি ছেলেমানুষের এসব কথা বিশ্বাস করেন?

অবিশ্বাস করলে সাপের বিষ ত' আর উড়ে' যায় না, অতনু।

অতনু বিস্ময়াবিষ্ট চক্ষে একবার তরুবালার দিকে তাকালো। কিন্তু এ পরিবারের ভালোমন্দর সঙ্গে আজকাল তা'র যোগাযোগ নিতান্তই কম। যমুনার অসুখের জন্য ইদানীং কিছুকাল থেকে সে ঔষুধপথ্য এবং অর্থব্যয়ের

দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে নিয়েছে সত্য, কিন্তু তার বাইরে এবাড়ীর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক তা'র নেই। সুতরাং তরুবালার মুখের উপরে আর কিছু না ব'লে অতনু নতমুখে নেমে চ'লে গেল।

ভাস্বতী ব্যাকুলকণ্ঠে ব'লে উঠলো, মা, এ তুমি কি করলে? দুঃখ-দারিদ্র্য যত বড়ই হোক, পরের ছেলের সামনে ঘরের মেয়ের কপালে এমন মিথ্যে কলঙ্ক কেন তোমরা মাখাতে গেলে, মা? কি দোষ করলুম আমি?

ঘরের মেয়ে তুমি!—অসুস্থ তরুবালা মুখের একটা শব্দ ক'রে সেখান থেকে চ'লে গেলেন।

রোগীরা একে একে বিদায় নিচ্ছিল। ডাক্তার অতনুমোহন এবার উঠে ভিতরে যাবেন। একটি মেয়ে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে ছিল। মেয়েটি বিবাহিতা, সঙ্গে একটি বছর পাঁচেকের ছোট ছেলে। এতক্ষণ পরে অতনুর চোখ পড়লো তা'র দিকে। অন্যমনস্ক মুখ ফিরিয়ে অতনু বললে, আপনি ব'সে আছেন কেন?

মেয়েটি এবার আঁচলের গেরো খুলতে খুলতে বললে, আমার স্বামীকে সেদিন দেখতে গিয়েছিলেন, আপনার সেই টাকা বাকী ছিল। আজ আমি সঙ্গে এনেছি।

সেদিন টাকা দেননি কেন?

একটু থতমত খেয়ে মেয়েটি বললে, আপনাকে যে বলেছিলুম, সেদিন আমাদের টাকা ছিল না? আপনি দয়া ক'রে সেদিন যে নেন নি!

অপলক দৃষ্টিতে অতনু মেয়েটির মাথার উপর দিয়ে কোন্‌দিকে যেন তাকিয়ে ছিল, কানে তা'র কথা গেল না। টাকা হাতে নিয়ে সেই মেয়েটি বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। অতনুর মন অনেক দূরে।

এই আপনার টাকা, ডাক্তারবাবু!

অতনুর চোখ দুটো ঘুরে এসে মেয়েটির ওপর দাঁড়ালো। বললে, টাকা! কিন্তু টাকা কি হবে আমার? এত কষ্ট ক'রে কেন আপনি দিতে এসেছেন? বরং টাকার দরকার থাকলে আপনি আমার কাছ থেকেই নিয়ে যান্‌।

সময়মতো টাকা হাতে না পেয়ে ডাক্তার বোধ করি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ-প্রকাশের কথায় হঠাৎ মেয়েটির চোখদুটি যেন জ্বলে

উঠলো। বললে, এটাকা দিতে দেরি হোলো, হয়ত আপনার অসুবিধে হয়েছে, আমি ক্ষমা চাইছি। সেদিন আমাদের টাকা ছিল না!

কি যেন বলছে মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। চেয়ার ছেড়ে উঠে অতনু বললে, আপনি আর অপেক্ষা করবেন না, হয়ত আপনার স্বামী আপনাকে খুঁজছেন এতক্ষণ। এবার আপনি যান। আচ্ছা, নমস্কার।

অতনু উঠে ভিতরে চলে গেল। টাকার দিকে সে ফিরেও তাকালো না। মেয়েটি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো কতক্ষণ, তারপর কি জানি কেন আঁচলে চোখ মুছে ছেলেটির হাত ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হোলো।

ভিতরে গিয়ে অতনু ডাকলো, হরিদাস—?

আজ্ঞে, আসি বাবু।—ওধার থেকে সাড়া দিয়ে হরিদাস হাতাতাড়ি এসে দাঁড়ালো।

তোর রান্নাবান্নার কতদূর?

কখন্ হয়ে গেছে বাবু। সেই দুঘণ্টা থেকে বসে আছি,—কই—দিদির এখনো দেখা নেই!

আজই না শুক্রবার?

হরিদাস বললে, না না, সেদিকে ভুল হয়নি। সকালে দিদি এসেছিলেন, আপনি তখন স্নানের ঘরে ঢুকেছেন। কি যেন কাজে এসেছিলেন তিনি, কিন্তু দাঁড়ালেন না—গঙ্গাস্নানে চলে গেলেন।

অতনু বললে, আমি তোকে ব'লে রাখলুম হরিদাস, তিনি আসবেন না। আজ নিয়ে অনেকদিন তুই রাঁধলি তাঁর জন্যে, কিন্তু একদিনও তিনি খেলেন না। আমার বিশ্বাস, তোর রান্না তাঁর ভালো লাগে না। যাই হোক, তুই নিজে খেয়ে নে। তাঁর অপেক্ষায় থাকিসনে।

হরিদাস বললে, কেন আসবেন না বাবু? ঠিকই আসবেন। আমাকে বার বার ব'লে গেছেন দিদি।

দেখে নিস, আসবেন না তিনি। লোভ নেই ব'লেই আসবেন না, এখানে তাঁর কোনো দরকার নেই বলেই আসবেন না। তুই খেয়ে নিগে যা।

হরিদাস একটু বিমর্ষই হোলো। কিন্তু কথাটা সত্যি। এত বেলায় কেউ কারো বাড়ীতে অভুক্ত অবস্থায় সহজে যায় না। সকাল থেকে ঘড়ির কাঁটা

অনেকবার ঘুরেছে এবং অনেকদূর এগিয়েছে। অপেক্ষা করে থাকার যুক্তিযুক্ত সময়টা বহুক্ষণ পেরিয়ে গেছে, সুতরাং হরিদাসের অপেক্ষা করার আর কোনো প্রয়োজন নেই। অতনুর নির্দেশে সে এবার রান্নামহলের দিকে চলে গেল। অতনুও ক্লান্ত, সেও তার পোষাক-আসাক ছেড়ে হাত-পা ধুয়ে তার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ভাস্বতী কাছের মানুষ নয়, সে অনেক দূরের। সকল কাজ সেরে সমস্ত কথার পরে সে চলে যায় তার নিজের জগতে, যেখানে সে একা। রহস্য দিয়ে নিজেকে সে ঘেরেনি, দুর্বোধ্য সে নয়, কিন্তু তবু তার নাগাল পাবার উপায় নেই। আজ নিয়ে ইদানীং বোধ করি দশ বারো বার তার জন্য রান্না করে হরিদাস ব'সে থেকেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার আসা হয়ে ওঠেনি, দেখা হবার পর নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়েছে। হয়ত কোনো একসময় টাকা সে চেয়ে পাঠিয়েছে, টাকাও প্রস্তুত, কিন্তু তারপরেই সে নিরুদ্দেশ, দীর্ঘকাল তার কোনো খোঁজখবর নেই! হয়ত এসেছে এমন সময়, যখন অতনু বাড়ীতে নেই। হরিদাসকে ডেকে তু'লে চারটি মুড়ি আনিয়ে খেয়ে চলে গেছে। এমন সময়ও এসেছে, যখন অতনু বিছানায় ঘুমিয়ে,—সোজা সে চ'লে গেছে স্নানের ঘরে। স্নান সেরে ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকে সেই ঠাকুরটির পায়ে ফুল দিয়ে আবার নিঃশব্দে চ'লে গেছে। এমন হয়েছে, যখন অতনু আর হরিদাস বাড়ী নেই, বাইরের দিকে তালাবন্ধ, ভাস্বতী তখন পথের লোকের দৃষ্টি বাঁচিয়ে এমন জায়গায় আঁচল পেতে শুয়ে ঘুমিয়েছে, সে দৃশ্যটা অতনুর পক্ষে সত্যই অভিমানজনক মনে হয়েছে। এ নিয়ে অনেক নালিশ, অনেক মান-অভিমান, অনেকপ্রকার চিত্তবিক্ষোভ ঘটে গেছে, কিন্তু ভাস্বতীকে সংশোধন করা সম্ভব হয়নি। মাথার চুলের যত্নের অভাবে জট পড়েছে, শরীরের যত্নের অভাবে মালিন্যের ছাপ পড়েছে, পথের ধূলায় দুই পা ভরেছে, অনাহারে জীবনী শক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে কিন্তু তাকে শাসন করো,—সামনে দাঁড়িয়ে নিষ্কলুষ আনন্দে হেসে দিল; অন্তরের ঐশ্বর্য বাইরে প্রকাশ পেলো, কিন্তু আশ্চর্য তার জ্যোতির্ময়তা! লাঞ্ছনা তার মাথা ছাপিয়ে উঠেছে, অপমানে সে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়েছে, চারদিকের দুষ্ট চক্রান্তের বিষবাষ্পে তার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছে, কিন্তু সামনে এসে যখন সে দাঁড়ালো, মনে হোলো, এঁকে কোনো কিছু স্পর্শ করে না। এ যেন সর্বপাপহারিণী গঙ্গার গৈরিক ধারা,—এর উপর দিয়ে সমস্ত মালিন্য

আর জঞ্জাল ভেসে চলেছে, তবু এর শুচিতা আর নির্মলতা পলকের জন্যও ক্ষুণ্ন হয়নি।

অনেককাল আগে একদিন তামাসা ক'রে অতনু বলেছিল, কোনো কিছুই তোমার কাছে আমি চাইতে সাহস করলুম না। কিন্তু যেটা লোকে সহজে পায়, সেটাতেও ফাঁকি পড়লুম!

ভাস্বতী হাসিমুখে বলেছিল, এমন কী সস্তা জিনিস, যা সহজে না পেলে লোকে রাগ করে?

অতনু জবাব দিল, কই, তোমার মন ত পেলুম না, চীনু?

হাত পেতে চাও, এক্ষুণি দিয়ে যাচ্ছি! বলতে বলতেই ভাস্বতী একেবারে হেসে লুটোপুটি। হাসি থামবার পর আবার নিজেই সে বললে, যা চোখে দেখা যায় না, হাতে পাওয়া যায় না, যেটা কোনো পদার্থই নয়, তার জন্য সবাই এমন হাত বাড়ায় কেন বলো ত? মন পেলে না, ভালোবাসা পেলে না, সুতরাং রাজ-সম্পদ মিথ্যে মনে হোলো! আকাশটা শূন্য, কোথাও কিছু নেই সেই শূন্যে,—মানুষ সেই দিকে চেয়ে কেঁদে বললে, ঈশ্বরকে চাই, তাঁকে না পেলে সব মিথ্যে! তোমাকে বুঝি আজকাল সেইসব নেশায় পেয়ে বসেছে, ডাক্তার?

ভাস্বতীর চোখ দুটো কৌতুক আর আনন্দে উজ্জ্বল। অতনু বললে, তুমি যে পুতুলের পায়ে মাথা ঠোকো, তার পায়ে ফুল দাও,—ওটা তবে কি?

ওটা যে চিরকেলে নেশা! মানিনে বললে নিন্দে হয়, বিশ্বাস করিনে বললে মার খাই, স্বীকার করিনে বললে কোথাও ঠাঁই পাইনে! ওটা আছে বললে সবজায়গাতেই কল্কে পাই!

অতনু বললে,—ভগবান আছেন, একি তুমি স্বীকার করো না?

ভাস্বতী আবার হেসে লুটোপুটি। বললে, ওই দ্যাখো, তুমি যে যুদ্ধের সৈনিক, তুমি যে মানুষমারার ফাঁদে ধরা দিয়েছিলে, ওই কথাটায় তোমারও গলার আওয়াজ নরম হয়ে আসে। ভূত নেই বলতে তোমারও গা ছমছম করে! কিন্তু ওটা না থাকলে গরীবের চলবে কেমন ক'রে বলতে পারো? ওটাই যে সান্ত্বনা, ওটাই আশ্রয়! ওটার মুখ চেয়ে থাকলে দারিদ্র্য সইতে পারা যায়, ওটার পেছনে ছুটলে মানুষের অনেক অসন্তোষ আর অতৃপ্তি ঘোচে। ওটা যে নেশা। আমি স্বীকার করি বৈ কি, ওটা যে আমার মনের ফাঁক। ওই ফাঁক দিয়ে দেখতে পাই বাইরেটা, ওই ফাঁকে আকাশটা চোখে পড়ে!

এসব ত নাস্তিকের পরিহাসের কথা, চীনু?

কী এসে যায়?—ভাস্বতী বললে, আছে কি নেই, এসব হোলো তর্ক, আল্‌সে মনের আস্কারা। আছে বলে ছুটবো কেন, নেই ব'লে মুখ ফেরাবো কেন? এসব আলোচনা মিথ্যে। যেটা বস্তু নয়, পদার্থ নয়—বহুকাল থেকে কেবল একটা ধারণার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে তা নিয়ে তোমার আমার মাথা-ফাটাফাটি কেন? ভাত-কাপড় না পেয়ে যারা মরতে বসেছে, মাথা গোঁজবার ঠাঁই না পেয়ে যারা পথো কুকুরের মতন পথে পথে জায়গা নিয়েছে, তারা যদি তোমার ভগবানের নামে সান্ত্বনা পায়, মন্দ কি? আমার পক্ষেও সেই এক কথা, আমিও ওটাতে রস পাই!

অতনু বললে, কিন্তু তোমার অভাব-অভিযোগ সহজেই ত তুমি মেটাতে পারতে, চীনু?

ভাস্বতী বললে, সকলের না মিটলে আমার মিটবে কেমন ক'রে? নিজে খাবো, আর সবাই পেট বাজিয়ে ঘুরবে, সে যে আমার পক্ষে মস্ত অপমান! তা হয়না, অতনু, নিজের সুখ খুঁজে বেড়ানোর চেয়ে বরং ভগবানকে খুঁজে বেড়ানো অনেক শোভন। প্রথমটা নোংরা কাজ, অন্যটা অকাজের কাজ।

সেদিন ভাস্বতী উৎফুল্ল হাসি হেসে এই কথাগুলো অনর্গল ব'লে গিয়েছিল।

অতনু একদিন বললে, যুদ্ধ বাধলে আমি চলে যাবো, তুমি তখন কি করবে?

ভাস্বতী বললে, তোমার যাওয়ার সঙ্গে আমার কর্তব্যের যোগ কোথায়, ডাক্তার? আমি যেমন আছি, তেমনিই থেকে যাবো।

অন্য কোনো রকমের জীবনযাত্রা কি তুমি ভাবতে পারো না?

ভাস্বতী মুখ তুলে তাকালো। বললে, মানে?

অতনু বললে, নতুন ঘর, নতুন ঘরকন্না, নতুন অবস্থা!

হাসিমুখে ভাস্বতী বললে, তুমি কি যাবার আগে আমার সেই আদিম লোভটাকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে যেতে চাও!

অতনু বললে, না, তোমার স্নেহমোহ কোনোটাই নেই জানি, কিন্তু ভালোবাসা? যার জন্যে মানুষ আবহমান কাল থেকে ঘর বেঁধে এসেছে?

ভাস্বতী বললে, ছোট ঘরটাই আজ বড় হোক না, ডাক্তার? নিজেকে ভেঙে গ‍ুঁড়ো করে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিই না কেন?

অতন‍ু চুপ করে গেল। কিন্তু একট‍ু পরেই উত্তেজিত হয়ে সে বললে, আদিম লোভটাকে তুমি গাল দিচ্ছ, কিন্তু সেই আদিম বাসনাটাকে তুমি মানতে চাওনা কেন? মান‍ুষ তার পরিচয়কে রেখে যায় বংশপরম্পরায়, তার পরিণতি হোলো নিজের সন্তানসন্ততির স‍ৃষ্টিতে, এটাকে ব‍ুঝতে তোমার দেরি হয় কেন?

ভাস্বতী আবার এক ঝলক হাসি হাসলো। বললে, কেন ব‍ুঝবো না, নিশ্চয় ব‍ুঝি। কিন্তু যদি বলি, আমার সন্তানসন্ততির অভাব নেই? যেদিকে চোখ যায়, দেখি তারাই রয়েছে!

এ তোমার আকাশ-কুস‍ুম, চীন‍ু।

বিশ্বাস করলে না তুমি?

বিশ্বাসযোগ্য নয়।

যে চেতনা মনের মধ্যে সত্য করে পাই, তাকে তুমি সত্য ব'লে স্বীকার করবে না? যেখানে ভালোবাসার জন্ম, সেখানেই ত বাৎসল্যের জন্ম! অপরিচিত একটা লোককে স্বামী ব'লে স্বীকার করি, আর অপরিচিত ছেলে-মেয়েকে সন্তান ব'লে জানবো না কেন? কেন তাদের স‍ুখদ‍ুঃখের ভাগী হতে পারবো না? অবস্থার দারিদ্র্য বরং সহ্য হয়, কিন্তু অন্তরের দারিদ্র্য একেবারেই অসহ্য ডাক্তার!

অতন‍ু বললে, কিন্তু যে-জীবনের ভেতর দিয়ে এতকাল ধরে পেরিয়ে এলে, তাতে কি তুমি সত্যকার আনন্দ পেয়েছ?

ভাস্বতী বললে, এও তোমার সেই কথার কৌশল, অতন‍ু! আনন্দবোধটা সকলের কাছে সমান নয়। আমাকে দ‍ুটো নোংরা কথা বলতে পারলে দীপেন আনন্দ পায়, আমার ম‍ুখ থেকে দ‍ুটো ভালো কথা শ‍ুনলে হয়ত তুমি আনন্দ পাও। আমি যাতে আনন্দ পাই, তুমি তার কথা শ‍ুনলে দ‍ুঃখবোধ করো। তুমি যাতে আনন্দ পাও, আমি হয়ত তার মধ্যে কোনো অর্থই খ‍ুঁজে পাইনে!

অতন‍ু সেদিনকার সেই আলোচনা আর বাড়ায়নি, ম‍ুখ ফিরিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। ক্ষোভ ছিল তার মনে মনে।

অবেলার কোনো একটা সময়ে হরিদাস বোধ করি একবার জানতে এসেছিল,

অতনু এখন চা খাবে কিনা, কিন্তু সে এসে দেখে গেল, অতনু অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন অসময়ে সহসা কোনো দিন ডাক্তারের ঘুম আসে না, কিন্তু কিছুদিন থেকেই হরিদাস লক্ষ্য করে আসছে, অতনুর চোখে মুখে যেন বিষণ্ণ অবসাদের একটা ছায়া পড়েছে; এর মূল কারণটা হরিদাসের নিতান্ত অজানা নয়।

হরিদাস ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই ভাস্বতী ভিতরে এসে ঢুকলো। তাকে দেখেই হরিদাস রেগে উঠলো, দিদি, তোমার কাণ্ডটা কি বলো ত? সারাদিন ধ'রে ছিলে কোথায়?

খুব রাগ করেছ তোমরা, না হরিদাস?

একটুও না দিদি, রাগ করলে লোকে একটু গরম হয়, কিন্তু তোমাকে দেখে জুড়িয়ে জল হয়ে গেলুম! এই অবেলায় ভিজে কাপড়ে এলে, অসুখ-বিসুখ করে যদি?

ভাস্বতী বললে, পাঁচজনের কাজ নিয়ে যে থাকে, তার কি অসুখ করলে চলে ভাই?

হরিদাস বললে, আজ না তোমার এখানে খাবার কথা? সারাদিন পেটে কিল মেরে রইলে ত?

হাসিমুখে ভাস্বতী বললে, হরিদাস, তুই বুঝি ডাক্তারের মতন ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করিসনে? ঠাকুর কি কখনো তাঁর কোনো জীবকে না খাইয়ে রাখেন?

হরিদাস একবার থমকে দাঁড়ালো। তারপর বললে, তোমাকে চেনা ভার, দিদি। এ বুড়োর এ জন্ম কেটে যাবে তোমাকে চিনতে! তুমিই না সেদিন ঝগড়া ক'রে ডাক্তারকে বোঝালে, ঠাকুর-দেবতাও নেই, ভগবানও নেই! আজ বুঝি কালীঘাটে গিয়ে আবার মত বদলে ফিরলে? যা খুশি করো দিদি, আমি ছাদে হাওয়া খেতে চললুম। তোমার খাবার-দাবার সব রইলো রান্নাঘরে।

ভিজা কাপড়ের আঁচল থেকে প্রসাদী ফুল বে'র ক'রে ভাস্বতী তাড়াতাড়ি একবার হরিদাসের মাথায় ঠেকিয়ে নিল। হরিদাস চ'লে গেল।

সমস্ত পথটাই সে চ'লে এসেছে দ্রুতপদে নিজের মনে। কিন্তু তা'র পরনের কাপড়খানা যে ভিজে, হরিদাসের বলবার আগে একথা এতক্ষণ ভাস্বতীর মনে ছিল না। একবার সে থম্‌কে দাঁড়ালো, একবার ইতস্তত

করলো,—কিন্তু তারপরে এসে দ্রুতপদে ঘরে যখন ঢুকলো, হঠাৎ চোখে পড়লো অতনু ঘুমিয়ে। একটু তা'র খটকা লাগলো—কেন না, এমন সময় অতনু যায় তা'র সেই চেম্বারে। ভাস্বতীর সন্দেহ হোলো, ডাক্তারের শরীর হয়ত সুস্থ নয়। পিছন দিকে এসে সে একবার চুপ ক'রে দাঁড়ালো।

চেতনার প্রথম উন্মেষ ভাস্বতীর আজও মনে পড়ে, যখন তা'র বয়স সাত, আর অতনুর এগারো। কিশোর বালকের পক্ষে সারাদিনের খেল্‌না ছিল ভাস্বতী নিজে। একজনের পরনে থাকতো ঘাগরা, আরেকজনের হাফপ্যাণ্ট্‌। খেলার বাইরে চোখ পড়তো না, দুরন্তপনার বাইরে মন ছুটতো না। সুশীলার মৃত্যুর পর মৃগেন্দ্র যেদিন অতনুকে বাড়ী থেকে সরিয়ে দিলেন, সেদিন কুটুম্ব-সম্পর্কে'র মানসর্ম্মানের ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়েছিল বটে—কিন্তু নাবালিকা ভাস্বতী এটি উপলব্ধি করেছিল, প্রিয়জনকে একে একে এমনি ক'রেই ছেড়ে দিতে হয়। ছোট্ট মেয়েটির মধ্যে সেদিন বিয়োগ-বিচ্ছেদের অস্পষ্ট চেতনা জন্ম নিয়েছিল বৈ কি। পিতামাতা, ভাইবোন, প্রতিপালিকা সুশীলা,—একে একে তাকে ছেড়ে গিয়েছে,—সুতরাং অতনুরও সেই যাবার পথ! কাউকে ধ'রে রাখা যায় না, নিবিড়ভাবে একান্ত ক'রে কেউ আপন হয় না, কোনো কিছুর স্থিতিস্থাপকতা নেই, আনন্দের কোনো সামগ্রীর কোনো স্থায়িত্ব নেই। ওইটুকু বয়স থেকে সম্ভবত সেই কারণেই ভাস্বতীর চোখ বাইরের থেকে নিজের মধ্যে ঘুরে এসে দাঁড়িয়েছে; আত্মগত মন নিজের ভিতর থেকেই নিজের আনন্দের উপচার সংগ্রহ করেছে। আজ তিরিশ বছর বয়স হ'তে চললো ভাস্বতীর, কিন্তু আজ তা'র ভুল ভেঙেছে। মনোবন্ধনের বিচ্ছেদ হয়ত আছে, কিন্তু মৃত্যু নেই। এগারো বছরের ছেলে একদা যেদিন ভাস্বতীদের বাড়ী ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, সেদিন এই ছেলেটাই কেঁদে ভাসিয়েছিল, ভাস্বতী কিন্তু হেসেই অস্থির। আজ ভুল ভেঙেছে এই কারণে যে, বিচ্ছেদও নেই, মৃত্যুও নেই,—আছে শুধু বিধিনিষেধ, আছে শুধু দূরবর্তিতা। কাছের মানুষ যদি দূরে থাকে থাক্‌, কেন না, যতদূরেই সে থাক্‌—সে ত' কাছেই আছে!

অতনুর বালিশের তলা থেকে আলমারির চাবি নিয়ে নিঃশব্দে ভাস্বতী একখানা ধুতি বে'র ক'রে নিয়ে গেল, তারপর কাপড় বদলে এসে সেই প্রসাদী ফুল নিয়ে নিদ্রিত অতনুর মাথায় ঠেকিয়ে নিজের মাথায় ঠেকালো। এটুকু

কোনো অর্থ বহন করে না, কিন্তু এটুকু পরমার্থের সংবাদ আনে। কথা উঠবে ভালোবাসার! কিন্তু ভালোবাসার বাইরে কি কিছু নেই? জীবনের বাইরে কি অমৃত নেই? মৃত্যুর বাইরে কি মহাজীবন নেই? পৃথিবীর বাইরে কি স্বর্গ নেই? সমগ্র জৈব-জীবনের বাইরে মানবতার যে মহৎ উপলব্ধি,—সেই প্রেমের মধ্যে ঐকান্তিক কল্যাণের কথাটা কি নেই?

আবার সেই পুরনো বিতর্কটা ওঠে ভাস্বতীর মনে মনে। কিন্তু কথাটা চাপা দিয়ে সে এগিয়ে আসে। ঘরখানা তেমনি আবার অগোছালো হয়ে রয়েছে, হরিদাসের যদি এতটুকু হুঁস থাকে। সেই সে-বছরের ফুলদানিটা—ভাস্বতী যেটি পছন্দ ক'রে কিনে দিয়েছিল,—সেটির গায়ে ধুলো জমেছে। টেবিলের ঢাকা যত ফর্সাই হোক, কতকাল ধোপার বাড়ীতে দেওয়া হয়নি। ডাক্তারের হ্যাণ্ডব্যাগটি খোলা, হরিদাসের চোখ এদিকে কিছুতেই পড়েনা! কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা নেই, কেন নেই—জিজ্ঞাসা করো দেখি হরিদাসকে? আর ওই দেখো জামাটা ছাড়া রয়েছে খাটের বাজুতে, ওটাকে আলনায় তুলে রাখতে কি এতই পরিশ্রম হয়? কুঁজোর পাশে গেলাসটি কতকাল মাজা হয়নি বলো ত?

ভাস্বতী গিয়ে ফুল-ঝাঁটা নিয়ে এলো বাইরের থেকে। তারপর চুপি চুপি উবু হয়ে সমস্ত ঘরখানা পরিচ্ছন্ন ক'রে ঝাঁট দিল। পাছে ঘুম ভাঙে অতনুর, কী লঘু তা'র পদক্ষেপ! তারপর বাইরে গিয়ে সে নিজের ভিজে কাপড়খানা রান্নাঘরের বারান্দায় শুকোতে দিয়ে এলো। এবার অন্ধকার হয়ে এসেছে, আলোটা না জ্বাললে আর চলে না। কিন্তু আলোটা জ্বাললে অতনুর চোখে লাগবে, সুতরাং সে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগলো। সকালবেলা সে আজ বেরিয়ে পড়েছে বাড়ী থেকে,—যমুনার অবস্থা দেখে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল গঙ্গাস্নানে আর ঠাকুরতলায়—এবারে তাড়াতাড়ি না ফিরে গেলে আর চলছে না।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ ক'রে এবার হরিদাস নেমে এলো। বললে, আলো জ্বালোনি বুঝি দিদি? এই যে আমি জেলে দিই।

ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালতেই অতনু এবার জেগে উঠলো। হরিদাস বললে, চা চড়াবো, বাবু? দিদি এসেছেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে অতনুর মন্তব্যটা ভাস্বতীর শোনা চাই বৈ কি। অতনু বললে, সারাদিন পরে বুঝি এবার দিদির পেট জ্বলেছে?

হাসিমুখে ভাস্বতী ভিতরে এসে দাঁড়ালো। বললে, পেট না জ্বললে কি এ বাড়ীতে কখনও আসিনি, ডাক্তার? আমার ক্ষিধে পায় না, তা জানো?

তা জানি। গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলে, আদিগঙ্গায় অনেক জল ছিল!

ভাস্বতী কাছে এলো। বললে, একদিন তুমিই না বলেছিলে, আমার হাসিমুখ দেখলে তোমার রাগ প'ড়ে যায়?

অতনু বললে, তখন আমি বছর পঁচিশেক বয়সের অর্বাচীন ছিলুম।—এখন হাসি দেখলে রাগ হয়!

কেন বলো ত? বুড়ো হয়েছি ব'লে?

না,—অতনু বললে, তোমার ওই হাসিতে আমার চিরকালের সর্বনাশ লুকিয়ে আছে, সেই জন্যে!

ভাস্বতী বললে, এ সব জেনেও ত' তুমি একদিন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে?

বিছানা ছেড়ে উঠে অতনু এসে চেয়ারে বসলো। বললে, বিয়ে করলে হয়ত তোমাকে শোধরাতে পারতুম। এমন ক'রে পথে পথে তোমাকে ঘুরতে দিতুম না!

ভাস্বতী খুব হেসে উঠলো। বললে, পথেই যার জীবনের সুরু, তাকে ঘরে তুলে আনলে ঘরে সে কি থাকতো, অতনু? বনের পাখী বনে না থাকলে বাঁচে কি?

হরিদাস বাইরে গিয়েছিল, অতনু তাকে ডেকে চায়ের ফরমাস দিল। ভাস্বতী বললে, রাগ ক'রো না, ডাক্তার। তুমিও জানো, যমুনাকে কোনোমতেই বাঁচানো যাবে না। কিন্তু কালীঘাটে গিয়ে 'দণ্ডী' দিলে যদি সে বাঁচে, তাই গিয়েছিলুম, গঙ্গায়।

অতনু মুখ ফিরিয়ে বললে, 'দণ্ডী' কি?

মন্দির থেকে বুকে হেঁটে দাগ টেনেটেনে যাওয়া গঙ্গায়, আবার স্নান ক'রে ভিজে কাপড়ে বুকে হেঁটে আসা মন্দিরে। পথের ধুলো সর্বাঙ্গে মেখে শুয়ে-শুয়ে আসা,—বুঝেছ?

তামাসা দেখবার জন্যে লোক জড়ো হয়নি?—অতনু বক্রোক্তি করলো।

ভাস্বতী খুব হাসলো। বললে, অনেকে দুধারে দাঁড়িয়ে যায় বটে। মনে করে, আহা, মেয়েটার কী দুর্দশাই হচ্ছে! বোধ হয় বিধবা,—বোধ হয় ওই

একটি শিবরাত্রির সলতের জন্যেই বুঝি মানত করেছে! আহা, বাছারে! এক সন্তানের মায়ের বুকের জ্বালা বিধবা না হ'লে কে বুঝবে বলো? কেউ-কেউ বা কেঁদেই আকুল!

অতনু বললে, এমন উদ্ভট কথাবার্তার জবাব দিলে কী তুমি?

ভাস্বতী বললে, এখানে ব'সে তুমি আমার ওপর রাগ করছ, কিন্তু ওখানে আমার অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছিল, তুমি বোঝো! তাদের কথার উত্তরে কি বলবো ভেবে পাইনে। এদিকে ধুলোবালির পথে বুকে হাঁটতে-হাঁটতে মা-কালীর কাছে যমুনার প্রাণ ভিক্ষে চাইবো, না ওদিকে একদল লোককে বোঝাবো যে, যার জন্যে 'দন্ডী' দিতে এসেছি, সে আমার সন্তান নয়, স্বামী নয়, মা-বাপ নয়, এমন কি সহোদর ভাইবোনের মধ্যেও সে পড়ে না। যার জন্যে 'দন্ডী' দিচ্ছি, তার হাতে ঝাঁটা খেয়েছি দিন-রাত,—কিন্তু কি করবো বলুন, তা'র বাপের ভাত খেয়ে আমি যে মানুষ!

অতনু হো হো ক'রে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। ভাস্বতী বললে, দাঁড়াও, আরো আছে। মায়ের দরজায় ব'সে ব'সে কাঁদলুম খানিক,—কত হা-হুতোশ, কত মাথাকুটোকুটি,—হঠাৎ মনে হোলো, ওমা, কী করছি আমি! কেন করছি! যাঁকে মা বলে ডাকছি আর কাঁদছি,—তিনি রয়েছেন শুধু জিব বা'র ক'রে! তিনি যদি যমুনাদের দারিদ্র্য ঘুচিয়ে দেন, তবেই ত' সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়। যারা লটারির টিকিট কিনে মন্দিরে এসে মাথা ঠোকে, তাদের মাথা-খোঁড়ার যুক্তি আছে—এ আমি বিশ্বাস করি, ডাক্তার। আমার কি মনে হয়, জানো? গরীবের কথা ঠাকুরের কানে ওঠে না! আর কিছু না হোক, বাবার হাতে তিনি কিছু টাকা পাইয়ে দিতে পারতেন? বরুণার একটা কোনো কাজ? দীপেন-দ্বিজেনের চাকরি? মায়ের জন্যে একটু ভালো ব্যবস্থা? যমুনার জন্যে একটি মনের মতন বর? মাঝ থেকে 'দন্ডী' খাট্‌তে গিয়ে কালীঘাটের ভিড়ের মধ্যে আমি একেবারে বোকা ব'নে এলুম! মা-কালীর কাছে আমার এতটুকু মানসম্ভ্রম রইলো না!

অতনু আবার হেসে উঠলো। বললে, তোমার ক্ষিধেটা গেল কিসে?

ভাস্বতী বললে, মন্দিরে ঘুরে বেড়ালে একটা বারোয়ারিতলা খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানে ছোঁক ছোঁক করতে পারলে পেটটা ভরে বৈ কি।

অতনু সহসা গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, সেটাও কি ঠাকুরের প্রসাদ?

হাসিমুখে ভাস্বতী বললে, যেদিন 'দণ্ডী' খাটা হয়, সেদিন ঘরের খাওয়া খেতে নেই, ডাক্তার!

অতনু চুপ ক'রে গেল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে সে বললে, চেহারাটা তোমার কেমন দাঁড়িয়েছে, একবার আয়নায় দেখেছ? চোখ দুটো লাল হয়ে রয়েছে সারাদিনের রোদ্দুরে!

হরিদাস দু' পেয়ালা চা এনে সামনে রাখলো। অতনু বললে, দু' পেয়ালা কেন রে? 'দণ্ডী' খেটে এলে পরের বাড়ীতে কিচ্ছু খেতে নেই!

পরিহাসটির অন্তর্নিহিত অভিমানটুকু দুর্বোধ্য নয়। হাসিমুখে ভাস্বতী বললে, চায়ে দোষ নেই, হরিদাস। চা একটু খাবো। গায়ে এখনও শীত আছে। কাঁটা দিচ্ছে।

অতনু বললে, ওটা ভক্তিভাবের রোমাঞ্চ, অমন হয়।

হরিদাস মুখের হাসি চেপে চ'লে যাবার পর অতনু পুনরায় বললে, ওদের কথা আমি ধরিনে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমাকেও নষ্ট করেছে দারিদ্র্য!

ভাস্বতী বললে, এমন ত' হতে পারে, আমি নষ্ট করেছি দারিদ্র্যকে? আমার হাতে প'ড়ে দারিদ্র্যের মান থাকেনি, গৌরব বাড়েনি! যদি বলি আমার চেয়ে সুখী কেউ নেই, আমার চেয়ে আনন্দ কেউ কোনোদিন পায়নি?

নিজেকে স্তোকবাক্যে আর কতদিন ভোলাতে চাও?

চায়ে চুমুক দিয়ে ভাস্বতী বললে, এমন কোনো জিনিস আছে, যা আমি পাইনি? বলতে পারো?

প্রশ্নটা সহজ, সুস্পষ্ট—এর কোনো জবাব নেই। কিন্তু তবু অতনু উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে, আগে আমার কথার জবাব দাও, চীনু। বাড়ীতে কি তোমার কোনো সম্মান আছে? অপমানে আর লাঞ্ছনায় কি তোমার মাথা ধুলোয় লুটোচ্ছে না? একদিন ওখানে তুমি আশ্রয় নিয়েছিলে, তখন তুমি শিশু, কিন্তু কী মূল্য দিয়ে সেদিনের সেই কৃতজ্ঞতার দেনা শোধ করছ,— ভেবে দেখেছ কি? জেনেছ কি, কিছুতেই তারা আর তোমাকে ঘরের মেয়ে ব'লে মানতে চাইছে না? দারিদ্র্য নষ্ট করেছে স্নেহ প্রীতি বাৎসল্য শ্রদ্ধা ভালোবাসা,—সব কিছু, এ কি তোমার চোখে পড়ছে না? পদে পদে যেখানে তুমি মুখ বুজে অনাচার সইছো, প্রতিদিন যেখানে অপমানে তোমার মনুষ্যত্ব

মাথা হেঁট করতে বাধ্য হচ্ছে,—সেখানকার প্রতি তোমার অন্ধ আসক্তির মানে আছে কিছু? এরই নাম কি তোমার মহৎ ভালোবাসা?

শান্তকণ্ঠে ভাস্বতী বললে, বড় ভালোবাসা বড় আঘাত আর অপমান সইতে জানে ডাক্তার!

মনুষ্যত্ব খুইয়ে?

সমস্ত জীবন খুইয়েও!—ব'লে ভাস্বতী আজকের মতো উঠে দাঁড়ালো।

অতনু চুপ ক'রে গেল। ভাস্বতী বাইরে এসে বললে, হরিদাসকে বলো ত' একখানা রিক্‌সা ডেকে আনতে? হেঁটে যেতে যেন আর ভালো লাগছে না।

অতনু তখনও চুপ ক'রে রয়েছে দেখে ভাস্বতী পুনরায় বললে, তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, রিক্‌সা-ভাড়াটা বোধ হয় তুমি দিতে অনিচ্ছুক, তাই না?

খুব সম্ভব।—অতনু জবাব দিল।

হরিদাস রিক্‌সা আনতে গেল। এই কাছেই রাস্তার মোড়ে। তাকে পাঠিয়ে ভাস্বতী বললে, তোমার এই বাড়ীতে এসে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকলে বোধ হয় তুমি সবচেয়ে বেশী খুশী হ'তে ডাক্তার?

ডাক্তার এবার নিশ্চিত সন্দেহে কাছে এগিয়ে এসে ভাস্বতীর একখানা হাত ধরলো। তারপর তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, নিজের ওপর অত্যাচারের সীমা আছে, তা জানো? জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে তোমার গা। জ্বর নিয়ে বাড়ী যেতে পারো, কিন্তু কোনো পরিশ্রম না ক'রে জ্বর নিয়ে প'ড়ে থাকলে সেখানে তারা কি তোমাকে ক্ষমা করবে?

ভাস্বতী বললে, ছি, এমন কথা বলতে নেই, ডাক্তার। সেখানে যতই হোক, মা-বাবা এখনো আছেন। আমার অসুখ কখনো করেনা, আজ জ্বর দেখলে দীপেন-দ্বিজেনই বলো, আর যমুনা-বরুণাই বলো, সবাই দুর্ভাবনায় প'ড়ে যাবে।

জ্বরের ঘোরে ভাস্বতীর দুটি চক্ষু আবিল, তবু সেই দৃষ্টি শান্ত। অতনু চেয়ে দেখলো, মুখে চোখে তার অকম্প আত্মবিশ্বাস দীপ্যমান। একটি কথাও আর অতনু বললে না। ভাস্বতী কেবল একটু স্নিগ্ধ হাসি হাসলো। হরিদাস রিক্‌সা আনলো, গাড়ীমুড়ো নিয়ে জ্বরগায়ে ভাস্বতী একা চললো।

আট

চায়ের দোকানের চাকরি থেকে অন্তু হঠাৎ সেদিন বিতাড়িত হোলো। ছেলেটার অপাট আর বরদাস্ত করা যায় কতদিন? কাজ-কর্মে কেবল যে তার অবহেলা তাই নয়, সমস্ত কাজেই তার কেমন অসন্তোষ। জিনিসে যত্ন নেই, খদ্দেরের প্রতি সম্মান নেই, চাকরি-রক্ষার প্রতি বিন্দুমাত্র তার আসক্তি নেই। গালমন্দ করলে গ্রাহ্য করে না, মাইনে কাটলে ভ্রূক্ষেপ নেই—যেমনি সে বেপরোয়া, তেমনি একগুঁয়ে। দোকানদার সেদিন সকলের সামনেই তাকে ঘাড় ধরে দোকান থেকে বার করে দিল।

কিন্তু তার চাকরির দাম দশ টাকা এবং এই দশ টাকাই হোলো দীপেনের একমাত্র নিয়মিত মাসিক সম্বল। ওই দশ টাকা লোকসমাজে দেখিয়ে প্রতি মাসে সে অন্তত পনেরো টাকা ধার করে। শ্বশুরবাড়ীর এসীমানায় যেতে তার কুণ্ঠা আছে, কেন না, প্রায় প্রত্যেকের কাছে পৃথকভাবে গোপনে সে টাকা ধার ক'রে রেখেছে। শালা-শ্যালী, শাশুড়ী, পিসি-শাশুড়ী, ভায়রাভাই, এমন কি ময়রার দোকানের দুজন কারিগর,—তাদের কাছেও ধার করেছে। জামাই হোলো ব্রাহ্মণসন্তান,—সুতরাং হাত পেতে পাঁচ টাকা চাইলে অন্তত একটি টাকাও দিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় অন্তুর চাকরি যাওয়া মানে, দুর্গতির আর সীমা থাকবে না। এদিকে বন্ধুসমাজে তার প্রতিষ্ঠা কম, ধারকর্জ পাবার সম্ভাবনা তার চেয়েও কম। সুতরাং চারদিকে অকুলপাথার দেখে অন্তুর ওপরেই সে রেগে আগুন হয়ে উঠলো।

চায়ের দোকানের সামনে পথের ধারে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। সে মামা এবং অভিভাবক, অতএব তার দাবি সকলের আগে। কে না জানে, একালের বালকরা অভিভাবকদের অবাধ্য হচ্ছে? কে না জানে, শাসনের অভাবে ছেলেদের ভবিষ্যৎ হচ্ছে একেবারে ফর্সা? এমন যে দেবতুল্য মামা, মাতৃহীন শিশুকে কোলে পিঠে ক'রে যে বড় ক'রে তুললো, নিজে না খেয়ে যে ব্যক্তি ভাগ্নেকে খাইয়ে প্রতিপালন ক'রে এলো এতকাল,—আজ একটু বড় হতে না হ'তেই সেই মহামতি মাতুলকে এক তুড়িতে উড়িয়ে দেওয়া? এরাই কি স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ? এরাই কি দেশে নতুন জাতির সৃষ্টি করবে? গুরুজনের

প্রতি শ্রদ্ধা নেই, কর্মজীবনের প্রতি অনুরাগ নেই, সমাজ ও পরিবারের প্রতি কল্যাণবোধ নেই—শুধু অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে আলস্যে দিনগুলো কাটানো? এরা কি কোনোদিন মানুষ হ'তে শিখবে না?

চুলের মুঠি ধ'রে ফুটপাথের ধারে অন্তুকে ফেলে দীপেন লাথি মারতে লাগলো। কী উত্তেজনা তার, কী ভীষণ আক্রোশ, কী পৈশাচিক আক্রমণ! কিন্তু পথের লোকে জানবে কতটুকু? তারা কি ভুক্তভোগী? দেশের এই দুর্দিনে যদি প্রত্যেকটি ছেলের চরিত্রের মূলভিত্তি দৃঢ় না হয়, তবে তারা কোথায় দাঁড়াবে? এদের মতো ছেলে সমাজের শত্রু, জাতির শত্রু, প্রত্যেক পরিবারের শত্রু!

দীপেন উন্মত্তের মতো অন্তুকে থেঁৎলাতে লাগলো। অন্তু উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল পথের ধারে। জনতা বললে, মারধর করছে বটে, কিন্তু এমন মামা ক'জনের হয়! মামার বুক যে ফেটে যাচ্ছে, কেউ কি বোঝে? কিন্তু ছেলেটা কি ত্যাঁদোড় দেখেছ? অত মার খাচ্ছে, তবু মুখে একটু শব্দ নেই! হাড়ের মধ্যে ভেল্‌কি!

একজন বললে, ও মশাই, অত মারছেন, ওদিকে যে নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে, পুলিশ আসবে এক্ষুনি!

দীপেন তৎক্ষণাৎ থামলো। থেমে বললে, খবরদার, বাড়ীতে পা দিবিনে। এই আমি চললুম। এত কষ্টে চাকরি ক'রে দিলুম, আবার আমি বসিয়ে বসিয়ে ভাত জোগাবো? খবরদার,—চাকরি যদি করিস তবেই বাপের ঠাকুর, আর নইলে পথের কুকুর!

অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হ'য়ে দীপেন হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ীর দিকে চলতে আরম্ভ ক'রে দিল। কে একজন লোক তাড়াতাড়ি সামনের পানের দোকান থেকে জল এনে অন্তুর মাথায় ঢালতে লাগলো। মনে পড়ছে ওর মায়ের মৃত্যু-শয্যাটা। অস্পষ্ট স্মৃতি হলেও অন্তুর এখনো মনে আছে। সবাই ঘিরে বসেছে তার মায়ের চারদিকে। তেলের পিদিমটা জ্বলছে একপাশে। মা বলেছিল, দীপু, তোর হাতেই অন্তুকে দিয়ে গেলুম, ওকে তুই দেখিস, ভাই!

মাথা আর মুখের জল দু হাতে সরিয়ে গেঞ্জির হাতায় নাকটা মুছে অন্তু এবার উঠে দাঁড়ালো। মুখখানা ফুলে উঠেছে চড়ের আঘাতে। ফর্সা গাল দুখানা হয়ে উঠেছে রাঙা। কিন্তু অনেক লোকের সামনে তার কান্না পায়

না। সে যখন একলা হাঁটে, পথ যখন নিরিবিলি, কেউ কোথাও তাকে যখন লক্ষ্য করছে না, তখন তার দুই গাল বেয়ে ঝরঝরিয়ে চোখের জল নামে। অবশ্য আজকের কথা স্বতন্ত্র, কেন না, আজ থেকে তার ছুটি। সমস্ত শারীরিক যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে তার শুধু মনে হচ্ছে, ওই লোকটার দোকানে আর তাকে কাজ করতে হবে না। আজ থেকে তার মুক্তি, দোকান থেকে মুক্তি, মামার হাত থেকে মুক্তি। আজ হাওয়া লেগেছে তার গায়ে,—অনেকদিন পরে তার ছুটি।

অন্তু হাঁটতে আরম্ভ ক'রে দিল।

দীপেন যখন বস্তির মধ্যে ঢুকে আঁস্তাকুড় পেরিয়ে নিজেদের চালার মধ্যে ঢুকছে, সেই সময়ই একটা সোরগোল তার কানে এলো। যমুনার অবস্থা ভালো নয়, শ্রীমতী ফুলি অন্তঃসত্ত্বা, শ্রীমান দ্বিজেনের জন্য মধ্যে-মাঝে থানা থেকে জমাদার এসে শাসিয়ে যায়, মৃগেন্দ্র সেদিন ছাত্র পড়িয়ে ফিরবার সময়ে পথে সাইকেলের ধাক্কায় প'ড়ে গিয়ে কেটে-কুটে জ্বরে পড়েছেন,—এ ছাড়া বস্তির ঝগড়া আছে, মাঝে মাঝে মাতালের আবির্ভাবে হৈ চৈ আছে, ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপার নিয়ে ভক্ত বৈষ্ণব দলের মধ্যে বিবাদ-বিতর্ক আছে, কনক আর বংশীর গালমন্দ আছে,—হঠাৎ সমস্ত ছবিটি একসঙ্গে দীপেনের মাথার মধ্যে পাক খেয়ে গেল।

পা চালিয়ে দীপেন পগারের পাশ দিয়ে এসে দাওয়ায় উঠতেই শীলু আর বরুণা চীৎকার ক'রে উঠলো,—দাদা, শিগ্‌গির দেখো, মায়ের কী হয়েছে! মা কথা বলছে না। শিগ্‌গির গিয়ে ডাক্তার আনো।

দীপেনের অত তাড়া নেই। চেঁচিয়ে শুধু বললে, থাম্ তোরা! আগে দেখতে দে। বড়দি কোথায়?

বড়দি থাকলে কি আর তোমার জন্যে অপেক্ষা করতুম?—বরুণা চাপা গলায় বললে, বড়দি সেই সকালে বেরিয়ে গেছে।

ভাস্বতীর অনুপস্থিতিতে দীপেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, কিন্তু তখনকার মতো কিছু বললে না। ছেঁড়া চটি জোড়াটাসুদ্ধ সে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালো। তরুবালার কোনো চেতনা নেই। নিশ্বাস পড়ছে ধীরে। মুখখানা পাণ্ডুর, যেন ঠিক মৃত্যুপথযাত্রী। প্রকাশ, ভর সন্ধ্যাবেলায় মৃগেন্দ্রর

সঙ্গে কি যেন একটা তর্ক উঠেছিল, তারপর উঠে এসে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে সেইখানেই তিনি প'ড়ে যান। বরুণা তখন সেজে-গুজে বেরোচ্ছিল, কিন্তু মায়ের জ্ঞান না ফিরলে সে কেমন ক'রে যাবে? তার সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়েছিল ভাস্বতীর ওপর। ওঘরে দুরারোগ্য যমুনা সারাদিন সেবাযত্নের অভাবে বিছানায় পড়ে ক্ষীণকণ্ঠে একে-ওকে ডাকছে, কিন্তু কে যাবে তার কাছে? বাবার আজ জ্বর নেই,—কিন্তু পথ্য দেয় কে? ফুলি আজকাল একটু অশক্ত হয়ে পড়েছে, তার নড়াচড়া অসুবিধাজনক, ছুটোছুটি অসম্ভব,—সুতরাং তার কাপড়-জামাগুলো দুবেলা কেচে না দিলে তার চলবে কেমন ক'রে? রাঁধে কে? কে বাসন মাজে? ঘরের পাট কার হাতে? মায়ের কাজে একটু সাহায্য করে কে?

সমস্ত আক্রোশটা জ'মে উঠেছিল ভাস্বতীর বিরুদ্ধে।

হেঁট হয়ে দীপেন তার মাকে একবার নিরীক্ষণ ক'রে দেখলো। তরুবালা অনড় অচেতন, কিছুমাত্র সাড়া নেই। বিজ্ঞের মতো দীপেন তাকালো। হুঁ, ভয় তেমন কিছু নেই বটে, তবে জ্ঞান না ফিরলে কিছু বলা যায় না।

গরম জলে হাত পা ডলে দিয়েছিলি?

না।

তোরা কিচ্ছু জানিসনে। গরম দুধ খাওয়ানো হয়েছিল?

গরম দুধ?—শীলু বললে, বা রে, এ পাড়ায় দুধ আছে নাকি?

দীপেন বললে, দুপুরবেলা মা কি খুব বেশী পরিমাণ ভাত খেয়েছিল? মানে, অবেলায় পেট ভ'রে খেলে সন্ধ্যাবেলা শরীর আইঢাই করে কিনা।

বরুণা গ্রীবা দুলিয়ে বললে, দাদা যেন কী ভাই! আজ দুদিন ধ'রে আমাদের বাড়ীতে রান্নাই নেই, তা জানো? তোমার বউ শীলুকে দিয়ে খাবার আনিয়ে খেয়েছে, আর বাবা খাচ্ছে জলে ভেজা চিঁড়ে।

ও, আর যমুনা?

তার কি আর খাবার ক্ষমতা আছে? দেখে এসো না ওঘরে! ওঘরে গিয়ে ঢোকা আমরা ত' সব ছেড়েই দিয়েছি! আমি নিজেও তোমাদের বাড়ীতে পনেরো দিন খাইনে! আমার খরচা আমিই চালাই।

অচেতন জননীর দিকে তাকিয়ে দীপেন বললে, তোর বড়দি গিয়ে বুঝি অতনু ডাক্তারের ওখানে আড্ডা দিচ্ছে?

বরুণা বললে, তাছাড়া আবার কি! ওর কি আর বাড়ীর দিকে মন আছে? অঢেল টাকা জমিয়েছে, বাইরে বাইরে দু'জনে ফূর্তি করে বেড়ায়। কালীঘাটে যাবার নাম ক'রে বেরোয়, তারপর আদি গঙ্গায় ডুবে-ডুবে জল খায়! এ ঢলা-ঢলি কি আর আজকের?

হুঁ।—দীপেন চুপ ক'রে রইলো।

বরুণা পুনরায় বললে, দাদা, ডাক্তার ডাকবে না?

দীপেন বললে, বাবা কি ডাক্তার আনতে বলছে? আনলে টাকা দেবে কে? তা ছাড়া আবার ওষুধ! দাঁড়া, আগে জ্ঞানটা ফিরুক।

বড্ড মুশকিলে পড়েছি আমি—বরুণা বললে, কথা দিয়েছিলুম একজনকে, সন্ধ্যে বেলা গিয়ে তা'র কাজটা সেরে দিয়ে আসবো। আমার জন্যে সে অপেক্ষা ক'রে থাকবে কিন্তু। তোমাকে এখানে রেখে আমি যাবো, দাদা? বড্ড মুশকিলে পড়েছি।

কত দূরে যাবি?

বেশী দূর নয়, ভাই। যদি রাত বেশী হয় মোটরে ফিরবো!

সবিস্ময়ে দীপেন বললে, মোটরে?

হ্যাঁ, আমাদের আপিসের বন্ধু·পল্টু সেনের গাড়ীতে। যাবো, দাদা?

প্রতি মাসে দশ টাকা অন্তুর কাছে পাওয়া যেতো, সেটা এবার থেকে বন্ধ। দীপেন হঠাৎ কি যেন ভাবলো, তারপর বললে, আমাকে দশটা টাকা ধার দিতে পারবি এখন?

বরুণা বললে, রাত্রে দিতে পারি ফিরে এসে। কিন্তু কাউকে বলবে না, বলো? তুমি টাকা চাও শুনলে পল্টুবাবু খুশী হয়েই টাকা দেবেন।

শীলু হাসিমুখে বললে, আমি কিন্তু দাদুকে ব'লে দেবো!

যা যা ভয় দেখাসনে। আমি তোর কীর্তি ব'লে দিতে পারিনে? তুই কোত্থেকে পয়সা পাস আমি জানিনে বুঝি?

নির্বোধ বালিকাটির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। মাথা হেঁট করে এক সময়ে সে উঠে পড়লো। কিন্তু সেদিকে দীপেনের ভ্রূক্ষেপ ছিল না, চাপা একটা ক্রূর উল্লাসে তা'র চোখ দুটো বরুণার দিকে ফিরে যেন দপ দপ করতে লাগলো। এ সংসারে টাকাটা বড়, কেন না, প্রয়োজনটা অপরিসীম। ইতিহাসে

কোথাও মনের কথা ও কাহিনী খুঁজে পাওয়া যায় না, কারণ কেউ খোঁজ রাখে না। আর্থিক সাচ্ছল্য দেখা দিলে সকলের কাছে সম্মান পাওয়া যাবে, কিন্তু অর্থাগমের আনুপূর্বিক ছোট ছোট কাহিনী কেউ কি মনে রাখে? কেউ কি তা'র খোঁজ পায়? তারা নাকি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, বনেদী বংশ তাদের—কিন্তু তাদের পিতামহী আর প্রপিতামহীরা যৌবনকালের কোনো এক সময়ে কৌমার্য অথবা সতীত্বের সততা রক্ষা ক'রে চলতেন কি না—কেউ কি আজ তাই নিয়ে মাথা ঘামায়? যে কথা ভাবতেও লজ্জাবোধ হয়, সেই কথাই যে মিথ্যে—কে বললে? সন্তানের পক্ষে যে সংবাদটি অপমানজনক অথবা কলঙ্কজনক—সেটি যে অসত্য, তা'র প্রমাণ আছে কিছু? পিতা যখন সন্তানের গালে স্নেহের চুমা খায়, অসতী জননী কি তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে না?

নিজের মনেই দীপেন অনেকটা যেন শক্তিলাভ করলো। চরিত্রের শুচিতাটা বড়, না সামাজিকভাবে আত্মসম্ভ্রম-রক্ষাটা বড়? চোর যদি ধরা না পড়ে, তবে তা'র চৌর্যের প্রমাণ কোথায়? মেয়ে যদি চিরদিন কৌশলে নিরাপদ থাকতে পারে, তবে তা'র কলঙ্কটা কি শুধুমাত্র জনশ্রুতি নয়? ওই ত' শীলুটা বড় হচ্ছে, এই ত' বরুণা মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে,—এদের সাহায্যে যদি তা'র অবস্থাটা ফেরে, তবে কে জানবে? কেই বা তাই নিয়ে কোন্‌কালে গবেষণা করবে?

দাদা?

দীপেনের বুকের মধ্যে কেঁপে উঠলো। কিন্তু তখনই সে সহাস্যে তা'র মনোভাবটা কাটিয়ে বললে, ব্যস, সব ঠিক আছে। মায়ের জন্যে কোনো ভাবনা নেই, আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেবো। জ্ঞান ফিরে এলে আর ভয় কিসের?

বাইরের থেকে নানা লোকজন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। অন্ধকারে তাদেরকে বিশেষ ঠাহর করা যাচ্ছে না। ওরা যেন ধ'রেই নিয়েছে, তরুবালার জীবনের আশা কম; কেউ বা হাহুতাশ করছে। ওঘরে প'ড়ে রয়েছে যমুনা, তা'র খবর নিচ্ছে না কেউ। কাতরকণ্ঠে যমুনা কি যেন চাইছে, কিন্তু তা'র ঘরে আলো না থাকার জন্য কা'রো যাবার সাহস নেই। ঘরের বাইরেটা বুক-চাপা, হাওয়া নেই কোথাও,—মরা বিড়াল পচে উঠেছে পগারের দিকে, তারই দুর্গন্ধ আসছে যমুনার ঘরের পাশ থেকে। অন্ধকারের ভিতর থেকে যেন একটা আসন্ন ভয়ের ছায়া এগিয়ে আসছে।

বরুণা বললে, দাদা, যাবো?

দীপেন তা'র অচেতন জননীর দিকে আরেকবার তাকালো। তারপর হাসিমুখে বললে, বাবা জেগে আছে নাকি?

বরুণা বললে, মা'র কাছে ছিল অনেকক্ষণ, তারপর গিয়ে বিছানা নিয়েছে। চুপ ক'রে আছে।

এখন কিন্তু প্রায় রাত ন'টা। এখন গেলে কখন ফিরবি?

বরুণা বললে, তোমার এক কথা! কলকাতা শহরে নটাই বা কি, আর এগারোটাই বা কি! ফিরতে যদি রাত বারোটা কি দুটো হয়,—আমি ত' গাড়ীতেই ফিরবো, ভাই? যত নষ্টের গোড়া হোলো বড়দি, সে থাকলে আমার এমন ক্ষতি হোতো না। দাদা, তোমাকে একটা কথা বলবো? মেজদা এসেছিল সকালে, তা'র যেন কি সন্দেহ হোলো,—মেজদির বিছানার তলা থেকে সে অনেকগুলো টাকা নিয়ে চ'লে গেছে!

দীপেন চমকে উঠলো। বললে, যমুনার বিছানার তলা থেকে? বড়দির চুরির টাকা বল্? আজকাল বুঝি ওইখানে টাকা রাখতো?

হ্যাঁ গো, দাদা!

দীপেন ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললে, সমস্ত বাবার টাকা! আমাদের সকলের পেটের ভাত আর পরনের কাপড়! এই সব টাকা নিয়ে গিয়ে অতনু ডাক্তারের কাছে গচ্ছিত রাখে! তুই ঠিক দেখেছিস?

মাইরি বলছি!

দীপেন উঠে দাঁড়ালো। তারপর পলকের মধ্যে পাশের ঘরে গিয়ে ডাকলো, বাবা?

আসন্ন ঝড়ের আভাস দেখে বরুণাও দীপেনের পিছু পিছু গিয়ে দাঁড়ালো। মৃগেন্দ্র পাশ ফিরে শুয়ে ছিলেন। অন্নপথ্য আজও তিনি করেননি, শরীরটা তাই দুর্বল। এপাশে ফিরে বললেন, কে, দীপু?

হ্যাঁ—দীপেন কঠোরকণ্ঠে বললে, এসব তুমি আর কদ্দিন সহ্য করবে, বাবা?

ক্লান্ত কণ্ঠে মৃগেন্দ্র বললেন, কেন, কি হয়েছে?

আমার কথা কোনোদিন তুমি বিশ্বাস করোনি, বরাবর তুমি বড়দিকে আস্কারা দিয়ে এসেছ। কিন্তু কত বড় সর্বনাশ সে আমাদের করেছে, তুমি কি জানো?

বাইরের থেকে কেরোসিনের ডিবেটা এনে বরুণা পিতাপুত্রের মাঝখানে রাখলো। সুবিধা ছিল এই, পাশের চালায় তরুবালা অজ্ঞান অবস্থায় প'ড়ে ছিলেন। কিন্তু আলো সামনে রাখতেই দেখা গেল, বৃদ্ধ মৃগেন্দ্রর চোখ দুটো লাল, সম্ভবত সেই চোখে জলের আভাসও ছিল।

ব্যাপারটা আজ অনেকক্ষণ ধ'রে চলবে—পিছনে দাঁড়িয়ে বরুণা কতক্ষণ উসখুস ক'রে এক সময় চ'লে গেল। সাজসজ্জা তা'র করাই ছিল, সুতরাং শীলুকে মায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে সে নতুন স্লিপার পায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। এধারের চালাটায় ফুলি অন্ধকারে বিছানা পেতে মুখ বুজে পড়ে ছিল, জেগে থাকলেও সে সাড়া দেবে না, এই সুবিধা। নিজের মনে মুখ টিপে হেসে বরুণা সেই নর্দমার পাশ দিয়ে আঁস্তাকুড় পেরিয়ে হন হন ক'রে চললো বস্তির বাইরের দিকে। আজ সারাদিন সে নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ পায়নি, এবারে তা'র ছুটি। এখন তা'র অভিভাবক হোলো দাদা,—কেননা, বাবার আর উত্থানশক্তি নেই—সেই দাদার ছাড়পত্র আজ মিলেছে। দাদা আর মায়ের হাতে কিছু কিছু গুঁজে দিতে পারলে তার স্বাধীনতা কোনোদিন ক্ষুণ্ণ হবে না। অপদার্থ সুশান্তটা তার গায়ে কাদা মাখিয়েছে বটে, তবে তা'কে বিদায় করেছে সে শ্রদ্ধেয় পল্টুবাবুর সাহায্যে। সামনের মাস থেকে পল্টুবাবুর কাজটা সে পাবে, নিশ্চয়ই পাবে—কিন্তু তা'র কাছে এলেই পল্টুবাবুর কী আকুলি-বিকুলি,—দেখতে ভারি মজা লাগে কিন্তু। লোকটা কথা বলে কম, কেবল হাত বাড়ায়!

বস্তির বাইরে এসে বরুণা এদিক ওদিক তাকালো। কোথাও কেউ নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে সে কিছুদূর অগ্রসর হোলো। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় এ পল্লীর শেষ অংশে গিয়ে এক জায়গায় থমকে সে দাঁড়ালো। আবার তাকালো এদিক ওদিক। তারপর সামনের পগার পেরিয়ে একটি খোলার খুপরির পিছন দিকে এসে ছোট্ট একটি জানলার তলায় দাঁড়িয়ে চাপা কণ্ঠে ডাকলো, বেনে-বৌ, অ বেনে-বৌ!

ভিতর থেকে সাড়া এলো, এই যে, ভাই!

জানলাটা খুলে একটি কাঁচপোকার টিপ-পরা মেয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে, এই যে, এত দেরি তোমার? এখন যে রাত দশটা গো!

বরুণা বললে, পল্টুবাবু ঘরে নেই?

এই ত' ছিল এতক্ষণ—মেয়েটি ভিতর দিকে একবার হাসিমুখে তাকালো, তারপর পুনরায় বললে, তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ক'রে এই আধ ঘণ্টা আগে চলে গেছে। কাল একটু সকাল-সকাল তুমি এসো, ভাই।

বরুণার ব্যর্থ মুখখানা দেখতে দেখতে বিষণ্ণ হয়ে এলো। কিন্তু বেনে-বৌর কণ্ঠস্বরে তার কেমন যেন সন্দেহ হোলো। ইচ্ছা হোলো, জানলাটায় মুখ রেখে ভিতরটা সে একবার দেখে নেয়। কিন্তু বেনে-বৌ সেই অবসরটুকু আর দিল না। হাসি-হাসি মুখে কথাটা ব'লে সে জানলাটা বন্ধ ক'রে ভিতর থেকে ছিট্‌কিনি এ'টে দিল।

কথা ছিল, বরুণা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ পল্টুবাবু বেনে-বৌর ঘরে অপেক্ষা করবে। কিন্তু অপেক্ষার সীমা আছে। যদিচ বেনে-বৌর কথায় হাসিতে ও গলার আওয়াজে কিছু সংশয় রয়ে গেল, তবু রাগ হোলো না বরুণার। পল্টুবাবুর কোনো দোষ নেই, তাঁর সঙ্গে আলাপ হওয়া অবধি বরুণা কখনো অর্থাভাবে কষ্ট পায়নি। মোটরে চড়েছে সে অনেকদিন, বেড়িয়েছে সে অনেক, সিনেমায় গেছে অন্তত পঁচিশবার। লোকটা অত্যন্ত সাহসী আর বেপরোয়া, সুশান্তর মতো ভীরু নয়। সুশান্ত সময় নিয়েছিল অনেকদিন, পল্টুবাবুর কিন্তু ধৈর্য কম—এক কথায় সোজাসুজি সে ঝাঁপিয়ে আসে। লোকটার মেয়েলিপনা নেই।

অসীম নৈরাশ্য মুখে চোখে নিয়ে বরুণা ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে আবার রাস্তায় পড়লো। সন্ধ্যার দিকে পল্টুবাবু এখানে এসে অপেক্ষা করে, বরুণা এলে দুজনে বেরিয়ে পড়ে। অনেকদিন সুশান্ত এসেছে, কিন্তু বরুণার খোঁজ-খবর সে পায়নি। সুশান্ত তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে পাগলের মতো সন্দেহ নেই। দ্বিজেনের ভয়ে সে বস্তির মধ্যে ঢোকে না, এখানে ওখানে ছোঁক ছোঁক করে মাত্র। ধরা পড়লে দ্বিজেনের হাতে তার নিস্তার নেই। বরুণা এতে দুঃখিত নয়। সুশান্ত চুলোয় যাক্‌।

পিছন থেকে একখানা রিক্সা আসছিল ঠুং ঠুং করে। বরুণা পথ ছেড়ে পাশে দাঁড়ালো, কিন্তু পাশ দিয়ে যাবার সময় মুখ তুলতেই সে দেখলো, ভাস্বতী ব'সে রয়েছে রিক্সায়। হঠাৎ এতক্ষণকার সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়লো ভাস্বতীর উপর। রিক্সাখানা থামলো তাদের বস্তির সুড়ঙ্গের মুখে। তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে বরুণা বললে, তোমার নবাবী বুঝি দিন দিন বাড়ছে, বড়দি?

অতনুর ওখান থেকে জ্বর আর মাথায় যন্ত্রণা নিয়ে ভাস্বতী সেই বেরিয়ে বাড়ী ফিরছিল। রিক্সা থেকে নেমে একটি টাকা ভাড়া দিয়ে ভাস্বতী বললে, আজ আর হেঁটে আসতে পারলুম না, ভাই। তুই এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলি রে?

আমি?—রেগে আগুন হয়ে বরুণা বললে, আমি যাচ্ছিলুম তোমাকে খুঁজতে! বিশ্বাস না হয় চলো, দেখবে? তোমার আক্কেলখানা কি? বাড়ীতে এই বিপদ, আর সারাদিন তুমি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরছিলে? এই যে, বেশ চকচকে ধুতি পরা হয়েছে দেখছি? এত সখ ছিল কোথায় তোমার, বড়দি?

ভাস্বতী চমকে উঠলো। কাপড়খানা ফিরিয়ে দিয়ে নিজের কাপড় প'রে আসার কথা আজ তা'র একদম মনে নেই। একটু কুণ্ঠিত হয়েই সে বললে, কাপড়খানা ছেড়ে আসব ডাক্তারের ওখানে, ভুলে গেছি। আমার কাপড় ভিজে ছিল কিনা—

ভুল কেন হবে বড়দি—ভালোই করেছ! ডাক্তারের জামাটাও গায়ে চড়িয়ে এলে পারতে? সেখানে গেলে বুঝি আজকাল কথায়-কথায় কাপড় বদলাতে হয়?

গলির ভিতর দিয়ে পা বাঁচিয়ে দুজনে অগ্রসর হোলো। কিন্তু আজ কোনো কথার জবাব দেবার মতো শারীরিক শক্তি ভাস্বতীর ছিল না। জ্বর বাড়ছে প্রতিক্ষণে,—মাথায় যন্ত্রণা, সমস্ত শরীর যেন যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠছে। চোখ খুলে তাকানো যাচ্ছে না। আগে-আগে যাচ্ছে বরুণা, পিছনে-পিছনে অবসন্ন দুই পা টেনে-টেনে ভাস্বতী এগিয়ে চললো।

বাঁক ফিরতেই দীপেনের চীৎকার শোনা গেল।—শুধু আপনার কথায় আমি এতকাল মুখ বুজে ছিলুম। আমাদের ভাত নেই, কাপড় নেই, চাল-চুলো নেই—কে দায়ী এর জন্যে? পথের নেড়িকুকুরকে একদিন না আপনিই ঘরে জায়গা দিয়েছিলেন? আপনিই না একদিন আমাদের সকলের দাবি সরিয়ে দিয়ে ওকে মাথায় তুলেছিলেন? কোথায় গেল টাকা? কে আমাদের টাকা মেরেছে?

বরুণা জানে, উত্তেজনার সময় দীপেন বাবাকে কখনো আপনি এবং কখনো তুমি ব'লে সম্ভাষণ করে।

মৃগেন্দ্র উঠে বসেছিলেন। তিনিও কাঁপতে কাঁপতে গলার আওয়াজ করছিলেন,—অনেক হয়েছে, অনেক হয়েছে। এবারে আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। অনেক মার খেয়েছি, অনেক সহ্য করেছি।

আপনি সহ্য করেছেন, আর আমরা ভাইবোনরা করিনি? আমাদের হাড় কালি হয়নি?

মৃগেন্দ্র চেঁচালেন, তবু তোরা মানুষ হলিনি, তবু তোরা কেউ মানুষের দাম দিলিনে! যা কিছু ভালো, যা কিছু মহৎ—তোদের কালে তারা মার খেয়ে গেল! তোরা শ্রদ্ধা করলিনে কোনো কিছুকে, মান রাখলিনে কারো—মানুষের চিরকালের নীতিবোধকে তোরা নষ্ট ক'রে গেলি। তোরা সকল কল্যাণের গলা টিপে মারলি!

মৃগেন্দ্র কাঁপছিলেন। বরুণা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এধার থেকে ডাকলো, দাদা, বড়দি এসেছে! দেখো না, একেবারে বিবি সেজে আসা হয়েছে। বিপদের বাড়ীতে কী সাজগোজের ঘটা!

ভাস্বতী কোনো কথা না ব'লে সোজা কেরোসিনের ল্যাম্পটা নিয়ে যমুনার ঘরে গিয়ে ঢুকলো এবং প্রথমেই হাতের ছোট পুঁটলিটি খুলে কালীঘাটের প্রসাদী ফুল নিয়ে যমুনার মাথায় কপালে বুকে চোখে দুই হাতে অতি যত্নে ছুঁইয়ে দিল। ফিরতে তা'র আজ একটু দেরিই হয়েছে বটে, তবে শীলু আর বরুণার সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে তবে সে বেরিয়েছিল! হেঁট হয়ে সে দেখলো, যমুনা ঘুমিয়ে পড়েছে,—কিন্তু সেই ঘুমটাকে সহজেই যোগনিদ্রা বলা চলে। যমুনা যেন ডুব দিয়েছে কোন্ অতলতলে!

দীপেন আবার চীৎকার করলো, বাড়ী ফিরেছে এবার তোমার মেয়ে। কিন্তু আমি চাইছি তোমার হুকুম, আমি চাইছি আমার স্বাধীনতা!

হুকুম,—মৃগেন্দ্র যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, বিচারের ভার যাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি, তারা নিজের দুষ্প্রবৃত্তিতে চলবে,—তারা হুকুম মানতে যাবে কেন? তবু ব'লে যাবো, তোরা জঙ্গলের জানোয়ার, মানুষের সমাজকে তোরা গায়ের জোরে দখল করেছিস। বলে যাবো যাবার আগে, তোদের ব্যবস্থার মধ্যে সত্য খুঁজে পাইনি। ব'লে যাবো, স্বীকার ক'রে যাবো—অপমানিত মানুষের আত্মা তোদের দরজায় দরজায় চোখের জল ফেলে গেল! ব'লে যাবো, তোরা এ যুগে কোনো ভালো জিনিসের দাম দিলিনে!

মৃগেন্দ্র কেঁদে উঠলেন শেষের দিকে—তোরা পিতৃহন্তা, শিশুহন্তা, নারী-হন্তা—তোরা এ যুগে মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছিলি, একথাও ব'লে যাবো।

সহসা চুপ ক'রে গেলেন মৃগেন্দ্র। তাঁর গলা বুজে এসেছে। বোধ করি তরুবালার নিশ্চেতন দেহটা তখনও নিশ্চল হয়ে প'ড়ে রয়েছে, এই কথাটা মনে হতেই তাঁর কণ্ঠস্বর একেবারে ব'সে গেছে।

বরুণা আর শীলু কাঠ হয়ে তরুবালার কাছে ব'সে ছিল। আশে পাশে মেয়ে-পুরুষের জটলা জমে গেছে। কানাকানি চলছে অবিশ্রান্ত। সত্যিই ত, তিনকুলে যার কেউ নেই, পরের ভাত খেয়ে পরের ঘরে ঝিগিরি করবার জন্য যার জন্ম, তার এত আস্পদ্দা কিসের? সে টাকা চুরি ক'রে বাইরে পাচার ক'রে কোন্ সাহসে? কোন্ সাহসে গেরস্থের মুখের ভাত মেরে আড়ালে-আবডালে নিজের আখের গুছিয়ে নেয়? বলে, 'যার ধন তা'র ধন নয়, নেপোয় মারে দই?' দীপেন যে এত গালমন্দ করে, কোন্‌টাই বা মিথ্যে? ওই মুখে তুই আবার যাস সেই ডাক্তারের ঘরে রং-ঢং করতে? সাধে কি আর বলে, জাতজন্মের গোলমাল!

কঠোর পদক্ষেপে দীপেন যমুনার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। রোষকষায়িত সেই বর্বরের চেহারাটা আলোছায়ার মধ্যে লক্ষ্য ক'রে ভীতত্রস্তভাবে ফুলিও বাইরে এসে দাঁড়ালো। বললে, যে যার মান বাঁচিয়ে থাকলেই হয়, তাহ'লে ত' আর এত কথা উঠতো না। ওগো, তুমি চ'লে এসো।

কিন্তু আজীবন যার হাতে দীপেন মানুষ, যার স্নেহসুকঠোর চক্ষুকে চিরদিন দীপেন সমীহ ক'রে এসেছে, যার চিরকালের স্বার্থত্যাগ ও চরিত্র-গৌরবকে কোনো কালেই সে বুঝতে পারেনি, তা'র সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্ত প্রমত্তকণ্ঠে দীপেন ডাকলো, এই মাগি, কোন্ সাহসে আবার তুই ঘরে ঢুকেছিস? বলি, শুনতে পাচ্ছিস?

জ্বরে ও যন্ত্রণায় বেহুঁস হয়ে ভাস্বতী যমুনার বালিশের পাশেই কুণ্ডলী হয়ে নেতিয়ে পড়েছিল। মাথা তুলে নিমীলিত চক্ষে চেয়ে সে জবাব দিল, আমাকে? কেন রে?

ও, আবার ন্যাকামি?—দীপেন চেঁচিয়ে উঠলো,—মেয়ে মানুষের জাতের দোষ! লাথি মেরে ওই ন্যাকামি আজ ছাড়াবো আমি! ডাক্তার ত' সব যোগায়,

তবে আবার রাত্তিরে জুতোর ঠোক্কর দিয়ে তাড়িয়ে দেয় কেন? ওতে বুঝি দু'জনের সুনামই বাঁচে?—শুয়ে আছিস যে? কা'র বাবার টাকা লুকিয়ে রেখেছিলি বিছানার তলায়? কা'র বাবার টাকায় সারাদিন ফুর্তি মেরে এলি পথে ঘাটে?

ভাস্বতী উঠে বসলো। আহত কম্পিতকণ্ঠে বললে, পথেঘাটে নয়, কালীঘাটে গিয়েছিলুম!

কালীঘাটে! সতীসাধ্বী কালীঘাটেই যদি গিয়েছিলি, তবে সিঁথেয় সিঁদুরটা চড়িয়ে এলিনে কেন?

বড় বড় আরক্ত দুই চক্ষে চেয়ে ভাস্বতী বললে, দীপু, আমি কিন্তু আর চুপ ক'রে থাকবো না!

দীপেন উন্মত্ত হয়ে এসে ভাস্বতীর উপর চড়াও হোলো। মৃদুক্ষীণ কণ্ঠে যমুনা ব'লে উঠলো, দাদা, ও দাদা, কী করছ তুমি?

ভাস্বতীর আঁচল সমেত একখানা হাত ধ'রে হিড়হিড় ক'রে দীপেন বাইরে টেনে আনলো। পাশবিক উত্তেজনায় অস্থির হয়ে চীৎকার করতে করতে যে কাণ্ডটা সে করলো, সেটি কোনো দেশের কোনো মানুষের কোনো সমাজেই সম্মতি পায়নি। তারপর মত্তকণ্ঠে সে বলতে লাগলো, যা, দূর হয়ে যা, নইলে গলাধাক্কা দিয়ে এখনি তাড়াবো। কালীঘাটে গিয়ে যদি জোর পেয়ে থাকিস, তবে সেই কালীঘাটেই চ'লে যা। ফের বাড়ী ফিরলে জুতিয়ে তাড়াবো তোকে!

গা-ঝাড়া দিয়ে ভাস্বতী এবার উঠে দাঁড়ালো। তারপর ক্লান্তকণ্ঠে বললে, আমাকে এমনি ক'রে এক কাপড়ে তাড়িয়ে দিলে তোদের মান খোওয়া যাবে না?

ফের? ফের আবার মুখ নেড়ে কথা বলছিস্? আমি যদি বাপের বেটা হই, তবে—

ওদিক থেকে ওরা চেঁচিয়ে উঠলো, আহা হা, আর কেন বাছা, অনেক মারধর হয়েছে! তুমি বাছা ভালো মানুষের মেয়ের মতন চ'লেই যাও না? তোমার আবার ভাবনা কিসের? সোমত্ত বয়েস!

শুষ্ককণ্ঠে ভাস্বতী বললে, আমি গেলে যমুনাকে তোরা বিছানা থেকে তুলতে পারবি? আমি গেলে মায়ের চলবে? বাবার সেবা হবে? ফুলির প্রসব হবার সময় হ'লো, তোরা সামলাতে পারবি?

বরুণা ওধার থেকে ফস ক'রে বললে, অত তেজ ক'রে কথা ব'লো না, বড়দি। তোমাকে মানায় না!

ফুলি বললে, তাই বটে, আমি এতদিন ভাবতুম বুঝি ঢোঁড়া সাপ!

ভাস্বতী গিয়ে দাঁড়ালো মৃগেন্দ্রের দরজার সামনে। ঘরের মাঝখানে সেই কেরোসিনের ডিবেটা তখনও জ্বলছে। ভাস্বতী জ্বরে ও প্রহারে কাঁপছিল। তবু সে ডাকলো, বাবা—!

বিকৃতকণ্ঠে মৃগেন্দ্র জবাব দিলেন, মিছে কথা, মিছে কথা,—আমি তোমার বাবা নই!

অকম্পনকণ্ঠে ভাস্বতী বললে, কিন্তু দীপেন যে সত্যিই আমাকে এই রাত্রে তাড়িয়ে দিচ্ছে, বাবা?

মৃগেন্দ্র বললেন, পৃথিবী অনেক বড়, এই ভেবে তুই চ'লে যা, মা!

ভাস্বতী জ্বর গায়ে নিয়েও স্তব্ধ শান্তভাবে কতক্ষণ দাঁড়ালো। তারপর বললে, তবে কি এতকাল পরে আমি জেনে যাবো, মা-বাবা তোমরা আমার কেউ নও? এই রাত্রে কোথায় যাবো, বাকী জীবন কোথায় আমি কেমন ক'রে থাকবো, তুমি তবে ব'লে দাও, বাবা?

মৃগেন্দ্র চুপ ক'রে মাথা হেঁট করলেন। অধীর উত্তেজনায় ভাস্বতী দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। তারপর ডাকলো, বাবা?

মৃগেন্দ্র বোধ করি চোখের জল ফেলছিলেন, সাড়া দিতে পারলেন না।

ভাস্বতী পুনরায় বললে, কাল যদি তোমার কানে ওঠে—তোমার এই পথে-কুড়োনো মেয়ে তোমাদের সকলের জন্যে কালীঘাটে 'দণ্ডী' খাটতে গিয়েছিল, যদি শোনো—এর জন্যে তিন দিন তোমার মেয়ে নির্জলা উপবাস ক'রে ছিল, যদি শোনো—জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে এই অভাগী তোমার ছেলের হাতে কুকুরের মতন মার খেয়ে চ'লে যেতে বাধ্য হয়েছিল,—তোমার কি একটুও মন খারাপ হবে না, বাবা? সবচেয়ে দুঃসময়ে যদি তোমার কাছে আশ্রয় না পেলুম, তবে কেন তোমার মেয়ে হয়েছিলুম? কেন তোমাকে বাবা বলেছিলুম? কেন তুমি পথের মেয়েকে সেই দেড় বছর বয়সে পথেই ফেলে দাওনি?

মৃগেন্দ্র ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন, এমন কি কোনো দেশ নেই, মা—যেখানে গেলে তোর অন্নবস্ত্র জুটবে দারিদ্র্য ঘুচবে, যেখানে গেলে দুঃশাসনের হাতে

তোর কখনো মান খোওয়া যাবে না? তোকে আমরা বাঁচতে দিইনি, সম্মান দিইনি, ভাতকাপড় দিইনি—তোর সমস্ত জীবনটাকে আমরা নষ্ট করেছি, মা।

কিন্তু সেজন্য আমার কোনো দুঃখ ছিল না, বাবা!

একথা তুই জেনে যা চীনু, আমার শাসনের জোর ছিল না, ইচ্ছার জোর ছিল না! আজ যখন মরতে বসেছি, যখন ওরা তোকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিচ্ছে—আমার বাধা দেবার সাধ্য নেই! আমার শক্তি নেই, মেরুদণ্ড নেই! একথা জেনে যা, তুই আমার নিজের মেয়ে ন'স্, তাই আজ মা-বাপ ভাইবোন সবাই মিলে এতকাল পরে তোকে আমরা তাড়িয়ে দিলুম!

বাবা—! ভাস্বতীর গলা এবার কেঁপে উঠলো।—আজ তোমার বড় মেয়ের মান রাখতে কেন পারলে না, একথা কি আমি শুনেও যেতে পারবো না?

খবরদার—ওধার থেকে নেক্‌ড়ে বাঘের মতো দীপেন আবার গর্জন ক'রে উঠলো, খবরদার বলছি! যাবার সময় বুঝি ফের মন ভোলানো হচ্ছে? দাঁড়া ত'—

সে ছুটে এসে ভাস্বতীর চুলের গোছাটা ধ'রে হিঁচড়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে নামালো উঠোনে। অন্ধকারে উঠোনে টক্কর খেয়ে ভাস্বতী একবার হুমড়ি খেয়ে পড়লো। কিন্তু দীপেন যখন আবার হাতখানা ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে চললো বাইরের দিকে, ভাস্বতী সেখান থেকে চেঁচিয়ে বললে, মা, শুনছ মা, তুমিও আজ কোনো কথা বললে না? মা, শুনছো?

শীলু ব'লে উঠলো, বা রে, দিদিমার কি জ্ঞান আছে নাকি?

মৃগেন্দ্র শুধু ওধার থেকে ভগ্নস্বরে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, যাবার সময় তুই এই কথা ব'লে যা চীনু, আমি যেন সপরিবারে সর্বনাশের তলায় তলিয়ে যাই!

কিন্তু দীপেনের আর য়াই থাক্, হৃদয়ের কোনো বালাই নেই। সমস্ত পল্লীপ্রতিবেশী মেয়ে-পুরুষের চোখের উপর দিয়ে আহত অসুস্থ অপমানিত ভাস্বতীকে হিঁচড়ে টেনে ধাক্কা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চললো সে বস্তির বাইরের দিকে। ভাস্বতীর গলার আওয়াজ দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। তরুবালা তখনও হতচেতন, বরুণা তখন প্রস্তরপুত্তলিকাবৎ, ফুলি নিঃসাড়—কেবল শীলুর চোখ দুটো এখানে ওখানে ঘুরছিল!

মিনিট পাঁচেক পরে সেই নারীঘাতী ক্রুদ্ধ নেক্‌ড়ে বাঘটা আবার যখন

ল্যাজের ঝাপট দিয়ে অন্ধকারে উঠোনের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ালো, তখন যমুনার ঘর থেকে একটা ভগ্নস্খলিত গোঙানির আওয়াজ আসছে। অমাবস্যার রাত্রে জনহীন শ্মশান থেকে কখনো কখনো তেমনি অশরীরী আওয়াজ ভয়-ভীত মানুষের কানে এসে বাজে। জীবনের স্পন্দন নেই কোনোদিকে!

ধরিত্রীর অতলতলে বাসুকির ফণাটা কাঁপছে,—পৃথিবী বড়ই গুরুভার। অতি ক্ষীণ কান্নার ফোঁপানি কি কোথাও শোনা যাচ্ছে? সেই অশ্রুর ছোট ছোট বিন্দুর মধ্যে কি বিপুলতর বিচ্ছেদ-বেদনার সিন্ধুসাগর লুকিয়ে নেই? কিন্তু কাঁদছে কে ওই অন্ধকারে ব'সে? বোধ হয় কাঁদতে বসেছে ওদের পুরনো আভিজাত্যের ইতিহাস আপন কলঙ্কের পৃষ্ঠা উল্‌টিয়ে। কিংবা হয়ত অপমৃত্যুর ভয়ে কাঁদতে বসেছে তা'রা—যাদের নাম দয়া, স্নেহ, বাৎসল্য, মনুষ্যত্ব, কল্যাণ, আনন্দ আর ভালোবাসা! দারিদ্র্যের আঁচল পেতে ব'সে ওরা এই যুগসন্ধিক্ষণে হয়ত বা মাভৈঃ মন্ত্র জপ করছে। উপরে অনন্ত গগনে মহাকাল মহাযোগাসনে মুদিতচক্ষে বিরাজমান!

সেই কালো বিড়াল-ছানাটা কাঁদছে পগারের ওদিকে কোথায়!

পথের আলোটা বাঁচিয়ে ভাস্বতী চুপ ক'রে বসে ছিল কোনো এক বাড়ীর রোয়াকে। রোয়াকটা বেশ চওড়া। নগরের নিরাশ্রয় কোনো কোনো হতভাগ্য এখানে শুয়ে রাত কাটায়। ওপাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে প'ড়ে আছে একটি জীব—ছায়ান্ধকারে বুঝতে পারা যায় না, মেয়ে কিংবা পুরুষ। ভাস্বতীর সর্বাঙ্গ ঢাকা; উত্তেজনাটা শান্ত হয়েছে ব'লেই হয়ত শীত ধরেছে। ব্যথায় সমস্ত শরীরটা অবশ, বোধ হয় জ্বর বেড়েছে। রাস্তায় জনপ্রাণী আর দেখা যাচ্ছেনা। রাত অনেক।

কোথাও থেকে কেমন একটা চাপা আর্তস্বর শোনা যাচ্ছিল। ভাস্বতীর কাঁপুনি ধরেছে, কিন্তু নিজের মুখখানাই সে চেপে ধরলো। তা'র নিজেরই অজ্ঞাতে গলার ভিতর থেকে উঠে আসছে ওই বিকৃত আওয়াজটা। ওটা জ্বরের যন্ত্রণার অভিব্যক্তি কিংবা ধিক্কার, কিংবা অপমানিত আত্মার আর্তনাদ,—ঠিক বুঝতে পারা যায় না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওটা যেন নাকিকান্নার মতো উঠে ওষ্ঠাধর ঠেলে বেরিয়ে আসে। ওখানে আঁচল বিছিয়ে শুতে তা'র ভয় আছে। যদি তা'র অচেতন নিদ্রার ভিতর দিয়ে কোনো পৈশাচিক দুঃস্বপ্ন এই পথের

মাঝখানে চীৎকার ক'রে ওঠে? থাক্, ঘুম হবে না তা'র। তন্দ্রায় সে আচ্ছন্ন হ'তে পারে, মাথা ও শরীরের যন্ত্রণায় এক সময়ে সে নেতিয়ে পড়তে পারে,—কিন্তু সেই তন্দ্রার ঘোরে যদি পৃথিবীর সমস্ত অভিশপ্ত পরিত্যক্ত সন্তানের দল তা'র বুকের তলায় এসে আশ্রয় নিয়ে মর্মান্তিক কান্না কাঁদতে থাকে? বঞ্চিতের ক্ষুধিতের ব্যর্থ ব্যথিতের সেই কান্না তা'র উৎপীড়িত বুকের মধ্যে মথিত হয়ে যদি শুধু গরল ওঠে, যদি অমৃতের সন্ধান সে না পায়? থাক্, ঘুম যেন তা'র না পায়!

বড়মাসি!

হঠাৎ চমকে উঠলো ভাস্বতী। ওপাশে যে কুণ্ডলীটা এতক্ষণ নিঃসাড়ে প'ড়ে ছিল, সে কখন্ যেন উঠে বসেছে। এবার সে যেন প্রেতমূর্তির মতো কাছে এসে ডাকলো, বড়মাসি?

ভাস্বতী সাড়া দিল, কে রে, অন্তু? তুই এখানে?

অন্তু বললে, মামা বলেছে আমাকে বাড়ী ঢুকতে দেবে না।

ও, কিন্তু চায়ের দোকানে তুই যে কাজ করতিস, বাবা?

তা'রা আর কাজ করতে দেবে না বড়মাসি!

ভাস্বতী তা'কে কাছে টেনে নিল। স্নেহের স্পর্শমাত্রই ছেলেটা কেঁদে উঠে কোলের মধ্যে ভেঙে পড়লো। কাঁদুক, ওর কান্না না থামুক—সমস্ত অনাদর, লাঞ্ছনা ওর চোখের জলের সঙ্গে ধুয়ে যাক্, ওর কান্না যেন এখন না থামে। ভাস্বতী বড় কঠিন মেয়ে!

রাত এখনো বোধ হয় বারোটা বাজেনি। ভাস্বতী তা'র মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, খেয়েছিস কিছু?

না।

ভাস্বতী কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে, আমার হাত ধ'রে নিয়ে যেতে পারবি অন্তু, আমি যেখানে যাবো?

অন্তু সোৎসাহে বললে, হ্যাঁ পারবো। যাবে তুমি? তোমার বুঝি অসুখ করেছে বড়মাসি?

ভাস্বতী জ্বরের ঘোরে কাঁপছিল। বললে, যাদের কোথাও আশ্রয় নেই, তাদের অসুখ করলে কি চলে, বাবা? আয় আমার সঙ্গে।

অন্তুর হাত ধ'রে ভাস্বতী আবার পথে নামলো। বাড়ী থেকে বিতাড়িত

সে ভ্রূক্ষেপ করেনি, হাঁটতে হাঁটতে কোথায় সে এসে পড়েছিল। পথ অপরিচিত। এদিকে কোনোকালেই তার চেনা-পরিচয় নেই। রাত্রির নির্জনতায় সেই পথ যেন ছমছম করছিল। অন্তুর নির্দেশে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে তারা চললো অনেক দূর। আজকের এই রাত্রির অবশ্যই অবসান ঘটবে, কিন্তু কাল সকালে প্রখর সূর্যের আলোয় কেমন ক'রে পৃথিবীর দিকে সে মুখ তুলবে? একথা কি তার কপালে লেখা থাকবে না যে, ক্ষুধা দারিদ্র্য আর দুর্গতির কাছে সন্তানকে বলি দেওয়া হয়েছে! একথা কি লেখা থাকবে, দারিদ্র্যের অশুচিতা থেকে অশ্রদ্ধার জন্ম, অশ্রদ্ধা থেকে অপমানের?

প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগলো অতনুর বাড়ীর কাছে এসে পেঁছতে। পা দুখানা ভেঙেগ পড়ছিল ভাস্বতীর। উপবাস আর পথশ্রমে সে অভ্যস্ত, কিন্তু জ্বর ও যন্ত্রণা তাকে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকতে দিচ্ছে না। বাড়ীর সামনে দিয়ে ঘুরে কানাচের পাশ দিয়ে রান্নাঘরের জানলা পেরিয়ে ভাস্বতী এসে দাঁড়ালো হরিদাসের ঘরের জানলার ধারে। ভিতরে আলো জেবলে গরম কাপড় গায়ে মুড়ি দিয়ে হরিদাস অত রাত্রেও নিজের মনেই রামায়ণ পড়ছিল। বুড়োর চোখে-মুখে নিবিড় অনুরাগ লক্ষ্য ক'রে ভাস্বতী কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো। কিন্তু হরিদাস যেইমাত্র বইখানা মুড়ে আজ রাত্রের মতো বন্ধ করবে, ঠিক সেই সময় ভাস্বতী শান্ত মৃদু কণ্ঠে ডাকলো, হরিদাস—

হরিদাস চমকে মুখ তুলে তাকালো। বললে, কে, দিদি—? আবার এত রাত্রে?

দরজাটা একবার খোলো ত' ভাই। কিন্তু তুমি চেঁচামেচি করো না যেন, হরিদাস। ডাক্তার কি ঘুমিয়েছেন? পেছনের দরজাটা খুলে দাও।

হরিদাস হন্তদন্ত হয়ে এসে দরজা খুলে দিল। বললে, আবার যে ফিরে এলে, দিদি? তুমি না জ্বর নিয়ে গিছলে?

ভাস্বতীর সঙেগ অন্তু এসে ঘরে ঢুকলো। ভাস্বতী সহাস্যে বললে, হ্যাঁ, জ্বর আছে বৈকি, একটু শীতও করছে। কিন্তু এই গুণধর শ্রীমান আজ রাগ করে বাড়ী যায়নি কিনা,—তাই বললুম চল্ অন্তু, তোকে নিয়ে যাই আমার ভাই হরিদাসের ওখানে। তোমার রান্নাঘরে আছে নাকি কিছু ভাই হরিদাস?

হরিদাস তৎক্ষণাৎ সোৎসাহে বললে, ওমা, তা নেই? তোমার জন্যেই ত'

একঘর রান্না রেঁধেছিলুম, দিদি। মাছের কালিয়া, মুড়িঘণ্ট, ঘিভাত, ফুল-কপির তরকারি—

আস্তে বলো, হরিদাস—বাবুর ঘুম না ভাঙে! তুমি অন্তুকে খাইয়ে দাও ভাই, ও আজ রাগ ক'রে ভাতে বসেনি!

তুমি খাবে না, দিদি?

ভাস্বতী বললে, বেশ যা হোক, আমার যে পেটভরা! আজ অনেক খাওয়া হয়েছে আমার! তার ওপর এই জ্বর!—

দিদি, তোমার কাপড়খানা ছিঁড়লো কেমন ক'রে? কপালে কালশিরের দাগ, হাতখানায় রক্তের ছড়—

আর বলো না, ভাই—ভাস্বতী বললে, সেই যে রিক্‌সা ক'রে গেলুম, নামতে গিয়ে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লুম নর্দামার ধারে—তারপর বুঝতেই পাচ্ছ! তবে হ্যাঁ, দাগটা মিলোতে একটু সময় নেবে বৈকি। আর শোনো, রান্নাঘরের বারান্দায় আমার কাপড়খানা আছে, অমনি এনো ভাই। কাল সকালে ডাক্তারের হাতে অন্তুকে আমি সঁপে দেবো, হরিদাস।

অন্তুকে সঙ্গে নিয়ে হরিদাস খুশীমুখে রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল। অন্তুর বরাত খুলে গেছে আজ। ষোড়শ উপচারে অত রাত্রে অন্তুকে খেতে বসিয়ে ফিরে এসে হরিদাস পাশের ঘরে দুজনের বিছানা পেতে দিল। বুড়ো মানুষ, তাই তার মনের কোনো বাঁধন নেই। এরই মধ্যে তার চোখ দুটোয় জল ভ'রে এসেছে। সুতরাং সে একটি কথাও আর মুখ দিয়ে বার করতে পারলো না। গায়ে ঢাকা দেবার গরম চাদর এনে বিছানায় দিল। খাবার জল এনে রাখলো মাথার পাশে।

অন্ধকারে মুখখানা কোনো মতে লুকিয়ে চোখ বুজতে পারলে ভাস্বতী তখনকার মতো বাঁচে। তারও কথা বলার শক্তি আর ছিল না। ডাক্তারের ওদিকটা তখন একেবারে নিস্তব্ধ।

অন্তু যখন খেয়ে দেয়ে আঁচিয়ে এঘরে এসে দাঁড়ালো, ভাস্বতী তখন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। সর্বাঙ্গে মুড়ি দিয়ে শুয়ে চেতনাও যেন তার লোপ পেয়ে গেছে। অদূরে এসে হরিদাস একবার দাঁড়ালো। অন্তু গিয়ে শুয়ে পড়লো তার এসংসারের একমাত্র স্নেহের আশ্রয় বড়মাসির পাশে। অতি

মৃদুস্বরে হরিদাস একবার প্রশ্ন করলো, এবাড়ীতে একলা থাকতে পারবে ত' ভাগ্নে?

হাসিমুখে অন্তু শুয়ে শুয়েই জবাব দিল, হ্যাঁ, পারবো। বেশ ত' থাকবো!

কোঁচার খুঁটে চোখ দুটো মুছে হরিদাস আলো নিবিয়ে চ'লে গেল।

সকাল বেলা চা খাবার আগেই অতনু এসে ঘরের সামনে দাঁড়ালো অসন্তুষ্ট মুখে। পিছনে পিছনে হরিদাস এসে বললে, বাবু, আপনি আমাকে গালমন্দই দিন্ আর যাই করুন, আমি সত্যি কথাই বলবো। আজ উঠ্‌তে আমার একটু দেরিই হয়েছিল, ভাগ্নেও তখন ঘুমিয়ে—দিদি তার আগেই উঠে চ'লে গেছেন। জ্বর-গায়ে এসেছিলেন, কিচ্ছু খেতে চাননি। আপনার ঘুম না ভাঙ্গাই, এই তাঁর হুকুম ছিল। আমি কি করবো বলুন? গেলাসের জলটুকু খেয়ে গেছেন, আর ওই ছেঁড়া কাপড়খানা ছেড়ে নিজের কাপড়খানাই প'রে গেছেন। আমি কিচ্ছু জানতে পারিনি, বাবু।

অন্তুর মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে অতনু বললে, হ্যাঁরে তোর বড়মাসি কি রাগ ক'রে বাড়ী থেকে এসেছিল?

অন্তু বললে, তা জানিনে ত অতনুমামা, বড়মাসি রাস্তার রকে বসে ছিল, আমিও ছিলুম সেখানে। তখন অনেক রাত্তির!

আজ কোথাও তার যাবার কথা ছিল?

কই না?

ব্যাপারটা দুর্বোধ্য লাগলো। কিন্তু আপাততঃ সেকথা স্থগিত রেখে অতনু বললে, বেশ, আমার কাছে তুই আজ থেকে থাকতে পারবি ত? মন-কেমন করবে না?

অন্তু বললে, একটুও না। আর কোথাও যাবো না আমি।

মন দিয়ে লেখাপড়া শিখবি ত? মাস্টারের কাছে পড়া করবি?

অন্তু সোৎসাহে বললে, হ্যাঁ, আমার খুব পড়তেই ইচ্ছে করে। তুমি মাস্টার রেখে দেখো?

অতনু তার পিঠ চাপড়ে বললে, আচ্ছা যা, তোর সব ভার আমি নিলুম।

হরিদাস পাশে দাঁড়িয়ে এই সুশ্রী সুন্দর ছেলেটার উত্তর-প্রত্যুত্তর হাসি-মুখে শুনছিল। এবার বললে, বাবু, আমি কি একবার মেসোমশাইয়ের ওখানে খবর নিতে যাবো? দিদি বাড়ী ফিরলেন কিনা জানা দরকার!

তোর গিয়ে কাজ নেই, হরিদাস, আমিই যাচ্ছি।—এই ব'লে অতনু সেখান থেকে চ'লে গেল। সমস্ত রাত্রি ধ'রে যে-ব্যক্তি পথে পথে ঘুরে এক জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে, তার ভিতরকার সমস্যাটা অনুধাবন করতে একটু দেরি হয় বৈ কি। সুতরাং অন্যমনস্কভাবে চা খেয়ে প্রস্তুত হয়ে অতনু তার চেম্বারে যাওয়া আপাতত স্থগিত রেখে বেরিয়ে পড়লো।

ভাস্বতীকে একথাটা কোনোদিন বোঝানো যায়নি যে, দারিদ্র্যের একমাত্র প্রতিকার হোলো সংগ্রাম। চল্‌তি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম, সেখানে একপ্রকার আত্মিক শক্তির কথা ওঠে। সেই শক্তির পরীক্ষার মধ্যেই আদর্শের প্রতিষ্ঠা। ভাস্বতী একথা বুঝতে চায় না, দারিদ্র্য থেকে জন্ম স্বভাব-দৈন্যের। ভাস্বতী বলে, দারিদ্র্যই হোলো চরিত্রের অগ্নিপরীক্ষা। ওরই কষ্টিপাথরে মানুষের সত্য পরিচয়কে চিনে নাও, ওরই আগুনে পুড়িয়ে লোহাকে ইস্পাত বানিয়ে তোলো। অতনু বলতো, মানুষ ছোট হয়ে জন্মায় না, অবস্থাই তাকে ছোট করে। ভাস্বতী বলতো, না, একথা স্বীকার করিনে অতনু। যে-হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে মানুষ বেড়ে ওঠে, সেই হাওয়ার শুচিতাই হোলো আসল কথা। অশুচি হাওয়া থেকে লোভ আর অসন্তোষের জন্ম হয়, কিন্তু শুচি-শুদ্ধ হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে দেখো, দৈবমাধুর্যে তোমার স্বভাবটি নির্মল হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে!

অতনু জবাব দিত, দারিদ্র্য কি অশুচি হাওয়ার সৃষ্টি করে না, তুমি বলতে চাও?

হাসিমুখে ভাস্বতী জবাব দিত, তপোবনের দিকে তাকাও, সেখানে সম্পদ-সমারোহ নেই, সম্ভোগের চিহ্নও নেই, কিন্তু তার জন্য জীবন-সাধনা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। চারদিকের বিষবাষ্পে মানুষের যখন কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছে, আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি তখন একটি দরিদ্র সুন্দর তপোবন! একথা শুনলে হয়ত তুমি হাসবে!

অতনু হাসেনি, কিন্তু ভাস্বতীকে সে বুঝবার চেষ্টা করেছিল।

মাইল খানেক পথ, কিন্তু ওই পথটিতে অতনু যেন ভাস্বতীকে সঙ্গী

পেয়ে গিয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে বস্তির গলিতে সে যখন এসে ঢুকলো বেলা তখনও নয়টা বাজেনি।

অতনু রাশভারি লোক। সমালোচনা কটূক্তি বিরুদ্ধবাদ, এ সমস্তই তার আড়ালে হয়ে থাকে। কিন্তু সামনে এসে দাঁড়ালে তার গম্ভীর চেহারা দেখে সবাই সমীহ করে। তাছাড়া সে দীর্ঘকায়, স্বাস্থ্যবান পুরুষ। সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়ালে সকলের থেকে তার মাথাটাই ছাড়িয়ে ওঠে।

নর্দমার পাশ দিয়ে পেরিয়ে উঠোনের মাঝখানে এসে যখন সে দাঁড়ালো, তখন ওধার থেকে দ্বিজেন তার দিকে এগিয়ে এলো। চোখ দুটো তার লাল। বললে, মা মারা গেছে কাল শেষ রাত্রে।

মারা গেছে! অতনু চমকে উঠে এদিক ওদিক তাকালো। কাঁদছে না কেউ, সবাই চুপ ক'রে ব'সে রয়েছে। ফুলির ঘরের সামনে দীপেন ব'সে রয়েছে মাথা নীচু ক'রে, ওধারে বরুণা আর শীলু স্তব্ধ, ঘরের মধ্যে মৃগেন্দ্র নিঃসাড়ে প'ড়ে রয়েছেন। আশপাশে নানা মেয়ে-পুরুষ মুখ বাড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে। যমুনা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে নি এবং সন্দেহ নেই—কান্নাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। উঠোনে একটা বাঁশ প'ড়ে রয়েছে দেখলে সহজেই বুঝতে পারা যায়, মৃতদেহ ঘর থেকে এখনও বার করা হয় নি। তার চেয়েও সহজে বুঝতে পারা যায়, মৃতের সৎকারের জন্য যে খরচের দরকার, তাও এদের হাতে নেই। কিন্তু ভাস্বতীকে এখানে ওখানে কোথাও দেখতে না পেয়ে অতনু মনে মনে দুর্ভাবনায় কণ্টকিত হয়ে উঠলো।

কেউ একটি কথা বলছে না, দ্বিজেনও চুপ করে গেল। অতনু পায়ের জুতোটা খুলে দাওয়ার ওপর একবার ব'সে পড়লো। কিন্তু তার সেই অবসাদ দু মিনিটের মধ্যেই কাটলো। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে সে গিয়ে একবার ঢুকলো যমুনার ঘরে—যমুনা জেগে আছে স্তিমিত চক্ষে। অতনু বসলো তার বিছানার পাশে। আনন্দের কথা, যমুনারও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে! বোধ হয় কেউ কিছু খাওয়াতে গিয়েছিল, মুখ থেকে গড়িয়ে পড়েছে। কপালে হাত বুলোতেই যমুনার চোখের কোণে জল ভ'রে উঠলো। কি যেন সে বলতে চায়। অতনু হেঁট হয়ে শুনলো যমুনার অতি ক্ষীণস্বর, তুমি রাগ করো নি, বড়দা?

রাগ করবো কেন, ভাই?

দাদা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে বড়দিকে। সে আর ফিরবে না! আমাকে আর কে দেখবে, বড়দা?

অতনু গলা পরিষ্কার ক'রে বললে, তোকে? আমরা সবাই আছি, তোর ভয় কি, বোন? তুই একটু সেরে উঠলেই তোর সব ব্যবস্থা ক'রে দেবো। তোকে ফেলে কোথায় যাবে তোর বড়দি?

যমুনা চুপ ক'রে রইলো। কিন্তু নাড়ী পরীক্ষা ক'রে অতনু বুঝলো, আর দু' একদিন মাত্র, তার বেশী এ রোগী আর বাঁচতেই পারে না। যমুনার মাথায় হাত বুলিয়ে অতনু উঠে বাইরে এলো এবং সোজা গিয়ে দাঁড়ালো তরুবালার মৃতদেহের সামনে। তরুবালার ফুসফুসের চারিদিকে রক্ত জমাট বাঁধবার একটা সম্ভাবনা মাঝে মাঝে দেখা দিত, তখন চিকিৎসা করতো অতনু, কিন্তু সে-চিকিৎসা তরুবালা নিজেই বন্ধ করেছিলেন। শীলু একবার উঠে দাঁড়িয়ে বললে, দিদিমা কাল সন্ধ্যেবেলা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, আর জ্ঞান ফেরেনি!

হুঁ—ব'লে অতনু মৃগেন্দ্রের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালো। অসুস্থ উপবাসী মৃগেন্দ্র একবার মুখ তুলে তাকালেন। পরে বললেন, ছোটবৌ রাগ ক'রে না খেয়ে ম'রে গেল, বুঝলে অতনু? রক্তের চাপ বেড়েছিল অনেক দিন থেকে, কিন্তু রাগ ক'রে নিজের দিকে তাকালো না। আমার মনে হচ্ছে, আমিও আর উঠতে পারবো না!

অতনু শান্তকণ্ঠে বললে, মাসিমার শেষ কাজটা ত এখনই করতে হয়!

না অতনু। তুমি হাত দিতে যেয়ো না, কোনো সাহায্য তুমি ক'রো না! দুই ছেলে রয়েছে সামনে—দ্বিজু এসেছে একটু আগে—ওদের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছি। দেখি, ওরা কি করে!

অতনু বললে, কিন্তু আমি যে ওদের সকলের বড়,—চুপ ক'রে ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে গেলে নিজের কাছেই যে আমার মাথা হেঁট হবে, মেসোমশাই?

মৃগেন্দ্র বললেন, না, তোমাদের উঁচু মাথা কোনোদিন হেঁট হবে না, অতনু! আমি শুধু দেখে যেতে চাই, একালের ছেলে হয়ে ওরা জননীর শেষ সম্মান কেমন ক'রে রাখে!

ওধারে দীপেন এবার হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। ছেঁড়া গামছাখানা কোমরে জড়িয়ে বললে, ব্যস, ঠিক আছে। ওই একখানা বাঁশেই হবে,—ওখানা কাটলেই

ত' অনেক বাঁকারি পাবো। ঘরের খঁুটি থেকে দড়ি কেটে নিলেই চলবে। শীলু, কাটারিখানা চেয়ে নিয়ে আয় ত?

দ্বিজু চেঁচিয়ে উঠে বললে, বড্ড বাজে বকিস তুই, দাদা। বাঁশ-বাঁকারি হ'লেই হোলো? অন্য খরচ নেই? অশৌচের কাপড় কিনতে হবে না? শ্রাদ্ধশান্তি নেই?

দীপেন থমকে দাঁড়িয়ে বললে, কাল যমুনার বিছানার তলা থেকে তুই ত' টাকা নিয়ে পালিয়েছিলি, সে-টাকা নিয়ে আয়?

ও, আমি টাকা নিয়ে পালিয়েছিলুম! সে যেন তোর টাকা! আর তুই যে ছ'মাস ধ'রে অন্তুর মাইনের টাকা নিয়ে তোর ময়রা-বৌকে খাইয়েছিস?

মুখ সামলে কথা বলিস, দ্বিজু! বদমাইস, চোর কোথাকার!

চোর! তুই খুব সাধু, নয়? আমি বড়দির টাকা নিয়েছি, বেশ করেছি! সে টাকা তোর নয়!

দীপেন চীৎকার করলো, বড়দির কোন্ বাবার টাকা? সে টাকা কোত্থেকে সে হাত-সাফাই করতো এতকাল ধ'রে। ফের তুই তার ওকালতি করতে আসিস?

দূরে দাঁড়িয়ে অতনু শুধু মৃদু হাসলো। দ্বিজেন এবার আগুন হয়ে বললে, যাকে মেরে তাড়িয়েছিস্, তার নামে কোনো কথা বললে কিন্তু ভালো হবে না ব'লে দিচ্ছি!

কেন, মারবি নাকি? ভয় দেখাচ্ছিস যে? চোরের সঙ্গে চোরের নাক-সোঁকাসুঁকি, না? তোকে বুঝি মাঝে মাঝে সে ঘুষ খাওয়াতো?

আজ খুন ক'রে ফেলবো তোকে—দ্বিজেন এবার ঝাঁপ দিল সামনে। ওদিক থেকে চীৎকার ক'রে উঠলো বরুণা। বেপরোয়া দীপেনের মাথাতেও কাল সন্ধ্যা থেকে ভূত চেপে ছিল, সেও আঁস্তাকুড়ের ধার থেকে একখানা নোংরা বাঁকারি তুলে নিয়ে তাল ঠুকে দাঁড়ালো। উচ্চকণ্ঠে বললে, আমিও খুন করতে জানি। আয় তুই, মায়ের মড়া সামনে রেখে আজ হেস্তনেস্ত হোক।

অধিক বাহুল্য। ঝড় বয়ে গেল দীপেনের ওপর দিয়ে,—তাকে নর্দমায় ফেলে যখন দ্বিজেন তা'র পিঠে চড়বার চেষ্টা করছে তখন তা'র স্বাস্থ্যের

দিকে তাকিয়ে স্ফীতোদরা ফুলি এসে কেঁদে পড়লো তা'র পায়ে—ঠাকুরপো, এবারটা ওকে ছেড়ে দাও! তোমার পায়ে পড়ি—

অতনু নেমে এসে পাশ কাটিয়ে নতমুখে বেরিয়ে যাচ্ছিল, দ্বিজেন হঠাৎ দাদার পৃষ্ঠাসন ছেড়ে উঠে গিয়ে অতনুর পায়ের ওপর প'ড়ে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো, বড়দা, তুমি আমাদের ক্ষমা করো, বড়দা!

কঠিন গম্ভীর মুখে অতনু শান্ত হয়ে দাঁড়ালো। বললে, ক্ষমা! তোদের সবাইকে যে ক্ষমা করতে পারতো, তা'কে অপমান ক'রে তাড়ালি কোথায়, খোঁজ নিবি কোনোদিন? আমার দয়া আছে, কিন্তু ক্ষমা নেই, দ্বিজু।

দ্বিজু তা'র দুই পা জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বললে, তুমি না দিলে আর কেউ দেবার নেই, বড়দা। তুমি আমাদের সামনে দাঁড়াও, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

নর্দমার পাঁক মুখে মেখে দীপেন তখন কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়েছে।

নয়

অতনু ব'লে এসেছে এতকাল, সে যুদ্ধে যাবে। পৃথিবীর যেখানেই যুদ্ধ মন হ'য়ে উঠবে, সেখানেই সে যাবে স্বেচ্ছাসৈনিক হয়ে। চিরস্থায়ী শান্তি-প্রতিষ্ঠার কামনায় মানুষ চিরকাল ধ'রে যুদ্ধ চালিয়ে এসেছে। বদ্‌রক্তের সঙ্গে পুণ্যরক্তের ক্ষয় হয়, কিন্তু সর্বব্যাপী অকল্যাণকে ধ্বংস করার জন্য পুণ্যরক্তদানেরও প্রয়োজন আছে বৈ কি। নইলে রামায়ণ মিথ্যে, মহাভারত মিথ্যে। মহামানবের রক্ত ঝরেছে হৃৎপিণ্ড থেকে, সেই রক্তে শুচিস্নাত হয়েছে সবাই যুগে যুগে। অতনু যুদ্ধে যাবে সেই আনন্দে, সেই অনুপ্রেরণায়। একদা পাপ আর পুণ্যের মধ্যে সংগ্রাম বেধে উঠতো, অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্ম। পরের যুগে এলো প্রভুত্ব-স্বীকৃতির লড়াই—যার নাম একচ্ছত্রতা। তারপরে একে একে এলো বন্যতার বিরুদ্ধে সভ্যতা, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র, ক্ষমতার বিরুদ্ধে বশ্যতা, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে পরাধীনতা,—এখন চলছে আইডিয়ার বিরুদ্ধে আইডিয়া। মানুষের ইতিহাস হলো এই। সর্বগ্রাসীর বিরুদ্ধে সর্বহারার সংগ্রাম, তাও পুরনো হয়ে এলো! এর মাঝখান দিয়েই অতনুর যুদ্ধে যাবার কথা ছিল। মত বদলেছে, পথও বদলে গেছে, কিন্তু তবু রয়ে

গেছে সামনে আবহমানকালের সেই অনির্বাণ প্রদীপের আলোটা—বহু মানুষের দুঃখ-মোচনের জন্য তোমাকে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করে যেতে হবে; তোমার আর কোনো পথ নেই, আর কোনো কাম্য নেই। ওটাই পৌরুষ, ওটাই তোমার সত্য পরিচয়। আজ মানুষের ধর্ম কাঁদতে বসেছে একপ্রান্তে, আর পশুধর্ম তা'র রাজ্যপাট বিস্তার ক'রে চলেছে সকল প্রান্তে—এই হোলো সভ্যতার সর্বশেষ সংগ্রাম! এই সংগ্রামে অতনুর স্বেচ্ছাসৈনিক হবার কথা ছিল, কেন না, এটা মনুষ্যত্ব-প্রতিষ্ঠার অভিযান। দিকে দিকে আজ অশ্রদ্ধেয় চিন্তাধারার অভিব্যক্তি, বিষকলুষিত চিত্তবৃত্তির প্রকাশ, প্রতি অসন্তুষ্ট মনে প্রতিহিংসার পাশব ষড়যন্ত্র, বিদ্বেষে সংশয়ে লোভে জর-জর প্রতি মানুষের অন্তরে দুষ্প্রবৃত্তির কদর্য প্রতিক্রিয়া—এদের বিরুদ্ধে মাথা তোলবার জন্য মানবধর্মের চিরকালীন জয়যাত্রা—অতনু হবে তা'রই স্বেচ্ছাসৈনিক। এর জন্য অতনু তা'র হৃদয়কে শান দিয়েছে বার বার, এর জন্য প্রস্তুত করেছে নিজেকে সে তিলে তিলে। ভাগ্যকে সে অন্বেষণ করেনি, বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করেনি,—লোকসংস্কারের চল্‌তি ধারণাকে সে বরাবর দূরে সরিয়ে রেখেছে। পিছন থেকে কে যেন তাকে বারংবার অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বলেছে, গার্হস্থ্য জীবন-যাপনের প্রতি লোভ ক'রো না অতনু, নিজেকে তোলো, নিজেকে ভোলো। চেয়ে দেখো চারদিকে,—মহত্ত্বের অপমরণ, নিরন্নের আত্মবলিদান, আদর্শবাদীর জীবন-অপচয়, ভয়হীন সত্যভাষীর ওপর নিষ্ঠুর উৎপীড়ন—এদেরকে বাঁচবার জন্য খড়্গ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াও অতনু—সেই হ'বে তোমার প্রকৃত পৌরুষ, সেই হবে তোমার ওপর পরম আশীর্বাণী!

ভাস্বতী ব'লে এসেছে, না, যুদ্ধ তা'র জন্য নয়—সে চায় আত্মপ্রকাশ, সে চায় অভিব্যক্তি। ক্ষমা, করুণা, মমতা, ভালোবাসা—এরা মিথ্যে নয়, শুধু কথার কথা নয়। মার খাও, কিন্তু আঘাত ক'রো না। নিজেকে দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয় করো, মনে মনে প্রার্থনা জানাও, দেবত্বের প্রতিষ্ঠা করো আপন হৃদয়ে—যিনি যুগস্রষ্টা, যিনি কল্পান্তকারী—তাঁর চোখ পড়বে তোমার দিকে। মনে রেখো সকলের সম্মিলিত ইচ্ছা থেকে জন্ম হয় কল্যাণের। তুমি যন্ত্র, যন্ত্রী তুমি নও। প্রকৃতির সঙ্গে রয়েছে চিরকালের বিধি—সেই বিধি আকাশকে নীল করে, পাখীর কণ্ঠে গান দেয়, ফুলে গন্ধ আনে, মাটিকে প্রাণময় করে, জীবনের ভিতর দিয়ে অনুরাগকে প্রকাশ করে। মানুষের মহত্ত্বের সঙ্গে দেবতার

দেবত্বের মিলন—এটাই হোলো আগামী যুগের সাধনা। সেই সাধনার তপোবনে এসে তুমি দাঁড়াও, অতনু।

অতনু প্রশ্ন করতো, কিন্তু প্রত্যেকদিনের জীবন-সমস্যাটা? প্রাণের ভিতরকার অস্থির আন্দোলনটা?

ভাস্বতী হাসতো। হেসে বলতো, ওটাই অসুরের চক্রান্ত, অতনু। প্রথম সাবালক হয়ে রাম-লক্ষ্মণ গিয়েছিল যজ্ঞ করতে! কোন্ মন্ত্র নিতে গিয়েছিল তাঁরা সেই যজ্ঞের হোমকুণ্ড থেকে? সর্বত্যাগের মন্ত্র, লোককল্যাণের মন্ত্র, মহৎ নিরাসক্তির মন্ত্র। তারা চেয়েছিল শক্তি, বীর্য, সাহস, প্রতিভা। কিন্তু অসুরশক্তি তাড়কা এলো সেই যজ্ঞ পণ্ড করতে। তাড়কা কেন এসেছিল? তারো ছিল জীবন-সমস্যা, ছিল দারিদ্র্য, ছিল অশিক্ষা, ছিল হিংসা বিদ্বেষ সংশয় আর লোভ! সেদিন নির্ভুল লক্ষ্যের দ্বারা তাড়কাকে বিনাশ করেই রাম-লক্ষ্মণ অজেয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল। তোমার লক্ষ্যকেও নির্ভুল করো, অতনু। হিংসা নয়, অব্যর্থ লক্ষ্য,—তাতেই দারিদ্র্যের বিনাশ। আগে যজ্ঞের মন্ত্র স্থির করো, প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলো, নিরাসক্ত লোককল্যাণের অর্থকে জানো,—তারপরে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে দাঁড়াও গিয়ে ওই দারিদ্র্যের মুখোমুখি! আমি পথের মেয়ে, জাতিহীন জ্ঞাতিহীন গোত্রহীন। কিন্তু এই তিরিশ বছরের জীবনের ওই বিশাল পথ থেকে সঞ্চয় করেছি আমার প্রাণের অভিজ্ঞতা। মানুষমাত্রই দুর্বল। কেন না, অপমানে সে নুইয়ে পড়ে। ভালোবাসাই একমাত্র বস্তু, যা পৃথিবীর সমস্ত আঘাতকে হাসিমুখে মাথায় তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রেম যত বড় হয়, তত সে নির্ভয় হয়, ততই সে শক্তিলাভ করে!

আলোচনার শেষ দিকে অতনু জানতে চাইতো, তোমার এই প্রেমের কি মানবিক রূপ কিছু নেই, চীনু?

গাম্ভীর্যের ভিতর থেকে সহসা ভাস্বতী জ্যোতির্ময় উল্লাসের হাসি হেসে উঠতো। বলতো, হ্যাঁ, আছে বৈ কি। মাটির পুতুলকে লোকে পুজো করে, কিন্তু চোখ বুজলেই দেখো—অন্তরে তিনি জাগ্রত। তখন আর তিনি নেহাৎ মাটির পুতুল নন্।

এও কিন্তু বড্ড অস্পষ্ট রয়ে গেল, চীনু।

বড় বড় চোখে সভয়ে ভাস্বতী প্রশ্ন করতো, পুরুষ ছেলেরা বুঝি রক্ত-মাংসের পুতুলকেই পুজো করতে ভালোবাসে?

অতনু উচ্চকণ্ঠে হেসে সেখান থেকে পালিয়ে যেতো।

ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ হোলো। হরিদাস এসে দাঁড়ালো। বললে, আপনি তিন দিন ধ'রে চেম্বারে যান না, রুগীরা রাত দিন খোঁজখবর নিচ্ছে।

অতনু বললে, ডাক্তারদের বুঝি শরীর খারাপ হতে নেই, হরিদাস?

হরিদাস বললে, তাহ'লে আমি সেই কথাই ব'লে পাঠাবো! এবার আপনি উঠুন, রান্নাবান্না সব হয়ে গেছে।

অনেকগুলো বইপত্র জমেছে বিছানার চারপাশে। অনেক দেশের অনেক বই। মাসিক ও সাময়িক পত্রের ছড়াছড়ি—ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত। পেশা ডাক্তারী—কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের দিকে অত ঝোঁক কেন? সমাজতত্ত্ব নিয়ে মাথা না ঘামালে কি ডাক্তার মানুষের চলে না? তার চেয়ে দিবানিদ্রার ঠিক আগে নভেল-নাটক পড়লেই হয়? আর কিছু না পারো ত' মিথ্যে ডায়েরী লেখো,—যত রোগী দেখো, যত টাকা রোজগার করো, তার চেয়ে অনেক কম ক'রে লিখে রাখো! আয়কর-বিভাগের লোকরা যেন অবিশ্বাস করে না!

এসব ছিল ভাস্বতীর প্রায় নিত্যকার লাঞ্ছনা। যে সব অস্ত্রের প্রয়োগ অতনুর কাছে সে শিখেছিল, সেসব অস্ত্র একসময় অতনুর ওপরেই সে প্রয়োগ করতো।

রাশীকৃত বইয়ের ভিতর থেকে মুখ তুলে অতনু প্রশ্ন করলো, অন্তু কি এখানে মন-মরা হয়ে থাকে, হরিদাস?

আজ্ঞে, একটুও না। ওদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ছেলেটা এযাত্রা বেঁচে গেল, বাবু। দিদিমা মারা গেল, কিন্তু খবরটা শুনে ছেলেটা একটু গেরাহ্যিও করলে না। এ বাড়ীর হাওয়া লেগে নিজের আনন্দে নিজেই খুশী আছে। তবে কি জানেন, বড়মাসিকে পেলে আমার ভাগ্নে আর কিছুই চাইতো না, বড়মাসি বলতেই অজ্ঞান।

হুঁ।—অতনু জবাব দিল।

হরিদাস তখনকার মতো চ'লে গেল বটে, কিন্তু মনের কথাটা নিয়ে সে পাক খেয়ে বেড়ালো এখানে ওখানে। স্নান করে এসে অতনু খেতে বসলো, এবং আহারের পর্বটা যখন অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে চাট্‌নিতে এসে দাঁড়ালো,

তখন সাহস ক'রে হরিদাস এক সময় ভয়ে-ভয়ে বললে, দিদি বাড়ী ফিরলেন কিনা, আমি কি একবার খোঁজ-খবর নিয়ে আসবো, বাবু?

অতনু বললে, তিনি ওবাড়ীতে আর ফিরবেন না!

হরিদাস তার ব্যাকুল কণ্ঠকে সংযত করলো। শান্তকণ্ঠে শুধু বললে, আপনি তাঁর খবর কিছু পেয়েছেন, বাবু?

না।

তাহ'লে হয়ত কোনো কুটুমবাড়ীতেই গিয়ে উঠে থাকবেন।

কুটুমবাড়ী!—অতনু মুখ তুলে বললে, তুই এবাড়ীতে বুড়ো হয়ে মরতে চললি হরিদাস, দিদির ক'গণ্ডা কুটুম চারদিকে ছড়ানো আছে, তুই কি জানিসনে?

হরিদাস চুপ ক'রে গেল। দিদির সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা টানতে গেলেই বুড়ো মানুষের চোখ দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে। সেদিন রাত্রের ওই ছবিটা এই ক'দিনেও সে ভুলতে পারছে না। কপালে কালশিরার দাগ, সর্বাঙ্গ ব্যথা-বেদনায় জর-জর, গায়ে জ্বর, কাপড়খানা ছিন্নভিন্ন, মুখখানা উপবাসী, এক পা ধুলো—কিন্তু দুই চোখে কী দয়া, কী মিষ্ট স্নেহ! বনবাসে গিয়ে সীতার চোখেও বরং কান্না ছিল, কিন্তু দিদির মতন এমন দয়ার চেহারা বুঝি ছিল না!

হরিদাস সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে স'রে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অন্তু এসে দাঁড়ালো সামনে। অতনু সহাস্যে বললে, আমার সঙ্গে ব্যাটবল্ খেলতে পারবি?

খুব পারি।—অন্তু সোৎসাহে বললে, তোমাকে এক বল্-এ আউট্ ক'রে দেবো। খেলবে চলো সামনের মাঠে।

আচ্ছা, খেলবো একদিন, সবুর কর।—ব'লে অতনু আসন থেকে উঠে পড়লো।

অন্তু বললে, বড়মাসি কোথায় গেছে, বড়মামা?

কোথায় গেছে কেমন ক'রে জানবো? বড়মাসির সঙ্গে যেদিন দেখা হবে, জিজ্ঞেস করিস।

অন্তু কোন্ দিকে যেন একবার তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করলো, তুমি তাঁকে খুঁজে বা'র করবে না, বড়মামা?

অতনু বললে, দূর পাগলা, এত বড় শহরে খুঁজবো কোথায়? যা তোর

হরিমামাকে জিজ্ঞেস ক'রে আয়, লোকে না ব'লে পালালে আমি কি তা'র পেছন-পেছন ধাওয়া করবো?

সত্যই আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল হরিদাস, অন্তু হাসিমুখে সেইদিকে স'রে গেল।

হাত ধুয়ে অতনু নিজের ঘরের দিকে চ'লে গেল। চাঞ্চল্য তা'র ত্রিসীমানায় নেই, হরিদাসের চোখে এটা আশ্চর্য। এতটুকু তা'র কাঁপন নেই, এতটুকু নেই অধীরতা। এমন শান্ত এমন নিরাসক্ত অতনুকে আর কোনোদিন দেখা যায়নি। হরিদাসের সমস্যাটা শুধু ওইখানে। পরশুর আগের দিন শ্মশানে গিয়ে দিদিমার শেষ কাজ ক'রে সেই যে অতনু বাড়ী ফিরেছে সন্ধ্যার পর, তারপর থেকে সে ঘরের বাইরে পা বাড়ায়নি। মুখে চোখে তার কোনো উদ্বেগ নেই, সে যেন ডুবে গেছে নিজের মধ্যে। চেহারায় রুক্ষতা নেই, রাত-জাগার কোনো চিহ্ন নেই, বিষাদের কোনো ছায়া নেই—সমস্তই প্রসন্ন প্রশান্ত। কী নিশ্চিন্ত, কী আত্মগত!—হরিদাসের ইচ্ছা করে ওই পায়ে মাথা ঠুকে সে রক্তগঙ্গা হয়। দিদি হয়ত এতদিনে চ'লে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে, এক পথ থেকে অন্য পথে,—হয়ত এজীবনেও তা'কে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু ওই পাষাণ-দেবতার কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। ডাক্তারের এই কঠিন কঠোর হৃদয়ের পরিচয় কোনোকালেই হরিদাসের জানা ছিল না। অবাক হয়ে সে কেবল আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

ভাস্বতীর উপস্থিতিতে বরং ডাক্তারকে পায়চারি করতে দেখা যেতো। তখন জানা যেতো মনের অশান্তি, প্রকাশ পেতো অসন্তোষ। আচরণে ক্ষোভ দেখা যেতো, চাঞ্চল্য থাকতো সকল কাজকর্মের মধ্যে। ডাক্তার যে সংসার করেনি, তার কারণটা কি হরিদাসের অজ্ঞাত? প্রচুর অর্থউপার্জনের যে সমস্ত নিশ্চিত সুযোগসুবিধা ডাক্তার অবহেলায় ছেড়ে চলেছে এতদিন ধ'রে—তা'র রহস্য কি হরিদাস বোঝে না? এত বড় ডাক্তার, এত নামডাক—কিন্তু একখানা হাওয়া-গাড়ী কেনে নি; ভাড়াবাড়ী ছাড়া থাকেনি। টাকা এনে দেয় বুড়ো চাকরের হাতে, কিংবা প'ড়ে থাকে টেবিলের ওপর,—হরিদাস নাড়েচাড়ে, খরচ করে, ঘরকন্না গুছোয়—আবার কোথায় যেন জমিয়েও রেখে আসে। ভাস্বতী একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, ভাই হরিদাদা, এ জন্মে যেমন আনন্দে কাটলো, পরের জন্মে তোমার সেক্রেটারী হতে পারলেও তেমনি আনন্দে কাটবে, কি বলো?

হরিদাস চোখ পাকিয়ে সেদিন বলেছিল, দিদি, এর নাম তোমার আনন্দ? জীবনে ভালো একখানা কাপড় পরলে না, দ্'বেলা দ্মুঠো কোনোদিন পেট ভ'রে খেলে না, সাধ-আহ্লাদের ছায়া মাড়ালে না,—একে তুমি আনন্দ বলো, দিদি?

ভোগ করলেই বুঝি আনন্দ হয়, হরিদা? তোমার রামায়ণে কি ওই কথা লেখা আছে?

প্রশ্নটা জটিল,—হরিদাসের বিদ্যাবুদ্ধির বাইরে। মেয়েকে মেয়ে ব'লেই তা'র জানা আছে, এছাড়া ভিন্ন পরিচয় তা'র কাছে দুর্বোধ্য। রাজা রামচন্দ্রের সমস্ত ঐশ্বর্য ও সম্পদ থাকতেও সীতাদেবী ভোগ করতে পারেন নি, এই জন্যই হরিদাসের বেদনাবোধ। সীতাকে সন্ন্যাসিনী ব'লে সে কল্পনাও করেনি। সুতরাং বুড়ো হরিদাস বোকার মতো চুপ ক'রে গিয়েছিল। দিদির বিশ্বাসের খুঁটিটা এতই শক্ত মনে হয় যে, সেখান থেকে তা'কে কিছুতেই নড়ানো যাবে না।

ডাক্তারের হুকুম ছাড়া হরিদাসের নিজের কিছু করার সাধ্য নেই। কিন্তু তা'র ছটফটানিটা অতনুর চোখ এড়ায়নি। এক সময়ে নিজেই অতনু হাসি-মুখে বললে, তোর কি আর সংসারে মন নেই, হরিদাস?

হরিদাস চোখ মুছে বললে, না বাবু—

অতনু বললে, তা হ'লে এবার ব'সে ব'সে খাবার ইচ্ছে হয়েছে বল্? কত টাকা পেন্সন্ চাস্, হরিদাস?

দরজার কোণে উবু হয়ে ব'সে হরিদাস কেঁদে ফেললো। বললে, আপনার টাকা নিলে আমার কোনো মঙ্গল হবে না, বাবু।

বলিস কিরে? চলেও যাবি, আবার শাপ-শাপান্ত ক'রে যাবি? কেন, ব্যাপারটা কি বলতো?

হরিদাস নিজের কান্না সামলাচ্ছিল। কিন্তু আজ আর তা'র মুখের কোনো আগল ছিল না। আঁতুড় থেকে যাকে সে কোলে-পিঠে নিয়ে মানুষ করেছে, সে যত বড় ডাক্তারই হোক না কেন, সে আজও সেই শিশু। হরিদাস বেপরোয়ার মতো বললে, আপনার টাকা দিদির ভোগে হয়নি, আপনার টাকা দিদিমার ভোগে আসেনি—ওটাকা আমি কোনো দিন ছোঁবো না, বাবু। যা এতকাল ধ'রে জমিয়ে রেখেছি, সব বুঝে প'ড়ে নিয়ে আমাকে ছুটি দিন্।

অতনু খুব হাসলো। তারপর বললে, তুই এতই বুড়ো যে, এ বয়সে

বিরাগী হ'লে তোর নিন্দে হবে, তা জানিস? বুড়োর মনের দুঃখ কেউ গ্রাহ্য করে না! সবাই হেসে তোর পেছনে হাততালি দেবে।—আচ্ছা বেশ, তোর প্রাণের দুঃখটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু চাকরি ছেড়ে বুড়ো বয়সে তুই যাবি কোথায় বল্ দেখি?

ধরা গলায় হরিদাস বললে, যেদিকে দুচোখ যায়, সেইদিকে যাবো! দিদিকে যদি কখনো খুঁজে পাই, তবে ভিক্ষে ক'রে তাঁকে খাওয়াবো।

অন্তু ছুটে এলো ঘরের মধ্যে। বললে, বড়মামা, হরিদাস আজ চারদিন হোলো কিছু খাচ্ছে না।

বলিস কি রে?—অতনু হাসিমুখে উঠে বসলো, বললে, এবার তবে ওর সুবুদ্ধি হয়েছে। পঞ্চাশ বছর ধ'রে খেয়ে ওর পেট ভরা আছে, অন্তু, এবার বুড়ো হাড়ে ভেল্‌কি দেখাবে। কিন্তু তোর ইচ্ছেটা কি, হরিদাস, দিদিকে খুঁজতে বেরোবি?

চোখ মুছে হরিদাস তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো। বললে, হ্যাঁ, আমাকে যেতে দিন্, আমি চলে যাই—

দিদিকে খুঁজে পেলেও কি চাকরি ছেড়ে দিবি?

না, তা আর কেন দেবো! তবে এও ব'লে যাচ্ছি, দিদিকে যদি খুঁজে না পাই, তবে আপনার সব গুছিয়ে রেখে গেলুম—এ মুখ নিয়ে আর আমি ফিরবো না।

সহাস্যে অতনু বললে, না-ফিরে যাবি কোথায়?

হরিদাস ব'লে উঠলো, দিদিকে যদি না পাই, তবে মা-কালীকে আমার মনের কথা জানিয়ে আদিগঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দেবো!

ও, তার মানে তোর মরতে ইচ্ছে নেই। আদিগঙ্গায় কলসী ডোবে না, আর তুই যাবি ডুবে মরতে! তোর ওই সার্কাস দেখলে লোকে তোকে পাগল বলে দড়ি দিয়ে বাঁধবে, তা জানিস?

হরিদাস আর্তনাদ করে উঠলো,—বাবু, এই কি আপনার তামাসার সময়? আপনার মনে কি একটুও মায়া-মমতা নেই?

অতনু হাসিমুখে এবার উঠলো। বললে, তুই জ্বালালি হরিদাস। চারদিনে লোকে আমেরিকা পেঁৗছে যাচ্ছে, তিনি কি আর আছেন এদেশে? তাঁকে পাবি কোথায়? যাক্, তোকে আর যেতে হবে না। রাস্তায় বেরিয়ে গাড়ীচাপা

যাবার চেয়ে ঘরে বসে না খেয়েই মর।—বলতে বলতে উঠে সে বেরিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো।

অন্তু বললে, বড়মামা, তুমি কি বড়মাসিকে খুঁজতে যাচ্ছ?

অতনু বললে, দেখি একবার এদিকওদিক......সে কি আর ফিরবে! কোথায় গেছে কে জানে, আর গেলেই বা আটকায় কে? আটকালেই বা শুনবে কেন?—হরিদাসের দিকে ফিরে বললে, না খেয়ে ধর্ণা দিলেও আমি পেন্সনের টাকা বাড়াতে পারবো না। তার চেয়ে খেয়ে নিগে যা, গায়ে জোর থাকলে চাকরি বাঁচাতে পারবি! যাই দেখি একবার—এত ক'রে বলছিস!

আশ্চর্য অতনু। হরিদাস স্তব্ধ চক্ষে তার দিকে একবার তাকালো।

জুতো প'রে বেরোতেই বাইরের থেকে আওয়াজ এলো, বড়দা—!

দ্বিজুর গলা। অতনু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। বাইরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দ্বিজু বললে, সকাল বেলায় তোমাকে একবার নিয়ে যাবো ভেবেছিলুম, বড়দা—কিন্তু তার আর দরকার হোলো না!

অতনু থমকে দাঁড়ালো। দ্বিজেন বললে, যমুনা মারা গেছে।

ডাক্তার অতনুমোহন রোগীর মৃত্যুসংবাদ শুনে কাঁপে না। শুধু বললে, শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে?

না, তাই জন্যে তোমার কাছে এলুম।

মামার আওয়াজ পাবামাত্র অন্তু কোথায় যেন গিয়ে লুকিয়েছিল। হরিদাস শুধু এসে দাঁড়ালো অতনুর পিছনে। অতনু বললে, আমি যেতে পারবো না দ্বিজু, ছোট বোনের দেহটা নিজের হাতে আর নাই পোড়ালুম! হরিদাস, ওর হাতে গোটা পঁচিশেক টাকা এনে দেত'।

হরিদাস ভিতরে গেল। অতনু বললে, তোর বড়দি বাড়ী ফিরেছে?

দ্বিজেন বললে, সে কি আর ফিরবে কোনোদিন, বড়দা? সে আর ফিরবে না! এদিকে বুড়োকর্তা রোজ রাত্রে ঘরে-বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! খাওয়া নেই, ঘুম নেই—

কেন?

একটু রাত হ'লেই বড়দি নাকি ওই কানাচে এসে দাঁড়িয়ে বাবা ব'লে ডাকে, আর কাঁদে! এর মধ্যে দু'দিন বাবা কান পেতে শুনেছে—ওই পগারের দিকটার থেকে আওয়াজ আসে—

অতনু বললে, জলজ্যান্ত মানুষকে ভূতে পেয়েছে নাকি? যাকগে,—তোর বড়দি ফিরে এলে আমাকে জানিয়ে দিস।

হরিদাস টাকা এনে দিল দ্বিজেনের হাতে। দ্বিজেনের মুখখানা শুকনো দেখে অতনু বললে, খাবি কিছু এখানে?

না, থাকগে—তাড়াতাড়ি গিয়ে খাট আনতে হবে। আজকাল শ্মশানের কাছে বেশ ভালো হোটেল হয়েছে। গরম গরম জিলিপি আর কাটলেট্। মড়াটায় আগুন ধরিয়ে বেশ পেট ভ'রে খাওয়া যাবে! আচ্ছা চললুম—

মোটা টাকা হাতে পেয়ে দ্বিজেন আর দাঁড়ালো না, তাড়াতাড়ি চলে গেল।

পিছন থেকে হরিদাস বললে, বাবু এবার আপনি বেরিয়ে পড়ুন, আর বেলা করবেন না।

হ্যাঁ যাচ্ছি—ব'লে অতনু ধীরে সুস্থে রাস্তায় গিয়ে নামলো। হরিদাসের তাড়া আছে, কিন্তু অতনুর কোনো ব্যস্ততা নেই। হরিদাস এতকাল অবধি ভাস্বতীকে চেনেনি, অতনুকেও জানেনি। ভাস্বতীর মনে যে চিরকাল ধ'রে একটি অটল শান্তি বিরাজমান, একথা হরিদাসের জানবার কথা নয়। দুরন্ত চটুলতার বেগে ভাস্বতী কখনো ছোটে না, কেন না, তা'র চিত্তবিক্ষোভও নেই, অন্তর্দাহও নেই। লোভের বস্তু হাতছাড়া হ'লে মানুষ তা'র পিছনে ছোটে, প্রবল ব্যর্থতার জন্য অস্থির আক্রোশ আর অভিমান মনের মধ্যে পাক খেতে থাকলে মানুষ ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ পথে চ'লে যায়—এসব কথা হরিদাসকে বোঝাতে গেলে সময় নষ্ট হবে। অতনু নিজেকে বিচার ক'রে দেখলো,—না, তা'র অন্তরের কোনো প্রান্তে কোথাও চাঞ্চল্যের স্পর্শমাত্র নেই! সে ছুটবে না, কেন না, ছুটে গিয়ে ধরবার বস্তু ভাস্বতী নয়। আকুলতা প্রকাশ করবে না, কারণ অস্থির আসক্তির উপরে ভাবাবেগের রাজবেশ পরিয়ে বলা চলবে না—এরই নাম প্রেম!

মনে পড়ছে এমনি ক'রেই এককালে ভাস্বতীর খবর তা'কে আনতে হোতো। এক বিষয়ে মৃগেন্দ্রর সুবিধা ছিল, ভাস্বতীর লেখাপড়ার জন্য তাঁকে বিশেষ অর্থব্যয় করতে হয়নি। প্রাইভেটে সে পড়েছে, বই ধার ক'রে এনে আগাগোড়া মুখস্থ করেছে—এবং এসকল বিষয়ে ছিল তা'র আশ্চর্য দক্ষতা। অবসর সময় ভাস্বতী চ'লে যেতো নিভৃতে, যেখানে সে নিজের সঙ্গে মুখোমুখি—যেখানে আক্ষরিক বর্ণমালা ছাড়িয়ে গ্রন্থের সঙ্গে জ্ঞানের যোগাযোগ করা সহজ

হোতো,—ভাস্বতীর সত্যশিক্ষা ছিল সেইখানে। শিক্ষক মৃগেন্দ্র তাঁর প্রথম অধ্যবসায়সহকারে অতি যত্নে ভাস্বতীকে পড়াশুনো ব'লে দিতেন। কিন্তু মাঝে মাঝে ভাস্বতী চ'লে যেতো কোথাও নিজের মনে। অতনু তল্লাস করতে করতে সেখানে গিয়ে পেঁছিতো। অধ্যয়নের প্রতি তরুণী মেয়ের সেই একাগ্রতা দেখে হাসি সংবরণ করা কঠিন হোতো বৈ কি। অনেকক্ষণ দাঁড়াতো অতনু, কিন্তু ভাস্বতীর অটুট মনোযোগের কাছে সে হার মেনে যেতো। এক সময় গলা বাড়িয়ে বলতো, চ'লে যাবো, না সঙ্গে নিয়ে যাবো?

ভাস্বতী মুখ তুলে হাসতো। বলতো, তোমার ত' ডাক্তারি পড়া,—আগাগোড়া ফাঁকি। ওষুধের নাম মনে রাখলেই পাস করা যায়। বড়জোর একটু ছুরি ধরতে শেখা, বড়জোর একটু অঙ্ক কষা!

আর তোমার?—অতনু হেসে বলতো, বড়জোর এক আধটা ডিগ্রি, তারপরেই ত' বাসনমাজা আর বাট্‌না বাটা! প্রফেসারী করবার সময় পাবে? নাও, এবার চলো। মেসোমশাই বললেন, ভাস্বতী যেন সাজসজ্জা ক'রে মুখে পাউডার বুলিয়ে রাস্তার লোকের মাথা ঘুরিয়ে তোমার সঙ্গে বেড়াতে যায়! চলো, গুরুজনের অবাধ্য হ'তে নেই!

ভাস্বতী বইখাতা নিয়ে তখনকার মতো উঠে পড়তো। বলতো, গুরুজনের আদেশ পালন করতে গেলে কয়েক ঘণ্টা সময় চাই কিন্তু। কাপড়-জামায় সাবান দিতে হবে—কাপড়কাচা সাবানের দাম আবার অনেক বেশী। মুদির দোকানে পাঠাতে হবে ময়দা কিনতে, পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

ময়দা! ময়দা কেন?

পাউডারের বদলে ময়দা!

অতনু খুব হেসে উঠতো। ভাস্বতী বলতো, তারপর তোমার সঙ্গে যাওয়া! যাবো কোন্ চুলোয়?

অতনু জবাব দিত, এত বড় শহরে আমাদের দুজনের কোথাও কি ঠাঁই নেই? কত বাগান, কত নিরিবিলি গাছতলা, গঙ্গার ধার, চৌরঙ্গীর সামনে ময়দান—

কোথাও নতুনত্ব নেই। কোথাও কিছু পাওয়া যায় না মনে রেখো।

পাওয়া যায় না কেন?

তুমি পাশে থাকলে দেখা যায় কি কিছু? পৃথিবী মস্ত বড়, যদি একলা

থাকি। দেখতে পাই অনেক, ভাবতে পারি তা'র চেয়েও বেশী। কিন্তু তুমি কাছে থাকলেই সব লণ্ডভণ্ড। তুমি সব গ্রাস ক'রে ব'সে থাকো। এইজন্যেই ত' বলি, তুমি আমার শত্তুর!

অতনু বলতো, শত্রুর সঙ্গে কালক্ষয় না হয় নাই করলে। কিন্তু এবার কোন্ রাজকার্যে লিপ্ত হবে, শুনি?

ভাস্বতী জবাব দিত, ভাইবোনদের পড়াতে হবে না বুঝি? আমার পড়াশুনো ত' ওদেরই জন্যে! ওরা মানুষ হয়ে উঠলে তবেই ত' আমার শিক্ষার দাম!

ভাস্বতী সোজা ঘরে গিয়ে ঢুকতো।

অতনু মাঝপথে একবার থমকে দাঁড়ালো। একখানা ট্যাক্সি থেকে তা'কে হাত বাড়িয়ে ডাকছে। লোকটার মুখ চেনা, নইলে সেলাম জানায় কেন? কিন্তু গাড়ী নিয়ে সে যাবে কোন্‌দিকে? গাড়ী হোলো আতিশয্য। দ্রুত-গতিতে তা'র প্রয়োজন নেই। অনুসন্ধানের কাল তার কাছে দীর্ঘ হোক, বিলম্বিত হোক। অনন্তকাল তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকুক, তার কোনো তাড়া নেই। শান্ত হয়ে সে খুঁজবে, প্রতি পদে খুঁজবে, প্রতি মানুষের মুখের দিকে চেয়ে সে খুঁজবে। প্রসন্ন মনে, প্রশান্ত হৃদয়ে সে অগ্রসর হোক। গাড়ীতে তা'র দরকার নেই। যতদূরেই সে যাক্ না কেন, পায়ে হেঁটে সে যাবে। পরিশ্রম হোক, ক্লান্তিতে অবসন্ন হোক, অবসাদে হোক সে ভারাক্রান্ত—কিন্তু এ যাত্রাটা তা'র আনন্দের, এর শেষ লক্ষ্যটা পুণ্যময়। একথা কি সত্য নয় যে, ভাস্বতীকে সে খুঁজছে বহুকাল থেকে, কিন্তু আজও তা'কে আবিষ্কার করতে পারেনি! সমস্ত দারিদ্র্য আর নৈরাশ্যের মাঝখানে ব'সে যে মেয়েটি এতদিন ধ'রে জীবন-সাধনা করেছে, সমস্তপ্রকার ধিক্কার, বিকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ লাঞ্ছনা অপমানের মধ্যে যে নির্লিপ্ত সত্তা নীরবে ব'সে প্রতিদিন আপন স্বভাবের জ্যোতির্ময়তাকে প্রকাশ করেছে—কী ছিল তা'র অন্তরালে? সেখানে কি অতনু প্রবেশ করতে পেরেছিল কোনোদিন? কোনোদিন কি সে জানতে পেরেছিল, ভাস্বতীর পরম ক্ষুধা কামনা বাসনার সত্য চেহারাটা? ভাস্বতীর নিগূঢ় পিপাসার রহস্যটা কি কোনোদিন তা'র কাছে প্রতিভাত হয়েছিল?

সন্ধ্যা পর্যন্ত অতনু ঘুরে বেড়ালো। সে গেল সেই পল্লীতে—প্রায়

আটাশ বছর আগে যেখানে প্রথম ভাস্বতী এসে খেলা করতো অতনুর মাসি সুশীলার ঘরে। সে গেল জোড়ামন্দিরতলায়, যেখানে ভাস্বতী কোনো কোনো বিকালের দিকে গিয়ে পড়াশুনো করতো। গঙ্গার ধারে সেই স্নানের ঘাটের কাছে গেল অতনু, ওখানে পালপার্বণের দিনে তরুবালার সঙ্গে যেতো ভাস্বতী। ওখানকার সেই বহুকালের অশ্বত্থের ছায়ার নীচে গিয়ে অতনু একবার দাঁড়ালো —নগরের জনকোলাহলের বাইরে এসে এই অশ্বত্থের নীচে ক্ষণকালের জন্য দাঁড়ালে যেন অনন্ত বৈরাগ্যের ছোঁয়া লাগে। অবশেষে অতনু গিয়ে পেঁছিলো কালীঘাটের মন্দিরে। কোনো চাঞ্চল্য অতনুর চেহারায় ও আচরণে নেই।

কত মেয়ে রয়েছে আশেপাশে। তা'রা চল্‌তি হাওয়ার ক্রীড়নক। চোখে মুখে লাবণ্যের বদলে লোলুপতা, সাজসজ্জায় কদর্যের ইঙ্গিত, সর্বাঙ্গে ব্যর্থ বাসনার ধিক্কার, আসক্তি-ধ্বনিত ইতর কণ্ঠস্বর, আধুনিক পালিশে চক্‌চকে অভিনেত্রীজনোচিত মুখভঙ্গী। তা'রা একালের বলি। তা'রা চাঞ্চল্য নিয়ে ঘোরে, চটুলতা তাদের পুঁজি, হুজুগ হোলো পেশা, দ্রুতগতি চল্‌তি ফ্যাশানের ক্রীতদাসী তা'রা। অবশেষে একদিন তা'রা নৈরাশ্যে নুইয়ে পড়ে, অসন্তুষ্ট চিত্তে পরিপার্শ্বকে দংশন করে, সমগ্র জীবন জুড়ে একদিন নেমে আসে জরা ও ক্লান্তি,—বিগত যৌবনের সকল ঋণ পরিশোধ করে চোখের জলে।

ওদের মধ্যে নেই ভাস্বতী, এ জানা কথা। ভাস্বতী একালের নয়, সে সকল কালের। পঙ্ককুণ্ডের মধ্যে তা'র বাসা ছিল, কিন্তু সে ছিল সূর্যমুখী। একালের হাওয়ায় তাকে আনো, সে বেমানান। দিদিমা-ঠাকুমার কালে তা'কে দাঁড় করাও, সেখানেও মানানসই হবে না। সেকালের তাঁরা ছিলেন আচারনিষ্ঠ, আনুষ্ঠানিক, দেব-দ্বিজে ভক্তিমতী, ঐশ্বর্যশালিনী। ভাস্বতী এর কোনোটাই নয়। এ যুগে ভাস্বতীকে আনো, তা'কে চেনা কঠিন। দারিদ্র্যে সে সুন্দর, অভাবের মধ্যে পরিচ্ছন্ন। তা'কে দেখলে ভয় করে, কেন না, আধুনিকতা নিজের অর্থ হারায়; বিগত যুগ বিশ্বাস হারায়। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ভাস্বতী পড়েছিল অনেক নীচে, সে চেয়েছিল সবাইকে নিয়ে উঠবে—যতদূর পর্যন্ত উঠতে পারলে সূর্যরশ্মিকে সবাই স্পর্শ করতে পারবে; কিন্তু সে মার খেয়ে গেল দৈন্যের কাছে, বিকারের কাছে, কুরূপের কাছে। অপমৃত্যুর চক্রান্ত ভেদ ক'রে সবাইকে সে টেনে আনতে পারলো না!

সেই একদিন দুপুরে অপমানিত হয়ে এসে ভাস্বতী বলেছিল, পাড়ার

লোকের কাজ ক'রে দিই, সে কি তাদেরকে কেবল বাঁচাবার জন্যে? ওদের মৃত্যু হ'লে দুঃখের কিছু নেই, কিন্তু সেবায় ওরা স্বস্তি পায়।

অতনু বললে, যারা মরলে তোমার দুঃখবোধ হয় না, তাদের সেবা তবে প্রাণ দিয়ে করতে যাও কেন?

ভাস্বতী হাসলো। বললে, সৃষ্টি আর সংহারের চেহারা দেখে আমার ভাবান্তর হবে কেন? আমি শুধু একমনে কাজ করতে চাই। অতনু, অকর্মণ্য জীবনের একমাত্র প্রতিকার হোলো মৃত্যু—সে যেন বেঁচে না থাকে। লক্ষ লক্ষ অনাবশ্যক প্রাণ আছে, যারা নিরর্থক বাঁচে, যাদের নিয়ে অহেতুক জনতা, যাদের প্রাণধারণের কোনো কৈফিয়ৎ নেই—মৃত্যু তাদের কাছে সান্ত্বনা। মানুষ সেবায় বাঁচে না, নিজের শক্তিতে বাঁচে। রুগ্নকে বাঁচাও, বিপন্নকে বাঁচাও, কিন্তু নিরর্থক জীবনকে বাঁচাবার ভার তোমার হাতে নেই, অতনু। তোমার সমস্ত চেষ্টার বাইরে আছে একটা মস্ত নিয়ম—সেই নিয়ম থেকে আসে ঝড় বন্যা ভূমিকম্প অগ্নিকাণ্ড মহামারী যুদ্ধ মড়ক—এই সব। দারিদ্র্য উপবাস দুর্দশা চিত্তের বিকার ভয় অশ্রদ্ধা—এসব কে আনে? কে আনে অকল্যাণ পাপ কদাচার? কে আনে বিদ্বেষ হিংসা ঘৃণা? এরাই হোলো মৃত্যু,—এই মৃত্যু জীবনকে শুচিশুদ্ধ করে, সুন্দর ও মনোরম করে, এরা আছে ব'লেই নির্মল আনন্দকে বুঝতে পারি। আমি অপমানিত হয়ে এসেছি, আমার আত্মসম্মানবোধ নেই—এ তোমার মিথ্যে ধারণা, অতনু। আমি দেখতে জানি ব'লেই সইতে জানি। বুঝতে পারি ব'লেই বইতে পারি।

কী অজস্র স্নেহ ভাস্বতীর চোখে, কী দেদীপ্যমান আভা পড়েছে তা'র মুখে! অধরে মধুর আনন্দের রেখা, আয়ত চোখের নীচে রক্তিম কপোল, ললাটে শান্তশ্রী। নির্জন নিঃসঙ্গ দুপুর সেদিন মাধুর্যরসে ভ'রে উঠেছিল।

ভাস্বতী সেদিন বলেছিল, কোন্‌দিকে তাকাবে তুমি, অতনু? সম্পদের পাশে আছে লোভ আর কুশিক্ষা, আছে নোংরা মন, আর অশুচি জীবন; দারিদ্র্যের পাশে আছে অশিক্ষা আর বিদ্বেষ, জড়তা আর অসন্তোষ! কিন্তু এর সমাধান করতেই হবে তোমাকে। এই তোমার দেশ, এই হোলো দেশের হাওয়া,—এর থেকেই তোমাকে ফসল্‌ তুলতে হবে।

ঘরের এক কোণে মেঝের উপর আঁচল পেতে ভাস্বতী সেদিন শুয়ে পড়লো। হলুদ-মাখা হাত, রান্নার দাগলাগা কাপড়, চুলে তেল জোটেনি কতকাল, সাবান

জোটেনি এ জন্মে। তবু ওই ভূমিশয্যা থেকেই মুখ ফিরিয়ে ওই বিস্ময়-রূপিণী সেদিন বলেছিল, দরিদ্রের দুর্দশা মোচন করো, তা'কে বাঁচিয়ে তোলো,—কিন্তু ভিক্ষে দিয়ে দায় সেরোনা। সর্বত্যাগীর হাতে টাকা দাও, কেননা তা'র লোভ নেই; সুশিক্ষিতের হাতে ব্যবস্থা দাও, কেননা সে অবিচার করবে না; সন্ন্যাসীর হাতে শাসনের ভার দাও, কারণ তা'র মোহ নেই, আসক্তি নেই। আর যদি পারো, মহাজনতার হাতে নিজেদের ভাগ্যকে ছেড়ে দাও; তারাই তোমাকে পথ বলে দেবে!

পাশ ফিরে ভাস্বতী ঘুমিয়ে রইলো পরম নিশ্চিন্ত মনে।

ঘুরতে ঘুরতে অতনু বাড়ী ফিরে এলো সেদিন অনেক রাত্রে। অনেক হেঁটেও তা'র ক্লান্তি নেই, ভাস্বতীকে বহু খুঁজে না পেয়েও তা'র নৈরাশ্য নেই। সে যেন ফিরে এলো কোনো ফুলের বাগানে বেড়িয়ে, কোনো মন্দির প্রদক্ষিণ করে, গঙ্গার হাওয়া গায়ে লাগিয়ে।

কিন্তু দর্শনতত্ত্বের মীমাংসার জন্য অত রাত্রে আলো জেবলে হরিদাস বসে ছিল না। ছুটে এসে দরজা খুলে সামনে দাঁড়িয়ে বললে, বাবু—?

অতনু বললে, বাকী কথাটা আমিই শেষ করে দিই,—তোর দিদিকে আপাতত খুঁজে পাওয়া যায়নি!

তাহ'লে কি উপায়, বাবু?

যাদের বাড়ীর মেয়ে, তারা উপায় করুক গে? আমরা মাথা ঘামাই কেন?

ডাক্তারের এবংবিধ বৈরাগ্য দেখে হরিদাস একেবারে পাথর হয়ে গেল।

ধীরে সুস্থে অতনু জামা-কাপড় ছাড়লো, তারপর মুখ হাত পা ধুয়ে আহারাদির জন্য প্রস্তুত হয়ে বললে, এ-ক'দিন নানা গণ্ডগোলে কাজকর্ম কিছু হয়নি, বুঝলি? অন্তুর জন্যে ভালো একজন মাস্টার ঠিক করতে হবে। তুই ভাবিসনে হরিদাস, কাল থেকে আমি চেম্বারে গিয়ে বসবো। পাওনাদারদের টাকাকড়ি এবার সব মিটিয়ে দিতে হবে, অনেক জ'মে গেছে না রে?

হরিদাস গম্ভীর মুখে বললে, কারুর কিছু পাওনা নেই!

নেই, অমনি বললেই হলো? ধোবার বাড়ীর হিসেব করেছিস? পরের টাকা মারতে তোর ভারি মজা লাগে, না?

ওসব হিসেবপত্র দিদি রাখতেন। তিনি সব মিটিয়ে দিয়ে গেছেন।

অতনু খেতে বসে বললে, দিদি রাখতেন! দিদি টাকা পেতেন কোথায়?

পরের টাকার ওপর মেয়েমানুষের দালালি তুই সহ্য করিস? দিদি তোর কাছে কত কমিশন পেতো? এইজন্যেই আমার টাকাকড়ির এত টানাটানি!

হরিদাস অস্থির হয়ে বললে, বাবু এ সব কথা মুখেও আনতে নেই!

অতনু মুখ তুলে বললে, অর্থাৎ তোরা এতই বিশ্বাসী লোক, এই ত? তুই চাকরি ছেড়ে দিবি কবে?

হরিদাস ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, আমার পোড়াকপাল, তাই কোথাও আমার জায়গা হয়নি। পঞ্চাশ বছর আগে আপনার ঠাকুরদাদাকে বলেছিলুম, এ চাকরি আমার চলবে না। কিন্তু ছাড়তে পেরেছি কি?

রাগে ঠকঠক করে হরিদাস চক্ষের আড়ালে চলে গেল।

*

*   *

কথক ঠাকুরের আসর বসেছিল রায়দের আমবাগানে। সামনেই গঙ্গা, হু হু করে হাওয়া বইছে। রায়রা হোলো বনেদী বংশ, সুতরাং মামলা-মোকদ্দমায় এখনও স্থির হয়নি, এ আমবাগান কাদের ভাগে পড়বে। বাগানের ধারেই কয়েকটি চালাঘর, মাঝখানে আটচালা বাঁধা। কার্তিক মাসের শেষ দিকটায় এ বাগান প্রতি বছরেই সরগরম হয়ে ওঠে। অনেক দূর থেকে মেয়েপুরুষরা এখানে এসে হাজির হয়। বাগানের পূব দিকটায় অনেক কাল আগেকার লোকনাথের মন্দির আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভগ্ন মন্দির, বটের শিকড় উঠছে এখানে ওখানে, চারা গজিয়ে উঠেছে নানা জায়গায়। আজকাল শীতের হাওয়া দিয়েছে।

মাঝখানে বসে ছিলেন কথক ঠাকুর। বহু মেয়েপুরুষ বসে গিয়েছে চক্রাকারে। রোদ উঠেছে মধুর হয়ে, কিন্তু বড় বড় আমগাছের ছায়া নেমেছে। সকালের আসর ভাঙতে আর দেরি নেই।

চন্দনের তিলক, পরনে থানধুতি, গায়ে মোটা উত্তরীয়—হাসিমুখে কথক ঠাকুর বললেন, ওই দেখো, সন্দেহটাও সত্য, আবার বিশ্বাসও সত্য—এই নিয়েই ত' মানুষের মন। বোঝো বুদ্ধি দিয়ে। যদি বলো তিনি নেই, তবে কোথাও কিছু নেই, সব ধোঁয়া। ডুব দিয়ে নীচে নামো মনের মধ্যে, সব অন্ধকার! অন্ধকারেই শুধু হাতড়ে মরো, আলো খুঁজে পাবে না!

আলো কি কোথাও নেই, ঠাকুর?—কে যেন প্রশ্ন করে বসলো।

আছে বৈ কি, মা—কথক জবাব দিলেন, বিশ্বাসই হোলো সেই আলো। ওটা হাতে নিয়ে যত অন্ধকারেই নামো, পথ ঠিক খুঁজে পাবে। খোঁজো, যত পারো খোঁজো। প্রতি মুখে প্রতি চোখে খোঁজো। পথে পথে খোঁজো, প্রতি ধূলিকণায় খোঁজো।

একটি মেয়ে মাঝখানে একবার টেক্কা দিয়ে বললে, ঠাকুরমশাই, সে কেমন খোঁজা?

ওই দ্যাখো আবার, সংশয় থেকে কৌতূহল! ওটা যে বিশ্বাসের গোড়ার কথা, মা! পুণ্যের মধ্যে তিনি থাকেন, পাপের মধ্যেও যে তাঁর বাসা গো! দারিদ্র্যের মধ্যে খোঁজো, পাবে তাঁকে, তাঁকে পাবে নোংরায় নর্দমায় অজ্ঞানে—ঠিক বিশ্বাসটি নিয়ে দেখো, ওদের মধ্যেও যদি তাঁকে না পেলুম, তবে তাঁর মহিমা কোথায়? তিনি যে সর্বাশ্রয়ী!

বুঝতে পারলুম না, ঠাকুর!

কথক হাসলেন। বললেন, বুদ্ধির পেছনে জ্ঞান, যেমন রাজার পেছনে থাকেন ব্রাহ্মণ—কেমন? বিশ্বাস থেকেই সত্যের উপলব্ধি, তাই থেকেই জ্ঞানের জন্ম। তিনটি বস্তু নিয়ে বাঙলা দেশ—বুঝেছ? শৈব, শাক্ত আর বৈষ্ণব—এদের মধ্যে আবার নানা শাখাপ্রশাখা—তা হোক। এই তিনটি হোলো কল্যাণ, শক্তি আর প্রেম। একটিকে বাদ দিলেই কিন্তু সব লণ্ডভণ্ড। এই তিন নিয়ে জাত, তিন নিয়ে সমাজ।

প্রশ্নকর্তা চুপ করে গেল। মেয়েদের মধ্যে কিছু একটা কথা নিয়ে কানাকানি চলছে। একজন চাপা কণ্ঠে বললে, আঃ তুই থাম না! সব কথায় ফোড়ন দিতে যাস,—তোর বুঝি তিলুনি বেশী?

মেয়েটি বললে, আসল কথাটা যে এখনও শুনতে পাইনি মা?

কী এমন আসল কথা তোর?

হাসিমুখে মেয়েটি বললে, তা আমি জানবো কেমন করে? প্রশ্ন থাকবে আমার মনে, জবাব থাকবে ওঁর মুখে,—তবেই ত যোগাযোগ! রাগ ক'রো না, মা—আমি অজ্ঞান!

তবে চুপ মেরে থাক্।—একটি স্ত্রীলোক মুখ ফিরিয়ে নিল।

কথক আবার আরম্ভ করলেন। বললেন, হ্যাঁ, ওই যা বলছিলুম—চাইতে হবে তাঁকে,—বিশ্বাস নিয়ে চাইতে হবে! কাদা মাখো, কি চন্দন মাখো, নীচে নামো, কি ওপরে ওঠো, নোংরা ঘাঁটো, কি মালা গাঁথো—কোনো ক্ষতি নেই! চাইলে পাবে,—প্রেমের মধ্যে পাবে, কামেও পাবে; সম্মানে পাবে, অপমানেও পাবে!

আবার প্রশ্ন ছুটে এলো, কেমন করে তাঁকে দেখবো, ঠাকুর?

তুমি দেখবে কেন গো? চোখ তোমার, দেখছেন তিনি। তিনিই তোমার প্রাণ, তিনিই তোমার আমি! তুমি আলাদা নও গো। তুমি সাধনায় বসেছ একথা ভুল, তিনিই ধ্যানস্থ তোমার মধ্যে! তোমার ভিতরে তাঁর সিদ্ধি, তোমাকে দিয়েই তাঁর প্রকাশ।

মেয়েটি শান্ত চক্ষে তাকালো কথকের দিকে। শ্রোতারা অভিভূত হয়ে শুনছিল। কেউ কেউ বা দূর থেকে প্রণাম জানালো।

কথক বললেন, ইচ্ছার জোর চাই। ইচ্ছা থেকেই পাওয়া, ইচ্ছা থেকেই দেখা। অন্তরে আছেন তিনি, ইচ্ছা দিয়ে দেখো। আকাশে বাতাসে দেখো, দেখো ওই গঙ্গার জলে, দেখো ধানের মাঠে, দেখো মরুভূমির বালুতে। তিনি বাসা নিয়েছেন তোমার ইচ্ছায়। ইচ্ছাময় তিনি! মেয়েপুরুষে গিয়ে এক বিছানায় শোও, তিনি আছেন তোমাদের বাসনায়, তোমাদের রসনায়। তোমরা হলে যন্ত্র, তাঁর হোলো নির্দেশ। আনন্দটা তোমাদের, একথা ভুল। তিনিই আনন্দ, তোমরা উপকরণ। তোমরা হলে বাঁশী, বাজাচ্ছেন তিনি। শিশু জন্মালো মায়ের কোলে, কিন্তু বাৎসল্য কে দিলে? বুক থেকে নামলো রস, কিন্তু তার স্বাদে মিষ্টি দিলে কে? তরুণী দূর থেকে হানলো কটাক্ষ, আমার মনে চাঞ্চল্য ছোঁয়ালো কে? বীজ পুঁতলে আম ফললো, মাধুর্যটা এলো কোত্থেকে? বলো না গো মেয়ে, জবাবটা দাও? ফুলে কেন সুগন্ধ এলো? বিজ্ঞান কি বলে? পাখী ডেকে উঠলো,—আমার কানে মধু ঢাললো কে? দক্ষিণ হাওয়ায় গানের সুর কে ভাসালো? শোনো গো মেয়ে,—জন্ম সত্য, মৃত্যু সত্য, তবে মাঝখানের এই জীবনটা মিথ্যে হবে কেন? এটা যে আসন, তিনি বসে আছেন এর ওপর। এত রূপ এত রস এত সুগন্ধ এত মধুর অনুরাগ, এমন সাজানো বাগান,—এ জীবনটাকে মিথ্যে বলবো, তবে সত্য কোন্‌টা? এই সত্যকে ধরে আছি, তবেই ত দর্শন, তবেই ত বিশ্বাস—তবেই

ক তাঁকে পাওয়া গো। তোমাকে কাঁদাচ্ছে কে, কে হাসাচ্ছে, কে বা আনন্দে তোমাকে দোলাচ্ছে!

তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন এলো, আঁস্তাকুড়ে বসে পাগলে নোংরা ঘেঁটে আহ্লাদে আটখানা,—সেও কি আনন্দময়ের আনন্দ, ঠাকুর?

ওই দ্যাখো—কথক বললেন, আবার সেই বুদ্ধির বিভ্রম! অজ্ঞানের সঙ্গে আহ্লাদের যোগে হয় মাতামাতি, তখন আর সেটা আনন্দ থাকে না! মহা-পুরুষরা সর্বাঙ্গে ছাই মেখে ধুলোয় গড়াগড়ি দেয় কেন? নেংটি পরে রাজবেশের আনন্দ পায় কোত্থেকে? কী পেয়েছে সে বলো দেখি?

সেই অধীর অস্থির মেয়েটি আবার চুপ করে গেল। মেয়েপুরুষ শ্রোতারা যেন নিজেদের প্রশ্নোত্তর পেয়ে যাচ্ছে। কথক আবার বললেন, রাগ করো না বাছা, প্রশ্নই হোলো কৌতূহল, ওটাই বিশ্বাসের গোড়া! বিশ্বাস করো, তবেই সত্যটা সহজ, না করো—চারদিকে নিরানন্দ! মুক্তি যদি মনে না থাকে, তবে সমস্ত শূন্যলোকে ঘুরে বেড়ালেও মুক্তি নেই, মা।

পৃথিবীতে তবে এত কান্না কেন, ঠাকুর?

ওমা, তা হবে না? কান্নাটা যে পৃথিবীর, হাসিই হোলো স্বর্গ। আগে কাঁদো, তারপর হেসো। হাসি যেখানে নির্মল, তিনি সেইখানে।

হাসি কেমন করে নির্মল হবে, বাবা?

হবে মা হবে! জ্ঞান হবে শুচি, তবেই নির্মলতা! গঙ্গা হোলো পূত পবিত্র, কিন্তু সব চেয়ে নোংরা ওখানেই পড়ে। তবে কেন গঙ্গার জল মাথায় ছুঁয়ে বলে, পতিতপাবনী, কলুষহারিণী? শুদ্ধ মনে নোংরা দাঁড়ায় না, ভেসে চলে যায়! পাঁচজন স্বামী নিয়ে ছিলেন দ্রৌপদী, তাঁকে কি বলবে কলঙ্কিনী? কোন্ প্রাণে বলবে? তাঁর অন্তর্যামী হলেন স্বয়ং বাসুদেব! তাই তাঁর নাম ছিল কৃষ্ণা, কৃষ্ণময় তিনি, তিনি কৃষ্ণবতী, কৃষ্ণভাবিনী!

এবেলার মতো আসর ভাঙলো, আবার সেই সন্ধ্যায়। কথক ঠাকুর উঠে পড়লেন, তাঁর সেই সৌম্যমূর্তির কাছে গিয়ে প্রণাম জানালো অভ্যাগতের দল। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে বহু ভদ্রলোক ও মহিলারাও এসেছেন। মন্দিরে ভোগ প্রস্তুত হয়েছে, বহুলোক প্রসাদ পাবে। এখানকার আশ্রমের যারা কর্মী, তারাও ছিল ওই আসরে। সামনের শুক্রবার মেলা। সেদিন বোধ করি পূর্ণিমা।

কিন্তু যে-দুঃসাহসিকা মেয়েটি এতক্ষণ ধরে এতগুলি নরনারীর মাঝখানে বসে নানা জটিল প্রশ্ন করে যাচ্ছিল, তাকে ঘিরে দাঁড়ালো বহু মেয়েপুরুষ। মেয়েটি সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী, কিন্তু তার সর্বাঙ্গে গঙ্গামাটির দাগ লাগা, কাপড়খানা অতি মলিন। একরাশি চুল, কিন্তু গঙ্গায় ডুবে ডুবে চুলগুলি যেমনই বিবর্ণ, তেমনই রুক্ষ। আগে মনে হয়েছিল মেয়েটি বুঝি একটু বাচাল, একটু উদ্ধত—কিন্তু সেটা ভুল। চোখমুখ যেন কেমন কমনীয় কারুণ্যে ভরা, অথচ শান্ত মধুর শ্রী। মুখখানি যেন হাসি-হাসি। মেয়েদের মধ্যে মেয়ে বটে।

একজন মহিলা প্রশ্ন করলেন, তুমি কি আশ্রমে থাকো?

না, মা, এখানে জায়গা কোথায়? ওই মন্দিরে প'ড়ে থাকি। আমি আশ্রমের মেয়ে নই, মা।

মেয়েটা নিরাভরণা, সর্বাঙ্গে যেন দারিদ্র্য, আপাদমস্তক মালিন্যভরা,—তবু অতি সুন্দর, তবু যেন তা'র দুই চোখে নিমীলিত তপস্যার ছায়া। তপোবন-বাসিনী!

তোমার বাড়ী কোথায়, ভাই?

বাড়ী?—মেয়েটি হাসলো,—যেখানে যখন থাকি!

এখানে কি কাজ করো?

আবার সে হাসলো। বললে, কাজ নয়, আমি সেবা ক'রে খুশী। সেবা যেখানে করি, সেখানেই ত' আমার জায়গা!

তোমার নাম কি, ভাই?

আমার নাম দাসী!

একজন প্রশ্ন করলো, তুমি বামুন, না বোষ্টম?

দাসীর কি কোনো জাত আছে?

একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ভিড়ের ভিতর থেকে এগিয়ে এলেন। বললেন, তুমি কি ভিক্ষে নাও?

লোকটির দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে সহাস্যে দাসী বললে, যেখানে দেবার অভিমান, সেখানে ভিক্ষে সার্থক নয়, বাবা! আমার অনেক আছে, অভাব কিছু নেই!

ভদ্রলোক আড়ষ্ট হয়ে তাঁ'র দিকে তাকালো। ভিক্ষার হাত উঠলো না।

একজন বর্ষীয়সী মহিলা প্রশ্ন করলেন, তুমি এত কথা কথক ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছিলে কেন, মা?

দাসী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, ওমা, তা করবো না? ওগুলো যে আমার জীবন-মরণ সমস্যা! আমার সব কথার জবাব চাই, জবাব না পেলে আমার সুখ নেই, আমার শান্তি নেই।

আহা,—আরেকজন বললে, সংসার করতে গিয়ে বুঝি অনেক দুঃখ পেয়ে এসেছ, মা?

দুঃখ!—দাসী একবার থাকলো। বললে, দুঃখ কিসের? দুঃখ পেলে সুখ চাইতুম! দুঃখ কেন পাবো, মা?

সংসার কি তুমি করোনি, বাছা?

করেছি বৈ কি। সে আমার প্রাণের সংসার মা! আনন্দের সংসার!

তবে কেন বেরিয়ে এলে, মা?

দাসী হাসিমুখে বললে, বাইরের থেকে যে ডাক পড়লো! আরো আনন্দ যে আমাকে পেতে হবে, আরো যে চাই! যা না পেলেও চলে, এ রাক্ষুসীর তাও যে চাই, মা! সুখ আমার সইলো না।

কথক ঠাকুর চ'লে গেছেন, জনতাও স'রে গেছে তাঁর সঙ্গে। দাসীকে ঘিরে যারা ছিল, তারাও যে যার চ'লে গেল। মন্দিরে প্রসাদ-বিতরণ হবে, সেখানে নানা লোকে গিয়ে ভিড় করেছে। শাঁখ ঘণ্টা বেজে উঠেছে, লোকনাথের পূজারম্ভ হয়েছে। দাসী ওদের ছেড়ে চ'লে গেল আপন মনে আটচালা পেরিয়ে চালাঘরের দিকে।

ওর কাজ অনেক। ওকে নইলে আশ্রমিকাদের চলে না। ওর সঙ্গে এখানকার কা'রো পরিচয় নেই, কিন্তু ও না থাকলে কাজকর্ম সবই লণ্ডভণ্ড। কোনো দল এসেছে হাওড়া থেকে, কোনো দল কেষ্টনগরের, কোনো দলটা জয়-নগরের। কাশীপুর থেকে এসেছে কীর্তনীয়ারা, গোঁসাইগঞ্জের বাজনদার—আরো কত দেশের লোক। এক এক দল নিয়েছে এক একখানা চালাঘর, কত কাজ এক এক দলের। আশ্রমিকারা আছে সকলের তত্ত্বাবধানে। দাসী আছে সকলের সঙ্গে। চারদিকে নানা সোরগোল, নানা দলের মধ্যে নানা প্রাণের দলের মধ্যে নানা প্রাণের যোগ,—ওদের সকলের মধ্যে দাসী একা, সমস্ত জনতার মধ্যে সে নিঃসঙ্গ।

এঁটো-কাঁটা তুলে দে না, মা। দাওয়ায় যে চলাফেরা করা যাচ্ছে না!

এই যে মা দিচ্ছি—দাসী অমনি কোমর বাঁধলো। কলাপাতায় খেয়ে গেছে কত লোক, কত নোংরা জঞ্জাল জমেছে এখানে ওখানে। দাসী তু'লে নিল এক একখানি ক'রে। কুয়া থেকে জল তুলে দাওয়া নিকিয়ে দিল। কলস ভ'রে খাবার জল আনলো। ভিজা কাপড় মেলে দিল বাইরে। গামছাগুলি শুকোতে দিয়ে এলো। জুতোগুলি আঁচল দিয়ে মুছে সযত্নে গুছিয়ে রাখলো। কা'রো তেলসেবা হবে, কা'রো স্নানের জল চাই, কা'রো পান খাওয়ার অভ্যাস, কেউ তামাক সেজে আনতে বলে, কা'রো বা কাপড়কাচা বাকী—দাসী অমনি উন্মুখ হয়ে আছে। কাজ করে সে, কিন্তু কাজ মানেই সেবা। প্রশ্ন থাক্ তার মনে মনে, সেবা থাক্ তা'র দুই করতলে।

ওরা প্রশ্ন ক'রে, তুই কা'র সঙ্গে এসেছিস লা, কাদের ঝি তুই?

আমি?—দাসী জবাব দেয়, আমি সকলের ঝি!

মরদ নেই তোর?

আছে বৈ কি?—দাসী হাসিমুখে বলে, কত আছে চারদিকে, তাকেই ত' খুঁজছি, মা। সহজে পাবো, সেবা করলেই পাবো—এই ত' ঠাকুরের আদেশ। আমাকে ছেড়ে থাকবে কেন সে?

বনহুগলীর মেয়ে সন্দিগ্ধকণ্ঠে বলে, ঘর ভাসিয়ে এসেছিস বুঝি?

ওমা, তা কেন? ছোট ঘর থেকে এলুম বড় ঘরে। অঙ্গন থেকে প্রাঙ্গণে। সাগর থেকে মহাসাগরে। এখানেই ত' শান্তি!

বাঁকা চোখে তার স্বাস্থ্যের বাঁধুনির দিকে চেয়ে আরেকটি মেয়ে বললে, বরাত খুললে সুখেই থাকবি! তোর আর ভাবনা কি? এখানে থাকিস কোথায়?

দাসী এক গাল হাসলো। ঢিপ ক'রে সেই কদাকার কুরূপা স্ত্রীলোকটির পায়ের কাছে প্রণাম ক'রে বললে, এই ত' হোলো আসল জায়গা,—তোমাদের পায়ের তলাতেই বাসা নিয়েছি, মা! সবাই মাড়িয়ে যাবে, তবেই ত' আমি সার্থক।

বেশ কথা বলিস ত' ভাই?

দাসী মুখ তুলে বললে, না না, ঠাকুর বলছেন আমার মুখ দিয়ে। তাঁরই প্রশ্ন, তাঁরই উত্তর।

সকৌতুকে সেই মেয়েটি বললে, কা'দের দলে খা'স?

দাসী আবার হাসলো। বললে, সকলের পাত কুড়িয়ে খাই, মা। সেই আমার ঠাকুরের প্রসাদ।

দাসী চ'লে গেল অন্যদিকে। তাকে নিয়ে জ'মে ওঠে উৎসুক কৌতূহল, দেখতে দেখতেই আশপাশে লোক জ'মে যায়। সুতরাং কোথাও তাকে স্থির থাকতে দেয় না। এখান থেকে ওখানে, এঘর থেকে ওঘরে। কাজ করে মুখ বুজে, মনের আনন্দে। কাজও নয়, সেবাও নয়, উৎসর্গ করে নিজেকে। নিজেকে ফুরিয়ে ফতুর করে।

সব কাজ সেরে সোজা গঙ্গায়। মধ্যাহ্ন কখন্ গেছে পেরিয়ে। উদাসিনী ভৈরবী গঙ্গায় যেন বুগ বুগ করে জলের তাড়া। কী মন্ত্র জপ করছে অগাধ জলের নীচে? কে আছে সেখানে নিগূঢ়রহস্য পাথারে? জীবনও কি ঠিক এই নয়? উপর দিয়ে চলেছে প্রবহমান কাল, আর তা'র অতলতলে ব'সে রয়েছে জীবনের নিয়ন্তা?

দাসী স্নান করলো। কত ডুব দিল সে! ডুব দিয়ে সে যাক না কেন অনেক নীচে? দেখে আসুক না কেন, কেউ কখনও যা দেখেনি? ডুব দিয়ে সে হাসলো আপন মনে।

হাওড়ার দলের চোখ পড়েছিল তা'র দিকে সকাল থেকে। তারাও ঘাটে নেমেছিল। তাদের মধ্যে তাঁতী-বৌ এতক্ষণ ধ'রে দাসীর বেপরোয়া স্নান দেখছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এবার বললে, নেয় উঠে ছাড়বি কি,—কাপড় এনেছিস?

দাসীর সঙ্গে ওদের একটু পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে এই ক'দিনে। হাসিমুখে দাসী বললে, ভিজে কাপড়ে থাকবো। গা জড়িয়ে থাকবে গঙ্গা!

ওমা, কথার খৈ ফুটছে। ভিজে কাপড়ে থাকবি, ওই চেহারা নিয়ে মুখ দেখাবি কেমন ক'রে? আয়না ধ'রে দেখগে, সর্বনেশে চেহারা!

দাসী বললে, চেহারা ত' নয় মা, এ হোলো চামড়া! কারো চামড়া দুঃখু পেয়ে শুকোয়, কারো বা মুক্তির আনন্দে নাচতে থাকে। এ মন্দিরের ঠাকুর যদি আসন ছেড়ে চ'লে যান, তবে শেয়াল-শকুনি এই চামড়া নিয়ে টানাটানি করবে, মা।

মেয়ে মাত্রই জননী, পুরুষ মাত্রই পিতা,—সম্ভাষণে দাসী ভুল করেনি।

পিতামাতাকে ও-মেয়ে সর্বত্র খুঁজে পেয়েছে, পথে পথে তা'রা ছড়ানো। তাঁতী-বৌ তা'র দিকে একবার স্নেহের দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর কি মনে ক'রে বললে, যাবি আমাদের গাঁয়ে? আবার এখানে ফিরবো পূর্ণিমের মেলায়।

দাসী তৎক্ষণাৎ বললে, যাবো। এক্ষুনি যাবো, মা।

এখানে তোর পিছটান নেই?

কিচ্ছু না! আমি যে গঙ্গা, পথ পেলেই বাধা পেরিয়ে বয়ে যাবো। ওমা, যাবার জন্যেই ত' ব'সে আছি।

তবে এই নে, কাপড় ছাড়্—তাঁতী-বৌ তাঁর পুঁটুলী খুলে একখানা পরিষ্কার কাশীপেড়ে শাড়ী বে'র করে দিল। কিন্তু শাড়ীখানা পেয়ে দাসী চুপ করে গেল, একটা সৌজন্যও প্রকাশ করলো না। নিজের মনে ভিজা কাপড় ছেড়ে নতুন শাড়ী জড়িয়ে হাসিমুখে বললে, চলো মা!

যেন আবার নতুন মেয়ে। সমস্ত মালিন্য ধুয়ে মুছে গেছে! তাঁতী-বৌর দলবল সবাই ঘাটের কাছে জড়ো হ'য়ে তারপর বললে, চলো, এগোও।

দাসী চললো পিছনে পিছনে। বাগান পেরিয়ে আখড়াটা ছাড়িয়ে চললো গঙ্গার ধারে ধারে। এবার চললো নিরুদ্দেশে। সেখান থেকে যদি নতুন সঙ্গী জোটে, আবার যাবে নতুন দেশে।

সহসা পিছন থেকে পরিচিত নামের ডাক এলো, চীনু—?

দাসী আচমকা দাঁড়িয়ে পড়লো। অতনু তাকে হাসিমুখে ডাকছে। ভাস্বতী সহাস্যে বললে, তুমি? বেশ যা হোক, তুমি আবার এলে কোত্থেকে? এ ঠাকুরতলা তুমিই ত' চিনিয়েছিলে? ঠাকুর বুঝি তোমাকে স্থির থাকতে দিলেন না?

অতনু বললে, সকাল থেকে দেখছিলুম তোমাকে দূরে দাঁড়িয়ে। এখন চললে কোথায়? ফিরতে বুঝি আর ইচ্ছে নেই?

ওদের সঙ্গে যাচ্ছি যে! আবার ফিরে আসবো পূর্ণিমায়। কিন্তু তুমি আবার কেন এলে, ডাক্তার? সব হিসেব ত' বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি!

অতনু বললে, কোনো দাবি নিয়ে আসিনি, চীনু। আমি জানতুম, নিজেই তুমি ফিরবে। সেই আমার ভুল হয়েছিল! আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছিলুম।

নিয়ে যেতে? কোথায়?—ভাস্বতী এক গাল হাসি হাসলো। তারপর

বললে, পথ ছাড়ো, বেলাবেলি গিয়ে পেঁছিবো। আবার তুমি পথ ভোলাতে এলে কেন, ডাক্তার? মন থেকে বুঝি এখনো তাড়াতে পারোনি?

দূর থেকে তাঁতী-বৌ ডাকলো, মরণ দশা! পিছিয়ে পড়লি যে?

এই যাই মা—ভাস্বতী ছুটতে ছুটতে গিয়ে সঙ্গিনীদের ধরলো।

তাঁতী-বৌ প্রশ্ন করলো, কে লা, চেনা লোক বুঝি?

চেনা লোক!—ভাস্বতী হাসলো, কা'কেই বা চিনি বলো, মা? চলো যাই—

ভাস্বতী পিছন ফিরলো না, কিন্তু পিছনে রইলো প্রসন্ন শান্ত দুটো নিরুদ্বেগ চক্ষু।

দশ

প্রত্যেকদিনের মতোই অতনু বাড়ী ফিরে এলো। প্রতিদিন আসে সে প্রসন্ন মুখে, ক্লান্তির কোনো রেখাই থাকে না। হারাবার ভয় থাকলে উদ্বেগ থাকতো, থাকতো নৈরাশ্য, থাকতো বিরক্তি। সারাদিন ধ'রে আজ অতনু দেখে এলো ভাস্বতীকে, কিন্তু তা'র লক্ষ্যপথে অতনু পড়েনি। চোখের তারা তা'র চঞ্চল নয়, তাই অতনু দৃশ্যমান হয়নি। সেই দৃষ্টি নিজের মধ্যেই তলিয়ে রয়েছে, সেই কারণে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ভাস্বতী বাসা নিয়েছে জনতার ভিড়ে আর কোলাহলে, সেখানে নিঃসঙ্গ হওয়া সহজ, আত্মবিলুপ্তি ঘটানোয় বাধা নেই। ভিক্ষা করবে না সে, কারণ ভিক্ষায় তার শ্রদ্ধা নেই। হাত বাড়িয়ে নেবে না কিছু, ওটা মনুষ্যত্ববিরোধী। কাজ করবে, যেটার নাম সেবা। সবাই যখন মন্দিরে পূজার সামনে দাঁড়িয়ে, ভাস্বতী তখন আনন্দ পাচ্ছে দাসী-বৃত্তির মধ্যে—কেননা, ওটার মধ্যে আছে মানুষের পূজা। দেবতা হোলো মানুষেরই পরিকল্পনা—যাকে বলে দৈবভাব,—সুতরাং মানুষ অনেক বড়। মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিকেই দেবত্ব বলে, ভাস্বতী এই ধারণা নিয়ে চলে।

অতনু কেন তা'কে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিল? কোথায় এসে থাকতো ভাস্বতী? কেনই বা সে থাকবে? অতনুর কি এই অভিমান আজও রয়েছে, ভাস্বতীর সর্বপ্রকার দায়িত্ব সে নেবে? কিসের দায়িত্ব? অন্নবস্ত্র আর আশ্রয়ের? এ ত' হরিদাসের স্তরের মনোবৃত্তি! ঘরকন্নার বাইরে সংসার

আছে, অন্নবস্ত্র অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দারিদ্র্য—তা'র বাইরেও কোনো কোনো মানুষের ক্ষুধাপিপাসা আছে, সমস্ত সম্ভোগ-সম্পদের ভিতরে থেকেও কারো কারো বহির্ব্যাকুলতা আছে—এই সত্য কে না জানে! ভাস্বতী ফিরে এসে দাঁড়াতো কিসের ওপরে? পরিচয় কি হোতো তা'র? কৈফিয়ৎ কি দিত নিজের? এই কথাই কি অতনু ভেবেছিল, মৃগেন্দ্রের ওখান থেকে বিতাড়িত হয়ে এই বাড়ীতেই ভাস্বতীর ছিল একমাত্র আশ্রয়? না, এ ভুল অতনু কোনো-দিন করেনি! ভাস্বতীর প্রথম তারুণ্য থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত অতনু তা'কে দেখে এলো। অসম্পৃক্ত নরনারীর মধ্যে এমন নিরাসক্ত ঘনিষ্ঠতা কেউ কি দেখেছে কখনো? দুইজনে এক, কিন্তু দুইটি বিচ্ছেদ। পৃথিবী আর আকাশ—দুই মিলেছে দিগন্ত-রেখায়, কিন্তু মিলন কোথায়? শুধু চেয়ে থাকা—উভয়ের অনন্ত রহস্যের শুধু দৃষ্টিবিনিময়! তারপর একদিন তারুণ্য এসে পেঁছিলো পরিপূর্ণ যৌবনকালে। কিন্তু এপারে ছিল না অধীরতা, ওপারেও ছিল না মদিরতা। একজন আরেকজনকে দেখলেই হেসে উঠতো,— ভরা যৌবনের হাসি, কিন্তু সেই হাসিতে বাসনার দাগ খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল বৈকি।

হরিদাস নিত্য দিনের মতো চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালো। অতনু আজ জামাকাপড় ছাড়েনি, এটা কিছু নতুন। হরিদাস বললে, চা খেয়ে কি আবার বেরোবেন, বাবু?

না রে।

আপনি কি আর খোঁজাখুঁজি করেছিলেন?

অতনু বললে, আমি ত' বেড়াতে যাই, খুঁজতে যাই কবে?

হরিদাস যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। অনেকটা বিস্ময়ে, অনেকটা জটিলতায়। কিন্তু তা'র সকল কথা জানবার দাবি আছে বৈ কি। একটু অসহিষ্ণুকণ্ঠে সে বললে, আপনি কি তবে রোজ বেড়াতেই যেতেন? একবারও তাঁর খোঁজ করেননি?

অতনু বললে, ভারি বুদ্ধি তোর! তুই শুধু ছটফট করেছিস, আমি কি ছুটোছুটি করেছি? কেনই বা করবো পরের মেয়ের জন্যে?

তবে কি দিদির আর দেখা পাবো না?—কেঁদে উঠলো হরিদাস।

কেন পাবিনে? তিনি কি হারাবার মেয়ে, না পালাবার মানুষ?

বাবু—গলা পরিষ্কার ক'রে হরিদাস বললে, তবে তিনি কোথায়?

অতনু বললে, তাঁর যেখানে জায়গা, সেখানেই আছেন।

আপনি কি দেখেছেন?

অতনু এবার না হেসে থাকতে পারলো না। বললে, সাতদিন ধ'রেই ত' দেখছি তাঁকে। আজ শুধু কথা বললুম।

কথা বললেন, অথচ নিয়ে এলেন না, বাবু?

হঠাৎ অতনু চ'টে উঠলো। বললে, বেমক্কা কথা বলিসনে তুই, হরিদাস। নিজের বাড়ীতে যদি তা'র জায়গা না থাকে, আমি তা'কে আনবো কোথায়? কেনই বা আনবো? সেই বা আসবে কেন?

হরিদাস চুপ্ ক'রে গেল। কিন্তু তা'র নারীজনোচিত স্নেহ-কৌতূহল চুপ ক'রে রইলো না। পুনরায় বললে, বাবু, কেমন আছেন তিনি? কোথায় আছেন? কেমন ক'রে তাঁর চলছে? একলা আছেন কি? নিশ্চয় কেঁদে কেঁদেই তাঁর দিন কাটছে?

অতনু বললে, তাঁর চোখের জল দেখেছিস কখনো যে, তিনি ব'সে ব'সে কাঁদবেন? আসল জায়গায় খুঁটি শক্ত থাকলে মেয়েমানুষ কখনো কেঁদে ভাসায়?

হরিদাস শুধু ব্যাকুল হয়ে বললে, আমাকে একবার সেখানে নিয়ে চলুন বাবু, আমি গিয়ে তাঁর দুই পা জড়িয়ে ধরবো!

পা-জড়িয়ে ধরবার সময় পাচ্ছিস কখন্?—অতনু হাসিমুখে বললে, তিনি নেচে-নেচে বেড়াচ্ছেন এখানে ওখানে! তাঁর নাচ দেখলে বুক কাঁপে! এখন তিনি ক্ষান্ত হ'লেই আমরা শান্ত হই!

অতনু উঠে জামাকাপড় বদলাতে লাগলো। তামাসা হরিদাস বোঝে, কিন্তু জীবনমরণ-সমস্যা নিয়ে যখনই কথা ওঠে, বাবু তখন সেটাকে লঘু পরিহাসে হাল্কা ক'রে দেন। অসহিষ্ণু হরিদাস ক্ষুব্ধ মনে সেখান থেকে চ'লে গেল। সোজা গিয়ে উঠলো ভাঁড়ার ঘরে। ভাস্বতীর সেই ঠাকুরটির কাছে কবার মাথা ঠুকলো, তারপর সেখান থেকে গেল নিজের ঘরে। কুলুঙ্গীতে ছিল কাপড়-জড়ানো রামায়ণ। সেই রামায়ণখানা খুলে সীতাদেবীর ছবিখানি বা'র করলো এবং ছবিসুদ্ধ বইখানি তুলে পরম ভক্তি সহকারে নিজের মাথা ঠেকালো। তারপর বইখানি আবার গুছিয়ে তুলে রেখে সে গেল অন্তুর পড়ার ঘরে। মাস্টার

মশাই তখন অন্তুকে অঙ্ক কষাচ্ছিলেন। হরিদাস গিয়ে তা'র রামায়ণছোঁয়া দুখানা হাত সস্নেহে অন্তুর মাথায় বুলিয়ে আবার বাইরে এলো। তারপর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছলো।

আহারাদি সেরে রাশীকৃত বই-কাগজ সামনে নিয়ে অতনু ব'সে ছিল বহুক্ষণ থেকে। পাঠ্যবস্তু পড়বার সময় নেই অতনুর, অ-পাঠ্য রচনাগুলিতে সে চিরকাল আনন্দ পেয়ে এসেছে। তবু ওদের বাইরে তা'র জীবনের নিজস্ব ব্যাখ্যা থেকে গেছে বৈ কি। সেখানে সে একক, কোনো সাহিত্যের সঙ্গে তা'র মিল নেই—অন্তরের যোগ নেই। কথাটা তা'র কাছে খুব সহজ, কিন্তু অপরের কাছে জটিল। একটি জীবনের দুঃখ আরেকটি জীবনে এনেছে অনাসক্তি, এটি খুব সাধারণ নয়। একের বঞ্চনায় অন্যের বৈরাগ্য। একজনের বাঁধন কেটেছে, অন্যজনের বাঁধ ভেঙেছে। একজন দারিদ্র্যে ভুগেছে, অপরজনের সঞ্চয়ের ক্ষুধা মিটেছে। একজন কোনো ভোগ করেনি, তাই থেকে অন্য জনের আত্মনিগ্রহ।

অন্ধকার মধুর, যদি আলো আসে কোনো একসময়ে। বিরহ সুন্দর, যদি সেটি হয় মিলনের ভূমিকা। একশো বছর ধ'রে চোখের জল ফেলতে অনেকেই প্রস্তুত, যদি তারপর গিয়ে পায় কাম্যবস্তু। এখানে তা নয়,—চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ এখানে সুচিন্তিত, পূর্বপরিকল্পিত। এখানে কোনো বেদনার সুর ধ্বনিত হবে না, অম্লান আনন্দে স্বচ্ছ হৃদয় নিয়ে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ভাবাবেগ প্রকাশ করা চলবে না, দুই চোখে থাকবে না বাষ্পের আভাস, নিশ্বাসে থাকবে না বিচ্ছেদজনিত তপ্ত হাওয়া, বুকের মধ্যে থাকবে না কোনো কাঁপন। অতনু চুপ ক'রে তাকালো কড়িকাঠের দিকে। সন্দেহ নেই, এ বিচ্ছেদ দুঃসহ, এ পরম বিস্ময়, কিন্তু এর অপরূপ সৌন্দর্য। সমস্ত কায়িক, মানসিক ও বাচনিক সম্ভোগের বাইরে কি কোনো ভালোবাসা আছে? সর্বপ্রকার অন্তরস্থ আসক্তির স্পর্শ থেকে মুক্ত—আছে কি কোনো প্রেম? প্রিয়জন-বিচ্ছেদ-বেদনা থেকে কি আত্মিক আনন্দের উৎপত্তি সম্ভব? কাম্যবস্তুর সঙ্গে চিরকালের যে মনঃসংযোগ ছুঁয়ে থাকে, সেই মোহকে জয় করা কি নিত্যকার জীবনের কঠোরতম সংগ্রাম নয়?

অতনুর বুকের মধ্যে ধকধক ক'রে শব্দ হ'তে থাকে। দেওয়ালে টিকটিক করছে ঘড়িটা, ওটার বুঝি এখনই দম বন্ধ হয়ে যাবে।

বিস্তৃত বক্ষপট অতনুর, ওখানে কোনো এক কোণে কোনো এক কাল থেকে

ভাস্বতী বাসা বেঁধে রয়েছে, শাবক যেমন থাকে জননী-পাখীর পক্ষপুটের নীচে পরম নিশ্চিন্ত মনে। ওরা মিলে রয়েছে এতকাল একাকার হয়ে, মিলে রয়েছে সত্তায়-সত্তায়। একের বেদনায় অপরের সমবেদনাবোধ—এ হোলো লৌকিক। একের দুঃখে অপরের চোখে জল—এও হোলো সাংস্কারিক। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে যার বাসস্থান, বাইরে তার অবস্থাবৈগুণ্য দেখেও মানবিক বুদ্ধিকে নির্লিপ্ত রেখে হাসিমুখে চলা—এ কেমনতরো? এ কোন্ ভালোবাসা—যার বিবেক-চাঞ্চল্যটাও মোহ ব'লে প্রমাণিত হবে? এ কোন্ প্রেম, যার যৌগিক ব্যাখ্যা ছাড়া আর কোনো অর্থ নেই?

অতনু উঠে বাইরে এলো। ছাদের আল্‌সের পাশ দিয়ে উঠোনে নেমে এসেছে জ্যোৎস্না। এক চন্দ্র সমস্ত জ্যোতিষ্কের আভা ম্লান করেছে। সৌন্দর্যলোকে চন্দ্রেরই হোলো প্রধান আধিপত্য। অতনু উপর দিকে চেয়ে দেখলো, এটা শুক্লপক্ষের প্রায় শেষপ্রান্ত। পূর্ণিমার আর বিলম্ব নেই। এটা বনহংসীর অবতরণের কাল। তারাও শুক্লপক্ষ বিস্তার ক'রে আকাশপথে নেমে আসছে মানসের তীর থেকে।

অতনু ঘরে এসে ঢুকলো।

পূর্ণিমার দিন সকালে সে যখন রায়েদের বাগানে এসে পোঁছলো, তখন সেখানে বহু লোকের ভিড়। শহরতলী থেকে মাইল তিনেক দূরে লোকনাথের মেলায় নানা অঞ্চল থেকে লোক আসে। অনেককাল আগে একদিন এখান থেকেই ভাস্বতী একটি ছোট্ট ঠাকুর কিনে নিয়ে গিয়েছিল। গঙ্গার ধারে দোকানপাতি ব'সে গেছে। কাটাকাপড়ের ফেরিওয়ালারা এসেছে, গরু বেচতে এসেছে গয়লারা, তেলেভাজা খাবার বিক্রী হচ্ছে, পুতুলের দোকান ব'সে গেছে। এই জনতার ভিড়ে ভাস্বতীকে খুঁজে পাওয়া খুব সহজ নয়।

অতনুর তাড়া নেই। বিশ্বাস আছে বলেই ব্যস্ততা কম। চোখে চাঞ্চল্য নেই, কেন না, ওটা অধীর ঔৎসুক্যের পরিচয়। অতনু ভিড় সরিয়ে গঙ্গার ঘাটের দিকটায় এসে কতকটা নিরিবিলিতে দাঁড়ালো। মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা ধ্বনিত হচ্ছে।

হরিদাসকে ব'লে শেষরাত্রের দিকে বাড়ী থেকে সে বেরিয়ে প'ড়েছিল, হাঁটতে হয়েছে অনেক দূর পথ। চটিজুতো পায়ে দিয়ে বেরিয়েছিল সে। মনে

করেছিল, গাড়ী নিয়ে আসবে। কিছুদূর এসে নিজেই সে বেঁকে দাঁড়ালো। গাড়ী সে চড়বে না, লোকনাথের বাগানে যাবে সে পায়ে হেঁটে। কিন্তু শৌখীন চটিজোড়া সেই ধকল বরদাস্ত করতে পারেনি। সুতরাং মাঝপথে জুতো ফেলে দিয়ে খালি পায়ে তা'কে সমস্ত পথটা হেঁটে আসতে হয়েছে। অতনুর সেজন্য ক্লান্তি ছিল। সুতরাং এই সুযোগে জামাটা একখানে রেখে গেঞ্জিটা ছেড়ে সে সোজা গিয়ে গঙ্গায় নামলো।

ছেলেমেয়েরা একদিকে জল ছোড়াছুড়ি করছে। সকালে এই সময় মাহেন্দ্র-যোগ। গঙ্গার পাড়ে বহুদূর অবধি কাতারে কাতারে মেয়েপুরুষ ঘাটে জড়ো হয়েছে। অতনু সাঁতার দিয়ে চললো অনেক দূর। নতুন শীত পড়েছে, হেমন্তের গঙ্গা বড় স্নিগ্ধ। বহুকাল পরে অতনু যেন নতুন ক'রে গঙ্গাকে আবিষ্কার করতে নেমেছে; মনে পড়ে, বহুদিন আগে কোনো এক পার্বণ উপলক্ষ্যে ভাস্বতী তা'র সঙ্গে এসেছিল অবগাহন-স্নানে। সেই কথা মনে ক'রে অতনু সাঁতার দিয়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়ালো অনেক ঘাটে ঘাটে। এমন স্নান অনেককাল হয়নি।

হঠাৎ ডাক এলো জল থেকে। হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষে অতনু চেয়ে দেখলো এদিক ওদিক। দেখলো গলা-জলে দাঁড়িয়ে ভাস্বতী তাকে দূর থেকে ডাক দিচ্ছে। অতনু সাঁতরে গেল তা'র কাছে হাসিমুখে। নিজেও গলা-জলে গিয়ে দাঁড়ালো। কী আনন্দ আজ অবগাহনে!

আগে কি ওরা জল থেকে উঠে আসবে? না, জলেই থাকুক। অগাধ জলে দাঁড়িয়ে ওরা নতুন ক'রে দেখুক একজন আর একজনকে। দৃষ্টি ওদের শুভ হোক, সুন্দর হোক। ওদের চারটি চক্ষে গঙ্গা বাসা বেঁধে থাক।

ভাস্বতী বললে, দেখছিলুম তোমাকে অনেকক্ষণ থেকে, তা জানো? ভাবলুম, ডাকবো কিনা। তোমাকে দেখলে আর আমার গা ছমছম করে না, তাই ডাকলুম!

মুখের উপর থেকে জল সরিয়ে অতনু বললে, তবে ডাকলে কেন? কিসের তাড়ায়? ডুবে গেলে পাছে আবার দুঃখ পাও, এই ভয়ে?

জলের উপরে মুখ রেখে ভাস্বতী খুব হাসলো। বললে, আজও আমি কোনো দুঃখ পাইনি, তা ভুলে গেলে কেন? না চাইতেই যে আমি সব পেয়ে এসেছি!

অতনু বললে, প্রাণিজগতে সবাই বাসা বাঁধে, একথা কি সত্যি নয়, চীনু?

ভাস্বতী বললে, নির্জলা সত্যি! কিন্তু একমাত্র মানুষ, যে নিজের হাতে বাসা ভেঙে বেরিয়ে পড়ে, অতনু!

তুমি কি জানো, কোন্ পরীক্ষায় তুমি আমাকে ফেলেছ? দায়িত্ব-পালনের জন্যই পুরুষের জন্ম, এ কি তুমি বিশ্বাস করো না?

আবার তুমি কোন্ কথা এনে ফেললে, ডাক্তার! ওসব তর্ক যে অনেক আগে শেষ করেছি। শেষ জবাবটা পাবো ব'লেই ত' তোমাদের হাত থেকে মুক্তি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলুম!

অত ঠাণ্ডা জলের মধ্যে দাঁড়িয়েও অতনুর কণ্ঠে ঈষৎ উত্তেজনা দেখা দিল। বললে, জীবনটাকে যদি সত্য ব'লেই মানো, তবে জীবনটাকে ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছ কোথায়?

ভাস্বতী বললে, ওই দ্যাখো ডাক্তার, অভিমান তুমি আজও ভুলতে পারোনি! এখনো ভাবছো, দুঃখীর দারিদ্র্য ঘোচাবে, অপমান থেকে তুলে ধরবে প্রিয়জনকে! এখনো ভাবছো, রামরাজত্বের প্রতিষ্ঠা হবে তোমারই হাতে! ডাক্তার, কত নামডাক তোমার, কত রুগী তুমি সারিয়ে বেড়াও, নিজের রোগের দিকে কেন তোমার চোখ পড়ে না?

অতনু বললে, আমার কিসের রোগ, চীনু?

ভাস্বতী উচ্চকণ্ঠে হাসলো। বললে, নিগ্রহ থেকেই তোমার রোগের উৎপত্তি ডাক্তার। বিকৃত সংযম থেকেই লোভ। মানুষের দুর্দশা দেখে তোমার ক্ষোভ হয়েছে, ওটাও যে আত্মাভিমান! আমার কাছে অসুখ লুকিয়ো না, ডাক্তার। আত্মাভিমান থেকেই প্রভুত্বের জন্ম, আত্মনিগ্রহ থেকে ক্ষমতার লোভ! তুমি টাকার মালিক, তারই জোরে বুঝি দুঃখ ঘোচাতে চাও? হুকুমের জোরে বুঝি দারিদ্র্য তাড়াতে চাও? ডাক্তার, গঙ্গার জলে চিরকাল ডুবে থাকলেও শুচিতা তুমি খুঁজে পাবে না! চিন্তামানসের শুদ্ধি হওয়া কি এতই সহজ কথা?

অতনু বললে, কিন্তু এই গরীবের দেশে ওসব ধর্মদর্শনের দাম কি? সবাই যখন চারদিকে জ্বলে পুড়ে মরছে, তুমি তখন পালিয়ে গেলে আধ্যাত্মিক তাড়নায়—ওটা কি পলায়নী মনোবৃত্তি নয়?

ভাস্বতী আবার হেসে উঠলো গলাজলে দাঁড়িয়ে। বললে, ও ডাক্তার, তুমি

তোমার বিজ্ঞান ভুলে গেছ! তোমরা বীজ পোঁতো, গাছ লাগাও, ধান বোনো,—কিন্তু অজন্মা কেন গো? অনেক কাল ধ'রে ফসল উঠে গিয়ে মাটি যে অন্তঃসারশূন্য! মন বলো আর আত্মাই বলো,—এও সেই মাটি! আত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস করো তুমি, ডাক্তার?

করি, নইলে ওষুধে যে অসুখ সারে না, এ আমি জানি। প্রাণের খাদ্যই হোলো আসল ওষুধ! কিন্তু এ জানলেও আমার প্রশ্নের জবাবটা আমি পাইনে, চীনু।

উঠে এসো, জবাব দেবো!—

ওরা দুজনে উঠে এলো ঘাটে। একটু শীত ধ'রে গেছে। ঘাটে উঠে ভাস্বত তাঁর কাপড়খানা খুঁজে পেলো, কিন্তু অতনু দেখলো তা'র গায়ের জামাটা অদৃশ্য হয়েছে, কেবল একপাশে মাটিমাখা গেঞ্জিটা প'ড়ে আছে। মাথা মোছবার গামছা নেই। জামাটার মধ্যে কিছু টাকা আর কাগজপত্র ছিল।

অবস্থাটা বুঝে হাসিমুখে ভাস্বতী বললে, ভালোই হয়েছে, ডাক্তার। হাত তুলে তুমি দিতে চাও, তাই দান নেবার জন্যে কেউ সবুর করেনি। ওর জন্যে দুঃখ ক'রো না। দাঁড়াও, আমি এনে দিচ্ছি।

ভিজা কাপড়ে ভাস্বতী দ্রুতপদে বাগান পেরিয়ে চালাঘরের দিকে চ'লে গেল এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এনে হাজির করলো নতুন ধুতি আর নতুন গামছা।

অতনু বললে, কোত্থেকে আনলে?

আরো আনতুম, যদি তোমরা পাঁচজন হ'তে! ঠাকুর মশাইকে আমি যে বাবা বলি, আমার ভাবনা কি? চাইনে ব'লেই যে পাই!

কি ব'লে চাইলে?

বললুম, উত্তমপুরুষ এসে দাঁড়িয়েছে, ধুতি-গামছা ভিক্ষে দিন্, বাবা। ঠাকুর মশাই ত' সঞ্চয় করেন না, তাই তিনি অনেক পান্।

অতনু স্তব্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকালো। সদ্যস্নাতা ভাস্বতীর মুখখানি গৌরবে ও আনন্দে রৌদ্রের আলোয় যেন ঝলমল করছিল।

অতনু কাপড় ছাড়লো, গামছা দিয়ে মাথা মুছলো, মাটিমাখা সেই গেঞ্জিটা ঝেড়ে-ঝুড়ে গায়ে চড়ালো। তারপর বললে, ডাক্তার ব'লে আমাকে আর ডেকো না; কোনো পরিচয় আমি রাখতে চাইনে।

হাসিমুখে ভাস্বতী বললে, পরিচয় রাখতে চাও না, তবে বাঁচবে কি নিয়ে? আমাকে কি তুমি সত্যিই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছ?

অতনু বললে, না, ফিরতে তোমাকে বলিনি। আমি বলতে এসেছিলুম, আমাদের দুজনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হোক।

কেন বলো ত?

নিজের সঙ্গে চিরকাল যুদ্ধ ক'রে যাবো কোনোদিন তা'র শেষ হবে না, এর থেকে মুক্তি হোক। তুমি বাঁচলে আমাকে ছুটে বেড়াতে হবে, আমি বাঁচলে তোমার কোনোদিন মুক্তি নেই!

এই কথা?—হেসে উঠলো ভাস্বতী,—এর নামই ত' মরণ। এই হোলো তোমার ভয়, পাছে একলা প'ড়ে যাও, কেমন? ভয় মানেই ত' মৃত্যু! আমার কোনো ভয় নেই, অতনু!

অতনু বললে, তাই বুঝি পালিয়ে এলে? তুমি মার খেয়েছ তাদের কাছে, যারা সবচেয়ে বেশী তোমাকে আশা করেছিল। তোমাকে ধ'রে যারা উঠতে পারতো, তাদের ভাসিয়ে তুমি পালিয়ে এলে, এই কথাই আমি ব'লে যাবো।

আবার সেই পুরনো অভিমান!—ভাস্বতী বললে, যুক্তি দিয়ে কি পারবো তোমার সঙ্গে? তুমি যে বিদ্বান! আমি পালাইনি, পালাইনি, পালাইনি! ছোট সংসার ছেড়ে বড় সংসারে এলুম, এর নাম কি পালানো? এখানে দুঃখটা বড়, আনন্দটাও বড়! বুঝেছ? অভাব এখানে ছড়িয়ে আছে, তার আদিঅন্ত নেই। ব্যথা-বেদনা এখানে আকাশ-জোড়া—সেইটিই সান্ত্বনা। লোকে ঘরের কাজ ফেলে দেশের কাজ করতে ছোটে কেন? ঘরের ছেলেটিকে পরের জিম্মায় রেখে লোকে হাসপাতালের ধাত্রী হয় কেন? জননীর চোখের জল না মুছিয়ে জননীজন্মভূমিশ্চ বলতে বলতে ঘর-ছাড়া হয় কেন?

অতনু চুপ ক'রে তাকালো। ভাস্বতী হেঁট হয়ে তার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি, এ দুঃখ হরিদাসের থাকে থাক্, কিন্তু এ দুঃখের দাগ তোমার মনে কেন, ডাক্তার? ভালোবাসা কি স্বামীর চেয়ে বড় নয়? দেশজোড়া সেবা কি স্বামীর ভালোবাসার চেয়ে বড় নয়?

সেবার রীতিটা কেমন?—অতনু বললে, দেশের সেবা যে একটা অঙ্ক, একটা নক্সা, ওটা যে একটা বিশেষ অর্থনৈতিক কাঠামো—একথা ভুললে চলবে কেন?—অতনু শক্ত হয়ে দাঁড়ালো।

হাসিমুখে ভাস্বতী বললে, মানলুম। কিন্তু ছাঁচের মধ্যে ফেললে মানুষের অভাব হয়ত ঘুচবে, জীবনের পরমার্থ কি মিলবে?

অতনু প্রশ্ন করলো, জীবনের পরমার্থ মানে?

চরিত্রের শুচিতা থেকে যার জন্ম! যে কোনো নতুন ব্যবস্থার যেটা গোড়ার কথা। যেটার অভাবে সভ্যতার আলো বার বার নিভে যায়, মানুষের মুখোস খুলে জানোয়ার বেরিয়ে আসে!

অতনু বললে, আবার জিজ্ঞেস করি, দারিদ্র্য থেকে স্বভাবের বিকৃতি, এ কি তুমি স্বীকার করো না? অভাব থেকে দৈন্য, অপমান থেকে বিক্ষোভ,—একথা কি আজও অস্বীকার করো?

ভাস্বতী বললে, করি! প্রাণপণে ব'লে যাবো, তোমার কথা স্বীকার করিনে। তোমাকে বরং স্বামী বলবো, সেও ভালো, কিন্তু পতি গুরু ব'লে তোমার মন্ত্র কানে নেবো না, ডাক্তার। তোমার ধারণা যদি এদেশে চলে, তোমার ব্যবস্থা যদি মেনে চলতে সবাই বাধ্য হয়—বুঝবো এদেশের সব মিথ্যে! দর্শন মিথ্যে, বেদ-উপনিষৎ মিথ্যে, আসমুদ্র হিমাচলের সমস্ত ধ্যান-জ্ঞান, বুদ্ধি-চিন্তা, প্রাচীন সংস্কার, এদেশের মনুষ্যত্ব-বিচারের পদ্ধতি সমস্তই মিথ্যে! আর আমাকে ভুল পথে পা বাড়াতে বলো না, ডাক্তার!

উত্তেজিত কণ্ঠে অতনু বললে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ বাঁচবার জন্যে প্রাণপণে আজ চেষ্টা করছে, এদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তুমি পালাচ্ছ, এই তোমার মনুষ্যত্ব-বিচার? এই তোমার কল্যাণবোধ? এই তোমার এতদিনকার লেখাপড়া আর ধ্যান-ধারণার ফলাফল? ওদের মাঝখানে এতকাল ব'সে ওদেরই জীবনের কোনো মানে খুঁজে পেলে না? এই প্রতিশোধই কি তুমি নিয়ে গেলে ওদের ওপর?

ভাস্বতী হাসতে লাগলো অতনুর মুখের দিকে চেয়ে। বিচ্ছেদ-সম্ভাবনা থেকে মানসিক উত্তেজনার উৎপত্তি—ভাস্বতী জানে বৈ কি। এসব প্রশ্নের মীমাংসা হচ্ছে না, তাই অতনু উভয়ের একজনের মৃত্যু চায়। মৃত্যুই মীমাংসা, এই ওর ধারণা। বুঝতে বাকি নেই—অতনুর চেতনাটা রাজসিক। প্রতিকার চাইছে অতনু, চাইছে সমাধান। নিজের হাতে মানুষের দুঃখ ঘোচাবে, চোখের জল মোছাবে। অতনু দাঁড়াবে পৌরুষের জোরে, নিজের পায়ের জোরে। ভাস্বতী হাসিমুখে তাকালো।

জবাব দাও, চীনু? হেসো না!—অতনু অধীর হোলো।

দিচ্ছি! এসো, আমার সঙ্গে।—ভাস্বতী ওকে ডেকে নিয়ে চললো আগে আগে। মস্ত মেলার ভিড়, বহু লোকের হট্টগোল, সমস্তটা পেরিয়ে ওরা এলো চালাঘরের মধ্যে। সেখানে একখানা আসন পেতে সে অতনুকে বসালো।

ভাস্বতী তাড়াতাড়ি গেল রান্নার চালায়। পিতলের থালা ক'রে নিয়ে এলো চারটি ডাল-ভাত। অতনুর আসনের সামনে রেখে বললে, ঠাকুরের ভোগ। কিন্তু আধপেটা খেয়ো, ডাক্তার—এ হোলো ভিক্ষের চাল।

ক্ষুধা পেয়েছিল অতনুর সত্যই, আপত্তি জানালো না। ভাস্বতী বসলো তা'র পাশে। তারপর একটু পরিহাস ক'রে বললে, ঠাকুর-দেবতা খায়না কিছু, তাই রক্ষে। যেদিন খাবে, সেদিন আর কেউ ভোগ দেবে না, পুজোও করবে না! ঠাকুর চায়না ব'লেই নৈবেদ্য সাজাই।

অতনু হেসে উঠলো। বললে, তামাসা করছ কি নিয়ে, তা জানো?

ভাস্বতী বললে, জানি বৈ কি। মন্দিরে পুতুল বসানো, দেহের মধ্যে অন্তর্যামী। চোখ থাকলে দেখে নাও। ভোগ হোলো সেই অন্তর্যামীর। আগে গোড়াকার শিক্ষা হোক, তারপরে গরীব-দুঃখীর মুখে ভাত দিয়ো। কাজ তোমার নয়, কাজ হোলো তাঁর—এই কথাটা মেনে নাও। খেলে পেট ভরে, কিন্তু তৃপ্তি হোলো আলাদা জিনিস। ঘরে ব'সে খেয়ো না, বাইরে এসে খুঁটে খাও—তবেই তৃপ্তি। ডাক্তার, ভিক্ষের ভাত খেয়ে তোমার অহঙ্কার ঘুচলে খুশী হবো।

খেতে খেতে অতনু হাসলো। বললে, এ আবার কেমন কথা হোলো?

ভাস্বতী বললে, কথাটা একই, শুধু নানাভাবে বলা। তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া কিসে মিটে যায়, জানো?

কিসে?

আমাকে ফিরিয়ে না নিয়ে গিয়ে তুমিই বরং বেরিয়ে এসো না কেন?

অতনু মুখ তুলে ভাস্বতীর দিকে চুপ ক'রে তাকালো।

ভাস্বতী পুনরায় বললে, অভ্যাসকে ভাঙতে কি খুব কষ্ট হবে?

অতনু বললে, অভ্যাসকে ভাঙতে গেলে স্বভাবকেও নাড়া দিতে হয়, একথা ডাক্তারেও বোঝে!

ভাঙতে কি খুব ভয় পাও?—ভাস্বতী সহাস্যে তাকালো।

অতনু খাওয়া শেষ ক'রে বললে, পুরুষরা শেকড় নামিয়ে থাকে লোক-সমাজে, সেই জন্যে চট ক'রে তা'রা বদলায় না। মেয়েদের সে দায় নেই, সেইজন্যে তাদের নাম অভিসারিকা! তা'রা রস পেলেই ছোটে। অন্ধকারেও ছোটে, অন্ধ হয়েও ছোটে। বাঁশী যে বাজায়, সে দাঁড়িয়ে থাকে; বাঁশী যে শোনে, সেই ঘর ছাড়ে! অভ্যাসকে কেমন ক'রে ভাঙবো ব'লে দিতে পারো?

পারি!— ভাস্বতী উঠে দাঁড়ালো। অতনুও উঠে পড়লো।

ওধার থেকে তাঁতী-বৌদের দল এসে ওদের ঘিরে দাঁড়ালো। কীর্তনীয়ারা ওপাশে পাত পেড়ে বসেছে, তা'রা ফিরে তাকালো। আশ্রমিকাদের মধ্যে কানাকানি চলছে। বোষ্টম মেয়েরা একধারে পান সাজতে বসেছে। অতনু হাত ধুয়ে এসে দাঁড়ালো। ভাস্বতী হেঁট হয়ে আঁচল দিয়ে অতনুর পা দু'খানা মুছিয়ে দিল।

এর মানে কি?

আনন্দ!—ভাস্বতী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল।

ওধার থেকে তাঁতী-বৌ হাসি টিপে বললে, কিসের আনন্দ লা, দাসী?

দাসী জবাব দিল, এ যে নিজেকে সঁপে দেবার আনন্দ, মা!

অতনুর মুখচোখ রাঙা হয়ে উঠলো। এত ভিড়ের মাঝখানে এনে ভাস্বতী যেন তা'কে সঙ সাজাতে বসেছে। তা'র সংস্কার রুচি—সমস্তই বিদ্রোহ ক'রে উঠলো। তাড়াতাড়ি বললে, এবার আমাকে ছেড়ে দাও!

তাঁতীবৌ বললে, উনি কে, লা?

হাসিমুখে ভাস্বতী বললে, আমার পরম গুরু, মা। উনি আমার নরনারায়ণ! ওঁর পায়েই ত' প'ড়ে রইলুম এতকাল!

অতনু সেখান থেকে বেরিয়ে প'ড়ে সোজা আবার বাগানের দিকে চললো। ভাস্বতী চললো পিছু পিছু। কিছুদূর এসে ভাস্বতী ওকে ডাকলো। বললে, এখানে বিশ্রাম নাও একটু, আমি ঠিক সময়ে আসবো।

কোথা চললে তুমি?

যাবো আবার কোথায়? এখান থেকে এখানে। আসছি আমি—

ভাস্বতী ওকে নিরিবিলি এক জায়গায় বসিয়ে তাড়াতাড়ি আবার চালাঘরের দিকে চ'লে গেল। ওকে দেখে বনহুগলীর দলের মেয়েরা বললে, সকাল থেকে গায়ে গঙ্গার হাওয়া লেগেছে তোর। আমাদের সঙ্গে যাবি বলালি যে?

ভাস্বতী বললে, যাবোই ত' মা, যেখানে যাবে তোমরা! সেই জন্যেই ত' তৈরী হলুম!—এই ব'লে সে নানাজাতের উচ্ছিষ্ট-অপসারণের কাজে লেগে গেল। সব জায়গাতেই তা'র এই কাজ।

মেয়েপুরুষের দল পোঁটলা-পুঁটলী বেঁধে প্রস্তুত হোলো। দাসী ওদের সঙ্গে গেলে সব দিকেই সুবিধা। খেতে দিলে খায়, নইলে কিছু চায়না। কাজে অরুচি তা'র নেই, সেবায় বিশ্রাম জানে না। সোনার জিনিস ফেলে রাখলেও ছোঁয় না, লোভ নেই কোনো কিছুতে।

একজন বললে, ত্রিবেণীর গাড়ী কখন্ ছাড়ে গা?

আর দেরি নেই গো, এই বেলা সব বেরিয়ে পড়ো।—

ভাস্বতী কাজকর্ম শেষ করলো ক্ষিপ্রগতিতে। তারপর আর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সকলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো সকলের পিছনে পিছনে।

মেয়েটা একালের অন্নে মানুষ, একালেরই মেয়ে,—কিন্তু চিরকালের হাওয়া বোধ হয় ওর গায়ে লাগানো আছে। দুঃখে জীবন কাটলো, কিন্তু কিছুতেই দুঃখকে স্বীকার করলো না। ওকে সবাই ভালোবেসেছে এটাতে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই, কিন্তু ও যে সেবা করতে পারে সকলের—এতেই ওর গৌরববোধ। অল্পে সুখ নেই, তাই ভালোবাসাতেও রস পেলে না। হয়ত অন্য কোনো আকর্ষণ আছে, যা ভালোবাসার চেয়েও বড়—ও এবার ছুটছে তার পিছনে।

অতনু বসেই রইলো সেই নির্দিষ্ট একখানে। কত লোক আনাগোনা করে চলেছে; কিন্তু এখনো ভাস্বতীর দেখা নেই। অনেক কাজ তার পড়ে রইলো বাড়ীতে আর ডাক্তারখানায়, অনেক রোগী হয়ত ফিরে গেল হতাশ হয়ে,—কিন্তু তার সকলের চেয়ে বড় কাজটাই এখনও বাকী। জবাবটা তাকে নিতে হবে, নইলে তার স্বস্তি কোথায়? এমন কি পেয়েছে ভাস্বতী, যার জন্য তার এত বড় ঔদাসীন্য? এত বড় ভাবের আশ্রয় কোথায় পেয়েছে সে, যার জন্য সকলের বড় জায়গাটা তার কাছে মিথ্যা হয়ে গেল? এতকাল ধরে এত কাছে থেকে অতনু যাকে দেখে এলো, সে যে আগাগোড়াই দুর্বোধ্য নয়—একথা তাকে জেনে যেতে হবে বৈ কি।

অতনু বসে রইলো অনেকক্ষণ। হেমন্তের বেলা, এরই মধ্যে দেখতে দেখতে

অপরাহ্ন গড়িয়ে গেল। শুকনো গামছাখানা ছিল অতনুর কাঁধে, গায়ে সেই গঙ্গামাটিমাখা গেঞ্জি, খালি পা—এ চেহারাটা নিজের কাছেও তার অনেককাল জানা নেই। নিজের কাছে নিজেই সে যেন আবিষ্কার। পোশাকের পারিপাট্য রাখাটা অভ্যাসমাত্র,—না রাখো, কেউ ফিরেও তাকাবে না। চল্‌তি হাওয়ার রীতিকে মেনে চলো, লোকে তাকিয়ে দেখবে মাত্র; না মানো, নালিশ জানাচ্ছে কে? অভ্যাস হোলো একটা মনোবৃত্তি। অতনু বেশ ভালো আছে, কেন না, মিলে গেছে সকলের সঙ্গে। কিন্তু আশ্চর্য, ভাস্বতী এখনো এলো না! সময় এবং দূরত্ব নিয়ে কোনোকালেই ভাস্বতীর মাথাব্যথা নেই, একথা অতনু জানে, তবু অদ্ভুত মেয়ে বটে—কিছুমাত্র উদ্বেগ তার দিক থেকে দেখা যাচ্ছে না। বোধ হয় ঘণ্টা চারেক হতে চললো, ভাস্বতীর কোনো খোঁজখবর নেই।

পরম্পরায় শোনা গেছে, পূর্ণিমা ছাড়বে রাত ন'টায়, সুতরাং মেলা এখনু চলবে। অতনুর ফিরে যাবার কথা ওঠে না, যেহেতু ফিরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। এতকাল ধরে নিজের কথাটা তার ওঠেনি, নিজের বিষয়টা নিয়ে সে মাথাও ঘামায়নি,—কিন্তু আজ এইখানে বসে জীবনের শেষ বিচারের সিদ্ধান্তটা তাকে জেনে যেতেই হবে। তার লোভ নেই, সেজন্য ক্ষোভও নেই—কিন্তু এদের বাদ দিয়েও একটা কথা থেকে যায়—এখানে বসেই তার মীমাংসা হোক, আগামীকালের জীবনের ভাষ্যটা এখন থেকেই সে তুলে নিয়ে যাক্‌।

কথাটা কোথাও গোপন নেই। তাকে বাদ দিয়ে ভাস্বতীর অস্তিত্ব ছিল না, তাদের উভয়ের পৃথক সত্তা কারো জানা ছিল না। ভাস্বতীকে দুঃখ হয়ত স্পর্শ করেনি, কিন্তু সে নিজে দুঃখ পেয়েছে কম নয়। দৈন্যের তলায় তাকেও নামতে হয়েছে, পাঁকের মধ্যে তারও দুই পা পুঁতে গেছে অনেকবার। চল্‌তি ব্যাখ্যা নিয়ে কেউ যদি বলে, এটি তোমার ভালোবাসার যোগ্য মূল্য, অতনু সে কথা মানবে না। ভালোবাসা হয়ত আঘাত সয়, তাচ্ছিল্য সয় না। সম্ভ্রম-বোধ হোলো ভালোবাসার প্রাণ,—দৈন্যেই তার মৃত্যু। সেই মৃত্যু অনেকবার ঘটেছে ভাস্বতীর ঔদাসীন্যে, দীপেন-যমুনা-বরুণার নিয়মিত অসম্মানে। প্রলোভনের মধ্যে অতনু মানুষ হয়েছিল,—যশ প্রতিষ্ঠা স্বাচ্ছল্য স্বাচ্ছন্দ্য: কিছুরই তার অভাব ছিল না। হয়ত তার একটি অঙ্গুলিসঙ্কেতে মস্ত সংসার গড়ে উঠতো, ডাক দিলে এসে পৌঁছতো প্রচুর সম্পদ এবং সেই সব উপকরণ-বাহুল্যে জীবনের পথ হয়ত বা কুসুমাস্তীর্ণও হোতো। কিন্তু বাধা হলেন

স্বয়ং মৃগেন্দ্র, জাতিপরিচয়হীনা ভাস্বতীকে তিনি কুটুম্বের ছেলের হাতে তুলে দিতে চাননি। সেখানে নাকি নানাবিধ সামাজিক বিতণ্ডা উঠতে পারতো!

কী সে বিতণ্ডা, সেকথা থাক্। কিন্তু যিনি পথ থেকে কুড়িয়ে বুকে তুলে নিয়ে কন্যাস্নেহে লালন করেছেন, যাঁর সাহায্যে ভাস্বতী নানা শিক্ষায় পারদর্শিনী হয়েছিল, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনোরূপ চিন্তাও ছিল ভাস্বতীর কাছে ঘোরতর পাপ। পিতা অনেক বড়, প্রণয় তার চেয়ে বড় নয়। জীবনটা খরচ হোক ভাইবোনদের নিয়ে, বাপ-মাকে নিয়ে। এই ঘরকন্নার উন্নতি হোক, দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচুক—ওরা সবাই মানুষ হয়ে উঠুক,—এই ছিল ভাস্বতীর স্বপ্ন। আর অতনু? সে নানাপ্রকারে সাহায্য করে চলুক, দুজনে কাজ করে যাবে সকলের জীবনে। এই ধারণার খুঁটি আঁকড়ে ধরেছিল ভাস্বতী! কিন্তু অতনুকে আজ এই জবাবটা নিয়ে যেতে হবে,—সকল কাজ কেন রইলো অসমাপ্ত? জীবনের এই অপচয়ের বোঝা কে বইবে? সামনে যে বিস্তীর্ণ মরুভূমির তৃষ্ণা দিগন্ত-দীর্ঘ শুষ্ক জিহ্বা মেলে জেগে রইলো, ওর প্রতিকার কি? সমগ্র পরমায়ুব্যাপী যে ভগ্নতা ব্যর্থতা অবসাদ অপমৃত্যু আর নৈরাশ্য পিছনে ও সামনে পড়ে রইলো,—তারই বুকের রক্তে দুই চরণ রাঙগা করে ভাস্বতী আজ কোথায় চললো? সে কি কোনো পরম তৃষ্ণার তৃপ্তির পথ? সে কি কোনো জটিল অধ্যাত্ম-জীবনের আকর্ষণ? সে কি অপার্থিব কোনো সুখ? কোনো দয়াহীন স্বর্গ?

অতনু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো। নেমে এলো আমবাগানে। অদূরে কারবাইডের আলোর নীচে ইতিমধ্যে কখন কথকতার আসর জমে উঠেছে, এতক্ষণ সে লক্ষ্যই করেনি। সন্ধ্যা হয়েছে। গোধূলিকালের ও সন্ধ্যার সন্ধিলগ্নে পূর্ণিমার পরিপূর্ণ চন্দ্র কখন যেন আম্রশাখার ভিতর দিয়ে উপরে উঠে এসেছে। জনতার ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে অতনু গঙ্গার ধারে এলো। খেয়াঘাটে পারাপার তখনও শেষ হয়নি। মাঝনদীর কোনো নৌকা থেকে মাঝির কণ্ঠে বাউলের গান শোনা যাচ্ছে। শীতের হাওয়া গঙ্গার উপর দিয়ে বয়ে আসছে অতনুর সর্বাঙ্গে। অতনু কোঁচার খুঁটটা খুলে গায়ে ঢাকা দিল।

তাচ্ছিল্য নয়, ঔদাস্য নয়, হয়ত বা ভাস্বতীর এই চেহারাটাকেই বলে, জীবনবৈরাগ্য! সন্ন্যাসীর সর্বত্যাগও নয়,—কিন্তু কোনো লোভ

নেই, এইটুকু বলবার আশ্চর্য শক্তি। বিষাক্ত হাওয়ায় প্রতিক্ষণে আজ সবাই নিশ্বাস নিচ্ছে! অভাবে ক্ষুধায় লালসায় কাঙ্গালপনায়—প্রতিটি মানুষ আজ জর-জর। দিকে দিকে মানবতার অপমৃত্যু, ভদ্রবেশী চৌর্যবৃত্তি, পরস্বাপহরণের চক্রান্ত, সম্পদ-সঞ্চয়ের সাংঘাতিক পিপাসা,—এদের হাতে জীবন প্রতি পলকে যেন বিড়ম্বিত হচ্ছে! বিশ্বাসবোধকে নিয়ে পরিহাস, বেদনাকে নিয়ে বিদ্রূপ, মহানুভবতার প্রতি ব্যঙ্গকটাক্ষ, স্নেহ-দয়া-ভালোবাসা—হৃদয়-বৃত্তির যা কিছু ঐশ্বর্য, সমস্তগুলি নিয়ে পদে পদে পথে পথে ছিনিমিনি খেলা,—এদেরই পাশব চক্রান্তে একালের মানুষ শৃঙ্খলিত। এদের হাত থেকে মুক্তি, লোভ-লালসা থেকে আত্মরক্ষা, নিত্যবিড়ম্বিত জীবনের সহস্রবিধ সমস্যা ও বিকার থেকে চিত্তের শুচিতাকে বাঁচিয়ে চলা,—ভাস্বতীর সমস্ত বৈরাগ্যের আড়ালে এই কথাটাই হয়ত রয়ে গেছে। সে কিছু চায় না, এই কথাটা চেঁচিয়ে বলা; সে কিছু গ্রাহ্য করে না, এই কথা নিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠা। চল্‌তিকালের দরবারে এই নালিশ জানিয়ে যাওয়া, তোমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত, হৃদয় পঙ্গু, চিন্তা কলুষিত, কর্মধারা স্বার্থসন্ধানী! তোমাদের হাতে বিবেক পীড়িত, মনুষ্যত্ব অপমানিত, জীবনের শুচিতা ধূল্যবলুণ্ঠিত! তোমাদের ওই মিথ্যা দম্ভ, অন্তঃসারশূন্য বিদ্যা, বুদ্ধিহীন ব্যবস্থাপনা—ওদের কোনোটাকেই স্বীকার করিনে! শ্লথপ্রাণ দুর্বলের মুখে ন্যায়নীতির নামে স্পর্ধিত অশ্রদ্ধার উক্তিকে [illegible] মেনে নিয়ে যাবো না।

তবে কি ভাস্বতী সমস্ত অস্বীকার করে নিরুদ্দেশে ছুটে পালালো?

দেখতে দেখতে রাত অনেক হয়ে এলো। নিজের সঙ্গে কথা কইতে কইতে গঙ্গার তীর ধরে অতনু খানিকটা দূরে অবধি চলে গিয়েছিল। কোনো এক জরাজীর্ণ প্রাচীন স্নানের ঘাটের ফাটলধারা সিঁড়ির ওপরে সে বসেও ছিল অনেকক্ষণ। সন্ধ্যা-রাত্রির ধূম্রধূসরতা কেটে গেছে, এখন বিস্তীর্ণ গঙ্গার উপরে হেমন্তকালের পূর্ণিমায় স্বচ্ছ আকাশের বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। অতনু সেখানে বসে ছিল অনেকক্ষণ, তারপর সে যখন হাঁটতে হাঁটতে আবার এসে আমবাগানের পাশ দিয়ে লোকনাথের চত্বরে এসে দাঁড়ালো, তখন লোক-নাথের মেলা গেছে ভেঙ্গে, কথকতার আসর অনেকক্ষণ আগে উঠে গেছে।

কে একটা লোক গাছের নীচে বসে টুংটাং একতারার আওয়াজ করছিল, তখনও। অতনু পায়ে পায়ে তার কাছে গিয়ে একবার দাঁড়াতেই লোকটা

একবার লুব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গান ধরে দিল। বোধ করি লোকটা মেলায় গান শুনিয়ে ভিক্ষা করতে এসেছিল; কিন্তু অতনু আবার সেখান থেকে সরে যেতেই সে হঠাৎ বাজনা থামিয়ে চুপ করে গেল। অতনুর কাছে কানাকড়িও ছিল না।

ভাস্বতী তাকে যেখানে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল, দেখা গেল, সেই জায়গাটিই সব চেয়ে পরিচ্ছন্ন আর নিরিবিলি। কিন্তু খোলা হাওয়ায় অনেকক্ষণ থেকেই অতনুর শীত ধরে গিয়েছিল। এখানে ওখানে লোকজন আর বিশেষ কেউ নেই। বাগানের ওদিকে কোথাও কোথাও ছোট ছোট দোকানের মরা উনুনের পাশে কেউ কেউ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়েছে।

মন্দিরে আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। পূজারী দরজা বন্ধ করে তালা দিয়ে চলে গেছেন। দেওয়ালের ধারে চুপ করে বসে অতনুর তন্দ্রা এসেছিল।

মাথায় বালিশ নেই, পিঠের তলায় বিছানা নেই, গায়ে ঢাকা দেবার কিছু নেই,—অতনু কুঁকড়ে শুয়ে ছিল। কোঁচার খুঁটে যতটুকু আবৃত করা সম্ভব, ততটুকু পর্যন্তই হয়ত আরাম পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু এমন সুখনিদ্রা কিছুদিন থেকেই অতনুর কপালে ঘটেনি। শেষ রাত্রির দিকে বোধ হয় পা ছড়াতে পেরেছিল, ফলে ঘুমটা বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। মেলার গোলমাল গত রাত্রিতেই শেষ হয়ে গেছে, দলবল আর মালপত্র নিয়ে অধিকাংশই চলে গেছে, যারা বাকী ছিল—ভোরবেলা উঠে তাদেরও চলে যাবার কথা। সুতরাং কোথাও কোনো হট্টগোল না থাকার জন্য ক্লান্ত অতনু গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল। রাত্রি কখন্ শেষ হয়ে গেছে, প্রত্যূষের পাখীরা কখন্ আমবাগানের মধ্যে প্রথম কলকাকলী করে বিদায় নিয়েছে, খেয়াপারাপার কখন আরম্ভ হয়ে গেছে, মন্দিরের প্রভাতী পাট কখন সারা হয়েছে—অতনু কোনোটাই জানতে পারেনি। ঘুম যখন তার ভাঙলো, তখন কোমল মধুর রৌদ্র তার গায়ে এসে পড়েছে।

অতনু উঠে বসলো। কিন্তু গায়ের উপরে একখানা নধর কম্বল চাপানো দেখে সে বিস্মিত হয়ে এদিক ওদিক তাকালো। মাথার তলায় একখানা কাপড় পাট করে বালিশের মতো করে দেওয়া হয়েছিল। এটা কিছু ভৌতিক নয়, এ কাজ ভাস্বতীর। ভাস্বতী কখন্ এসে যেন শুয়েছে তার মাথার ধারে, সর্বাঙ্গে তার চাদর ঢাকা। অতনু একবার তাকালো তার দিকে। সেই নিদ্রার

চেহারা দেখলে মনে হতে পারে, জগৎ-সংসার সম্বন্ধে কোনো উদ্বেগ তার ত্রিসীমানার মধ্যেও নেই। বোধ করি, তার ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরে ভাস্বতী উঠলো। চোখে মুখে অবসাদ ও ক্লান্তির ছায়া ছিল, কিন্তু অতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে হাসলো। বললে, পায়ে ধরে তোমার ক্ষমা চাইবো ভেবেছিলুম, কিন্তু তোমার মুখের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, আগেই ক্ষমা করেছ! খুব জব্দ হয়েছ ত?

অতনু বললে, কোথায় গিয়েছিলে?

ত্রিবেণীতে। কাল সন্ধ্যায় পূর্ণিমার যোগে স্নান করতে। সেখান থেকে রাত এগারোটার গাড়ী ধরে ফিরেছি। এখানে এসে পেঁছতে রাত শেষ হয়েছিল। এবার তোমাকে পেট ভরে খেতে দিলে খুশী হবে ত?

হাসিমুখে অতনু বললে, এখানে বসিয়ে বসিয়ে কিছুদিন যদি আমাকে অন্নবস্ত্র দাও, তাহলে মন্দ কি? কে দিচ্ছে, কোথা থেকে সব আসছে, এসব ভাববো না,—এ একটা নতুন ধরণের ঘরকন্না!

ভাস্বতীও হাসলো। বললে, এর আয়ু আজকেই কিন্তু শেষ। কাল থেকে এখানে আবার দিনের বেলায় শেয়াল ঘুরে যাবে, সন্ধ্যায় আলো দেবার কেউ থাকবে না। খোঁজ নেবে না কেউ।

অতনু বললে, আর তোমরা?

আমি নতুন, আমার এখনও কিছু জানা নেই। কিন্তু ওদের কথা বুঝতে পারি। ওরা হোলো জলাবিলের পাখীর দল। এক জায়গা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে ওরা চলে যায় অন্য জায়গায়। সেখানেও অস্থায়ী ঘরকন্না চলে কিছুকাল। এই আনন্দ নিয়েই ওরা ঘুরে বেড়ায়।

গঙ্গার দিকে চেয়ে অতনু কিছুক্ষণ অবধি চুপ করে রইলো। পরে বললে, কিন্তু আমি এখানে কাল থেকে বসে রয়েছি, কেন বলো ত? কেনই বা সাত আট দিন থেকে দূরে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখে দেখে চলে যাচ্ছি?

সহাস্যে ভাস্বতী বললে, একথার জবাব কি না পেলেই চলবে না?

পেলে খুশী হতুম!

এমন ত' হ'তে পারে, জবাব না পেয়েও খুশী হয়ে তুমি চ'লে যাবে?—ভাস্বতী সস্নেহে অতনুর দিকে তাকালো। তারপর আবার নিজেই সে বললে, আচ্ছা এখন থাক্, মুখ হাত পা ধুয়ে আগে কিছু খেয়ে নাও।

ভাস্বতী গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো। তারপর অতনুকে সঙ্গে নিয়ে কুয়োতলাটার দিকটা দেখিয়ে দিয়ে এলো। অতনু ডাক্তার মানুষ, সকালের দিকে তা'র স্নানাহারের ব্যাপারটা ভাস্বতীর জানা ছিল। ফিরে এসে সে মন্দিরে ঢুকলো,—গতকালের বহু উপচার সেখানে জমা হয়েছিল। পূজারীর কাছ থেকে সে অতনুর জন্য ফলমূল মিষ্টান্ন চেয়ে আনলো।

প্রায় আধঘণ্টা পরে অতনু ফিরে এলো। সে স্নানাদি সেরে এসেছে। জলযোগের চেহারাটা বেশ ভারি। অতনুকে তা'র সামনে বসিয়ে ভাস্বতী আবার গিয়ে মন্দিরে ঢুকলো এবং কোমর বেঁধে সেখানে প্রাত্যহিক পাটে মনোযোগ দিল। বৃদ্ধ পূজারী তা'র ওপর বিশেষ তুষ্ট ছিলেন।

সমস্ত ব্যাপারটা অস্থায়ী, কিন্তু আনন্দময়। এটা মিলন নয়, এটা বিচ্ছেদের নামান্তর। তবু এর মধ্যে মধুসঞ্চয় ছিল। এই ক্ষণস্থায়ী আতিথেয়তা, এই নিরভিমান নির্লিপ্ত অনুরাগ, সমস্ত আচরণের মধ্যে শুদ্ধ চরিত্রের প্রকাশ—এর মাধুর্যটুকু উপলব্ধি করার মতো। এটি অভ্যাসের বাইরে, প্রচলনের সীমানার অতীত, সামাজিক অনুশাসন থেকে দূরে,—এটিকে বুঝবার জন্য বোধ হয় দরকার ছিল এই উদার গঙ্গার তীরবর্তী ওই দেবালয়, আম্র-কাননের উপরে আকাশলোকে হেমন্তকালের উজ্জ্বল নীলাভা, দরকার ছিল দূরের পরিচিত সংসারটা থেকে সর্বপ্রকার সংস্কারবিলুপ্তি!

ভাস্বতী ফিরে এসে বসলো কাছাকাছি। অতনু বললে, ঠাকুর-দেবতার ওপর ভক্তি-টক্তি রাখলে একটা সুবিধে এই যে, পাঁচটা লোকের চাঁদায় পেটটা ভ'রে খাওয়া যায়!

কথাটা মিথ্যে বলোনি, ডাক্তার!—ভাস্বতী বললে, তবে এজন্যে, অভ্যাসের দাসত্বটা ছাড়তে হয় যে!

অতনু বললে, তোমার নিজের বুঝি ক্ষিধে-তেষ্টা নেই?

আমি যে দাসী, ওসব কাজ আমাকে আড়ালে সারতে হয়! যাক গে, আর নয়, এবার তোমার কাছে আমি বিদায় নেবো, অতনু। এদিকের কাজ আমার সব শেষ হয়ে গেছে।

অতনু হাসলো। হেসে বললে, আমার চোখের ওপর দিয়ে ঘটা ক'রে তুমি চ'লে যাবে, আর আমি মন খারাপ ক'রে বাড়ীর দিকে হাঁটা দেবো, এই-জন্যেই কি এখানে ঘণ্টা চব্বিশেক ধ'রে ব'সে আছি?

কথাটা ভাস্বতী লুফে নিল। বললে, তোমাকে লুকিয়ে আমি শেষরাত্রে পালিয়ে এসেছিলুম একদিন, আর এবার তোমার হাত ধ'রে তোমার ঘরে গিয়ে উঠে ঘরকন্না আরম্ভ ক'রে দেবো,—এইজন্যেই কি তুমি ব'সে আছ?

অতনু বললে, সম্ভবত কোনো মোহ নিয়ে আমি আসিনি তোমার এখানে, কিন্তু একটা কথা আমার জানবার দরকার ছিল, চীনু।

কি বলো?

তুমি মুখ বুজে এতকাল সকলের মাঝখানে ছিলে, অপমান লাঞ্ছনা হাসি-মুখে সয়েও চুপ ক'রে ছিলে,—কিন্তু তোমার মনে কি কোনো বিষয়ে কোনো অনুরাগ কোনো মোহ ছিল না? আমার এতকালের বিশ্বাস, এতকালের সত্যি—সমস্তই কি মিথ্যে?

ভাস্বতী চুপ ক'রে কিছুক্ষণ ভাবলো। সে যেন তলিয়ে গেল নিজের মধ্যে। তারপর আবার মুখ তুলে বললে, এবার আমাকে যেতে হবে, অতনু!

অতনু বললে, নিশ্চয়ই যাবে! তবে কি জানো চীনু, লুকিয়ে যে-ব্যক্তি পালিয়ে আসে, তা'র হৃদয়ের বিচার আমি আজ করবো না, কিন্তু চিরকালের প্রিয়জনকে এক কথায় অকারণে হারালে মনের অবস্থা কি প্রকার হয়, মেয়েমানুষ কি সেকথা বোঝে? যেখানেই তুমি যাও, একথা কিন্তু মনে রেখো, পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো লোক তোমার আমার এই বিচ্ছেদকে কখনো বুঝতে চাইবে না। আমাদের জীবনজোড়া গল্পের এই পরিশেষকে কোনোমতেই তা'রা স্বীকার করবে না!

ভাস্বতী এবার হাসলো। শান্তকণ্ঠে বললে, মেয়েমানুষ মর্মান্তিক আঘাত পেলে কি করে জানো? তা'রা চেঁচায় না, শুধু চোখের জল ফেলে!

অতনু বললে, তোমাকে এ জীবনে কখনো চোখের জল ফেলতে দেখিনি, কোনো অবস্থায় কখনো তোমার কান্না পায়নি—কেন বলো ত?

যে-মেয়ে কখনো চোখের জল ফেলেনি, তাকে বিশ্বাস করেছিলে কেন? তা'র মধ্যে এক সর্বনাশিনী বাস করে, তা'কে দেখেছ কি কোনোদিন?

কথাটা বুঝতে না পেরে অতনু চুপ ক'রে গেল। ভাস্বতী পুনরায় বললে, যাবার সময় তর্ক রেখে যেতে চাইনে, ডাক্তার। ভালোবাসা যেখানে সত্যি, তর্ক সেখানে চুপ। তোমাকে শিশুকাল থেকে পেয়েছিলুম, সমস্ত দুঃখ-অপমানের মধ্যে তুমিই ছিলে আমার সকলের বড় আশ্রয়—শুধু আমার জন্যে তুমি সমস্ত

ছেড়ে তপস্বী হয়েছ, তাও দেখেছি। কিন্তু তবু চোখের জল জমিয়ে রেখেছি, একদিন তারই বন্যায় ভেসে যাবো ব'লে! তুমি আমার সামনে সকলের বড় হয়ে থাকবে ব'লে আমি এই দুঃসহ বিচ্ছেদ স্বীকার ক'রে চ'লে যাচ্ছি।

আর আমি?—অতনুর গলা কেঁপে উঠলো।

মধুর কণ্ঠে ভাস্বতী বললে, থাকো তুমি এই পারে! দুঃখীদের নিয়ে থাকো, হরিদাসরা থাকুক, অন্তুরা মানুষ হোক!

তুমি যে মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে গেলে, তা'র সান্ত্বনা তুমি কী নিয়ে যাচ্ছ?

হাসিমুখে ভাস্বতী বললে, চোখের জল ফেলিনি আমি, তবে কেন তুমি মর্মান্তিক আঘাতের কথা বলছ, ডাক্তার? তুমি কি বলতে চাও, যাবার সময় ছেলেমানুষের মতন কান্নাকাটি ক'রে সকলের কাছে অভিমান রেখে যাবো?

কোথায় যাচ্ছ তুমি, কই বললে না ত?—অতনু প্রশ্ন করলো।

সত্যি কথা বলতে কি, আমিও ঠিক জানিনে কোথায় যাচ্ছি! অনেকগুলো জায়গার সন্ধান পেয়েছি, তাদের মধ্যে একটা বেছে নেবো। এত বড় দেশ, এক মুঠো ভাত কোথাও খুঁজে পাবো না? যদি সেবা করতে পারি সকলের, পুরনো কাপড় একখানা জুটবে না?

অতনু বললে, এত অনিশ্চয়ের মধ্যে কি তোমাকে যেতেই হবে?

ভাস্বতী বললে, রাগ ক'রো না,—যেতেই হবে। সম্পূর্ণ অপরিচয়ের মধ্যে—যেখানে কেউ জানবে না, খুঁজবে না! তুমি কি ভুলে গেছ, আমার সত্যিকার মা-বাবা একদিন পথে আমাকে ভাসিয়ে চ'লে গিয়েছিলো—যখন আমি শিশু?

অতনু বললে, সেখানে তোমার ব্যথা নেই, চীনু,—কিন্তু মর্মান্তিক ব্যথা তোমার ওইখানে,—যেখানে মেসোমশাই এতকাল পরে তোমাকে ত্যাগ করলেন! এ কি সত্যি নয়?

সেকথা শুনে তোমার কি হবে? এই [illegible] হাওয়ায় এসে তিনদিন ধ'রে পড়েছিলুম, অতনু। কপালের [illegible] দাগও মিলিয়েছে, জ্বরও [illegible] গত জীবনের সমস্ত ইতিহাসটাও ওই [illegible] গেছে

অতনু কথা বলতে পারলো না। একটু থেমে ভাস্বতী পুনরায় বললে তুমি জানো, ভক্তি আমার ছিল না। কিন্তু তিনদিন পরে যখন হাসিমু

অতনু বললে, আমার ভালোবাসা যদি তোমাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যায়?

কোথায়?

কোনো আশ্রয়ে নয়, কিন্তু আমার পথে। আমি যদি আজ বলি, কোনো আঘাতে কোনো অপমানে যে-মেয়ে কখনো ভেঙে পড়েনি, সে আমার পথে আমার চোখের সামনে থাক্, সে-দাবী কি আমার মিথ্যে হবে? যদি আমি বলি, সুগন্ধ ফুলের চারা দাঁড়িয়ে উঠেছে, কিন্তু অন্তঃসারশূন্য মাটিতে সে বাড়তে পাচ্ছে না,—আমি তপস্যা করবো তা'কে প্রাণবন্ত করার, সে যেন অজস্র ফুলের সুগন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়! সে কি আমার অন্যায় আশা?

ভাস্বতী ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, যাওয়া-আসার সকল পথ খুলে রেখে দিতে পারবে? অবারিত মুক্তির আনন্দ অব্যাহত থাকবে কি?

অতনু বললে, আমার হাতে কিছু নেই। তোমার পথের তুমিই পথিক।

যদি কখনো দেখি, গরীব-দুঃখীদের হাত থেকে নিয়ে তুমি সঞ্চয় করেছ? তাহ'লে তোমার সেই লোভ থেকে আমার অপমানিত ভালোবাসার মুখরক্ষে হবে কেমন ক'রে?

অতনু হাসিমুখে তা'র দিকে তাকালো। পুরুষ-চরিত্রের সেই দৃঢ় কাঠিন্যের হাসি ভাস্বতী অনেকবারই দেখে এসেছে। বিশ্বাসের সেই পরনির্ভরতা কোনোদিনই তা'র ক্ষুণ্ণ হয়নি। অতনু দুর্জ্ঞেয় নয়, কিন্তু অজেয়। ঝড়ে, দুর্দিনে, নৈরাশ্যে, মৃত্যুতে, দুরপনেয় অপমান-কলঙ্কে—সেই সমস্ত জঞ্জাল আবর্জনাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে আপন আভা চিরদিন বি... করেছে। সেই হাসি আগুনের, সেই হাসি হোমকুণ্ডের!

ভাস্বতী স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, বেশ, তুমি যাও, আমার পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ো না,—ফিরে এসে তোমাকে আবার ডেকে নেবো। অপেক্ষা ক'রো আমার জন্যে, কথা দিয়ে গেলুম।

অতনু স'রে দাঁড়ালো। ভাস্বতী একা অগ্রসর হয়ে চললো গঙ্গার তীরে তীরে। আনন্দে আবেগে দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ পিছন পথে স্থির হয়ে রইলো। ভাস্বতী দূরপথে চ'লে গেল।